আচার্য খগেন্দ্রনাথ মিত্র

মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে

এবং

আচার্য শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী ও আচার্য শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

মহাশয়দ্বয়ের করকমলে

এই লেখকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা রচনা :—

মহামানব জাতক

চৈতী ফসল (শ্রীগীতা বসুর সহযোগে)

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান

অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ

গ্রন্থকারের নিবেদন

বিস্ময়কর সংবাদ।

"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার প্রধান কবি ও ব্যঙ্গ-লেখক" এবং "বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিকট শিক্ষানবীশী করেছেন সাহিত্যক্ষেত্রে।"

সবাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় এই যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শব্দকোষ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' গ্রন্থের একাদশ সংস্করণে (৬ষ্ঠ খণ্ড) এই সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছে :—

"In his earlier years Bankim Chandra served his apprenticeship in literature under Iswar Chandra Vidyasagar, the chief poet and satirist of Bengal."

যৌবনপ্রারম্ভে পিতৃদেবের এনসাইক্লোপিডিয়া গ্রন্থের অনুরাগী পাঠকরূপে এই আঘাত পেয়েছিলাম। সেদিন ভেবেছিলাম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শব্দকোষে বাংলার সাহিত্যসম্রাট বিষয়ে এ লিপিপ্রমাদ কেন? আর বিদ্যাসাগর, আমার পিতামহের পিতা, তাঁকে ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে কি ক'রে গুলিয়ে ফেলা হল? সে-প্রতিবাদ লেখার সুযোগ পেলাম আজ। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্যগত প্রতিবাদ করতে বসে অনেক তত্ত্বগত মতানৈক্য এবং নূতন অভিমত প্রকাশ করার ইচ্ছা হয়েছিল। সেই অন্তরের প্রেরণায় ও বাহিরের তাগিদে গ্রন্থটি প্রকাশিত হল।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে অনেক অপূর্ব আলোচনা বেরিয়েছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ললিতমোহন, মোহিতলাল, আচার্য যদুনাথ, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীজনার্দন চক্রবর্তীর বিচার-বিশ্লেষণ বঙ্কিম-রসিকের অবশ্যপাঠ্য। ওঁরা আমার প্রণম্য। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই এঁদের মতামতের সশ্রদ্ধ পুনরালোচনা প্রয়োজন মনে হয়েছে, সে বিষয়ে আমি আমার বক্তব্য জানিয়েছি। গ্রন্থ রচনায় ছাত্রদের প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। 'ভারতীয় সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র' বিষয়ে নূতন আলোচনার সূত্রপাত করলাম। একদিন যখন 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান' লিখেছিলাম সেদিন বাংলা দেশে কোনও সাড়া জাগেনি। কিন্তু আচার্য সুনীতিকুমারের নিকট

শুনেছি সে-রচনায় নাকি বহির্ভারতে কোনও হিন্দীপ্রেমী বন্ধু ,ৎসব ক'রে বিক্ষোভ করেছিলেন। এ সংবাদে আঘাত পেয়েছিলাম, কিন্তু পরবর্তী কালে ঐ গ্রন্থই আমাকে অপরিসীম সম্মান দিয়েছে। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে আমারই ঐ বিষয়ের কিয়দংশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ক'রে 'হিন্দী নাটকের উপর বাংলার প্রভাব' বিষয়ে আলোচনা ক'রে ডঃ সত্যেন্দ্রকুমার তনেজা পি.এইচ.ডি উপাধি লাভ করেছেন। আমার আলোচনা নূতন আলোচনার পথপ্রস্তুতি করেছে। এই স্বীকৃতিতে আমার সকল শ্রম সার্থক হয়েছে। আশা করি 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতীয় সাহিত্য' বিষয়ে নূতন নূতন আলোচনা সুরু হবে।

শ্রুতিলিখনের কাজের দ্বারা যাঁরা আমার চিন্তাকে লেখায় রূপ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ ক'রে রবীন সামন্ত, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবেদিতা চক্রবর্তী, অপরাজিতা চক্রবর্তী, সম্বুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় ও সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করি। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে পত্রিকায় যাঁরা আমার রচনার কিয়দংশ স্থান দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে বন্ধুবর শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক ও অরুণ ভট্টাচার্যকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গ্রন্থপ্রকাশে অকৃপণ সাহায্যের জন্য আমি বিখ্যাত প্রকাশক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নিকট গভীরভাবে ঋণী। তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর সহকর্মী-বন্ধুরা নানা দিকে যে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলিকাতা

সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

[বামে প্রদত্ত সংখ্যা অনুচ্ছেদ ও দক্ষিণে প্রদত্ত সংখ্যা পৃষ্ঠা সূচক]

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলায় কথাকাহিনীর ধারাপ্রবাহ (১-১২)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিভার ক্রমবিকাশে 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৩-৩৪)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'দুর্গেশনন্দিনী' ঃ 'কপালকুণ্ডলা' (৩৫-৪০)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আনন্দমঠ (২৪৯-২৬৯)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দেবীচৌধুরাণী (২৭০-২৯৩)

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সীতারাম (২৯৪-৩২৪)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতীয় সাহিত্য (৩২৫-৩৩৪)

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	মুদ্রিত	সংশোধিত
৯৭	৭	দুষ্ট দেবা	ইষ্ট দেবী
২৬২	১৯	ধীবানন্দের	জীবানন্দের

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলায় কথা-কাহিনীর ধারাপ্রবাহ

॥ ১ ॥

অনাদিকাল হ'তে মানুষ গল্প শুনে আসছে…সে গল্প শোনার কোনও ইতিহাস নেই, কোনও পরিমাণ নেই। কোনও প্রমাণ গেছে হারিয়ে; কথা ফুরিয়েছে, গল্পের নটে গাছটিও মুড়িয়েছে। আবার কোথাও কোথাও সন তারিখের চিহ্নবিহীন, কথক-লেখকের পরিচয়বিহীন গল্প বেঁচে রয়েছে প্রাচীনকালের চির-নবীন সৌন্দর্যে।

সব দেশের মানুষের মত আমাদের দেশের মানুষও অনন্তকাল ধরে অজস্র গল্প শুনেছে। তাদের জীবনের হাসিকান্নার সঙ্গে সম্পৃক্ত সে-গল্প কথক-লেখকের মুখে অক্ষয় হয়নি সর্বত্র, তবু কালের প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে সকল রাজ্য ভাঙ্গা-গড়াকে তুচ্ছ ক'রে তার কিছু কিছু অংশ এসেছে আজকের কাল পর্যন্ত। কোথাও এসেছে পদ্যের বাহনে, কোথাও গদ্যের। রামায়ণ মহাভারতের শাখায় শাখায় গল্পের ঝুরি নেমেছে বাস্তবের মাটির দিকে। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীতে, 'পঞ্চতন্ত্র', 'কথাসরিৎ-সাগর', 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'দশকুমারচরিত', সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা', বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে সেই গল্পের গদ্যরূপ। আমরা জানিনা পৈশাচী প্রাকৃতের হারিয়ে যাওয়া 'বড্ড কহা' বা 'বৃহৎ কথা' কি ধরনের ছিল। আমরা জানিনা উদয়ন-কথাকোবিদ গ্রাম্য বৃদ্ধেরা আরও কত গল্প, কত মজার কাহিনী নিয়ে দিন কাটাতেন। তবে অনুমান করতে পারি কালিদাসের যুগের এই সকল বৃদ্ধেরা আলস্যের সহস্র সঞ্চয় ও অকাজের কাজ নিয়ে যখন গল্প করার আনন্দে বসতেন তখন দিনের পর দিন একই উদয়নের কথা বলতেন না, কারণ তাহ'লে তাঁদের সভায় শ্রোতা জুটত না, গল্প জমত না। যে ঔৎসুক্য গল্প শোনার প্রাণ তা একই কাহিনীর অশেষ পুনরাবৃত্তিতে দেউলে হয়ে যেত। অতএব গল্প বলার ক্ষেত্রে সুরসিক উদয়ন-কথাকোবিদ বৃদ্ধেরা আরও অনেক গল্প বলতেন। যুবকেরাও মুখে তালাচাবি দিয়ে বসে থাকতেন না। আর কথা বলায় যাঁরা শক্তি-স্বরূপিণী, যাঁদের জিহ্বাগ্রে বাণী, তাঁরা নিশ্চয়ই অবসর বিনোদনের এতবড় একটি জিনিসকে অনাদরে ফেলে রাখতেন না। বরঞ্চ গল্প শোনা ও গল্প বলায় আধুনিকাদের অসামান্য প্রবণতা লক্ষ্য ক'রে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে

পারে যে প্রাচীনকালের শ্রীমতীরাও এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকতেন না। আমার মনে হয় গল্প বলার ক্ষেত্রে কোয়ালিটেটিভ দান এঁদের যেমনই হোক কোয়ান্টিটেটিভ দান মোটেই কম নয়। আর কোয়ালিটিও অনেক সময় যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল তারই প্রমাণ ঠাকুমা-দিদিমার রূপকথা। অজস্র সেই হারিয়ে যাওয়া টাটকা সজীব বীজ নিছক দক্ষিণারঞ্জনের দাক্ষিণ্যে অমর অঙ্কুরে পরিণত হয়েছে। অল্প কয়েকটি মাত্রই বেঁচে আছে। কিন্তু ব্রতকথার পিছনে একটি ব্রতের ভাগ আর একটি কথার অংশ এঁদেরই সযত্ননিষ্ঠায় পুরুষশাসিত সমাজের মদকলকরীর চরণ-বিমর্দনের দুর্ভাগ্য বাঁচিয়ে এখন পর্যন্ত টিকে রয়েছে।

আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যের যে অংশে গল্প সে অংশ রাজা রাজপুত্র ও ঋষি, স্বর্গবারাঙ্গণা রাজকন্যা আর মুনিকন্যার কাহিনী। বৌদ্ধ কাহিনীগুলিতে আমরা যেমন সাধারণ জীবনের পটভূমিকায় নীতিপ্রচার লক্ষ্য করি তেমনি নীতিপ্রচার পাই মনুষ্যেতর প্রাণিজীবনের পটভূমিকায় পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশে। জৈন কাহিনীগুলিও বৌদ্ধ কাহিনীর ন্যায়। সেগুলিতে নীতি-মাহাত্ম্য কথকের লক্ষ্য হ'লেও সে উপলক্ষে যে গল্পরসের প্রাপ্তি তা'তে নিশ্চয়ই কোনও গল্পরসিক পরাঙ্মুখ হবেন না। বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসের পিছনে আমরা প্রধানতঃ তিনটি ভাষায় প্রবাহিত কাহিনীধারার সন্ধান পাই সংস্কৃত, পালি ও অর্ধমাগধীতে। হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের গল্প, চণ্ডী, মনসা-বেহুলা-লখিন্দর-চাঁদসদাগরের গল্প, ধনপতি সদাগরের গল্প, লাউসেনের গল্প, মৈমনসিংহের প্রেমের গল্প, অচিনপুরের রাজপুত্র আর রাক্ষস খোক্কস, রাম সীতা, পঞ্চপাণ্ডব—কেবল এদের কাহিনী নিয়েই নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর হাজার বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি গুণ দিন কাটে নি। আরও অনেক গল্প-কাহিনী হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু যে-নদী মরুপথে ধারা হারিয়েছে তারা দৃশ্যতঃ হারিয়ে গেলেও অবন্তরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। এই গল্প বলা আর গল্প শোনার ধারা-প্রবাহে আধুনিককালের বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ। যদিও আমাদের দেশে গল্প-কাহিনীর ধারা স্পষ্টতঃ প্রবাহিত হ'য়ে আধুনিককালের গল্প, উপন্যাসে বিবর্তিত হয়নি, তবুও বাঙ্গালীর গল্প-বুভুক্ষু মনের অগ্নি প্রাগাধুনিক এবম্বিধ গল্প-সমিধের দ্বারাই সন্ধুক্ষিত হয়েছে, বিবৃদ্ধি পেয়েছে। সে-গল্পকাহিনীর বাহন পদ্য ছিল, কোথাও কোথাও গদ্য ছিল। প্রতিদিনের আটপৌরে পোষাকের ন্যায় সেই গদ্য গল্প জীর্ণতা ও অনাদর এড়িয়ে আজ পর্যন্ত টিকে থাকে নি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। দামী শাটিকাগুলি

যেমন ক্রিয়াকর্মের উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হ'য়ে দৈনন্দিন অপ্রয়োজনে বেঁচে থাকে, আমাদের সাহিত্যের দামী গল্পগুলি পদ্যের অনতিপ্রাত্যহিকতার দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে বেঁচে আছে। আর শুধু বেঁচে আছে নয়, এ বিভ্রমও উৎপাদন করেছে যে, আমরা বাঙ্গালীরা শ দুয়েক বছরের আগে কবিতা ছাড়া আর কিছুতেই আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতাম না···নিছক কবিতাই ছিল আমাদের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। প্রমাণ অপেক্ষা যুক্তিনিষ্ঠ অনুমানকে ছোট মনে করিনা। আর তাই মনে হয় বাঙ্গালা হাজার বছরে অনেক গল্প বলেছে, অনেক গদ্যসাহিত্যের ধারা-প্রবাহ বয়েছে জীবনের উর্বর ক্ষেত্রে···তা আজ প্রমাণের পরিচিহ্নহীন রূপকথার সামগ্রী। তার কিছু কিছু প্রমাণ রয়েছে এখানে সেখানে—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিরচিত এবং লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আবিষ্কৃত গদ্য গল্প কাহিনীটি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

গদ্যে গল্প কাহিনীর ধারাসূত্র হারিয়ে গিয়েছে। পদ্যে আমরা কাহিনী আর সঙ্গীতকে একই সূত্রে বেঁধে বাঁচিয়ে রেখেছি। মঙ্গলকাব্যের গান গেয়েছে বাঙ্গালী—সে গানের নানা সুরের মধ্য দিয়ে বেহুলা, চাঁদসদাগর, কালকেতু, ধনপতি সকলের চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর গানে রাধা-কৃষ্ণের পালার আস্বাদন করেছে রসিক মন। 'মৈমনসিংহ গীতিকা', 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনী-কবিতার মধ্যে অমরত্ব লাভ করেছে। গানের সুরের আসন পাবার দাবী পেতে বাঙ্গালী রামায়ণ, মহাভারত, গোরক্ষনাথ গোপীচাঁদ, পদ্মাবতী প্রভৃতির কাহিনীকে অভ্যর্থনা করেছে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে। গদ্যে কাহিনী রচিত যে হয়নি একেবারে তা নয়··· কিন্তু নানা কারণে তা অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষিত হয়নি। তবে প্রাগ্-বঙ্কিম যুগে বাঙ্গালী যে 'লয়লা মজনু', 'চাহার-দরবেশ', 'গোলেবকাওলী' প্রভৃতির কিস্‌সা পাঠ করত তাতে আরবী-ফারসীর সঙ্গে বাংলার বন্ধন হয়েছিল বটে···কিন্তু সে-বন্ধন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভারতসংস্কৃতিতে মুসলমানী প্রভাব যত ব্যাপক ও গভীর, সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইংরাজ পূর্ব বিজয়ী মুসলমানের গল্প-কাহিনী তেমন প্রভাব রেখে যেতে পারেনি। বাংলাদেশের গদ্য-সাহিত্য ইংরাজী প্রাণনা ও বাঙ্গালীর মননশক্তির বিচিত্র রূপ। সে-সাহিত্যের জন্মলগ্ন ঊনবিংশ শতাব্দী। সে-গদ্যসাহিত্যের কথাকাহিনীশাখায় প্রথম যুগের সর্বপ্রধান সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বাঙ্গালীকে সেদিন তুলেছিল জাগিয়ে। নবসংস্কৃতির

পীঠস্থান বাংলাদেশে ইংরাজি শিক্ষার আদর্শে গদ্যে সামাজিক নক্সা (Society sketch) সুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩) তার প্রথম উল্লেখযোগ্য ফল। এর পর উল্লেখযোগ্য এবম্বিধ রচনার মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৭ ?) ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র (১৮৬২) নাম করা যেতে পারে। 'আলালের ঘরের দুলাল', ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'বঙ্গভাষার প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস।' এ বিষয়ে মতানৈক্যের যথেষ্ট কারণ আছে...এবং আমার মনে হয় 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা উপন্যাস-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হ'লেও উপন্যাস নয়, সর্বাঙ্গসুন্দর নয় এবং সম্পূর্ণাবয়ব নয়। আর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' নক্সা হিসেবে অনবদ্য সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র 'আলালের ঘরের দুলাল' অপেক্ষা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'কে অনেক নিম্নস্তরের সাহিত্যসৃষ্টি বলে মন্তব্য করেছেন বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয় 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' 'নক্সা'ই...তা উপন্যাস হবার চেষ্টা করেনি। আর হুতোমের তীব্র শ্লেষপূর্ণ কশাঘাতে, পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতায়, প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ যে জিনিস সৃষ্টি হয়েছে তা সর্বত্র অনিন্দনীয় না হ'লেও 'অসাধারণচমৎকারকারিণীরচনা' হয়েছে বহু স্থলেই। তা স্বতন্ত্রমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদিতা ও ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত সত্ত্বেও আমরা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'কে 'ভাঁড়ামির পর্যায়ভুক্ত অমার্জিত রসিকতার পরিচয়' বলতে পারি না।

॥ ২ ॥

প্রাগ্‌বঙ্কিম কথাকাহিনীর ক্ষেত্রে একজনের নাম উল্লিখিত হওয়ার দাবী কারো অপেক্ষা কম নয়—আমরা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম উল্লেখ করছি। 'কথামালা', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা'র লেখক বিদ্যাসাগরকে আমরা ভুলে যাই বাংলা গদ্যে কথাকাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে। প্রাগাধুনিক যুগে সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছিল কবিতা। তাই কবিতায় কাহিনী, ধর্মগ্রন্থ, জীবনী, শাস্ত্র সবই লেখা হয়েছে। আধুনিক কালে এতদিনের অনাদৃত গদ্যকে প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতা হ'তে উদ্ধার করেছে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা...আজ আধুনিক সাহিত্যের প্রধান বাহন গদ্য। তাই একদা যে-কাহিনীতে কবিতা ছিল প্রচুর, বিদ্যাসাগর মহাশয় শকুন্তলার সে-কাহিনী পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলা কবিতাকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রেখেছেন, সম্পূর্ণ গদ্যে তিনি শকুন্তলা উপহার দিয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী কেবল অপরের কাহিনীর অনুবাদ

অনুসরণ ক্ষেত্রেই ধাবিত হয়নি। তিনি কেবল সেক্সপীয়ার অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস' আর হিন্দী 'বেতালপচীসী' অবলম্বনে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনা করেন নি। তাঁর দ্বারা লিখিত গল্পও আছে যা কেবল মৌলিক নয়—রসসমৃদ্ধও বটে। আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেনামী রচনার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি কাহিনীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।*

এই নমুনাগুলি থেকেই পাঠকেরা বুঝতে পারবেন গুরুগম্ভীর বিদ্যাসাগর কতদূর পরম রসিক ছিলেন। তাঁর রচনার ভেতর অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, অপূর্ব সমাজ সমালোচনা, অপূর্ব জীবন-প্রীতিও অদ্ভুতভাবে ধরা পড়েছে।

নমুনা হিসেবে এখানে বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনাগুলি হতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো। প্রথম উদ্ধৃতিটি চুটকি শ্রেণীর। তা হতে তাঁর প্রতিপক্ষকে পযুদস্ত করার সময়েও তাঁর পরিহাস-প্রবৃত্তি কতখানি প্রবল ছিল তার উদাহরণ মিলবে। ব্রজনাথ ও ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধতা করে ঈশ্বরচন্দ্রকে যে বিশ্রী ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছিলেন, মনে রাখতে হবে এটি তারই পাল্টা জবাব :—

"আমি এ স্থলে শ্রীমান ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে নদীয়ার চাঁদ বলিলাম। কিন্তু শ্রীমতী যশোহর হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা দেবী, ইতিপূর্বে, শ্রীমান্ ভুবনমোহন বিদ্যারত্নকে

* বেনামী রচনাগুলি বিদ্যাসাগরের কিনা অনেকের সন্দেহ আছে। কিন্তু (ক) ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন প্রভৃতি এগুলি বিদ্যাসাগরের রচনা বলেই গ্রহণ করেছেন; (খ) বিদ্যাসাগরের press থেকেই গ্রন্থগুলি মুদ্রিত; (গ) গ্রন্থগুলির ভিতর গ্রন্থকার পরিহাস প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরকে 'হতভাগা বেটা' এবং 'বিদ্যাসাগর বাবাজি সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতেন' ব'লে উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগরের সময়ে বিদ্যাসাগরের প্রেস থেকে বই ছাপতে দিয়ে অন্য কেউ বিদ্যাসাগরকে এই অপমান করতে সাহস করতেন না। এ বিদ্যাসাগরের নিজেরই মজা লোটার প্রবৃত্তি; (ঘ) আমার বাবা হ'তেন বিদ্যাসাগরের নাতি। তাঁর বইয়ের ভিতর 'রত্নপরীক্ষা' বইখানি পেয়েছি, তা অতি যত্ন করে বাঁধান আর তার কোনও কোনও জায়গায় কীটদষ্ট ভূমিকা পর্যন্ত মার্জিনে সম্পূর্ণ নূতন কোরে কালি দিয়ে লেখা আছে, পাছে কোনও জিনিস পাঠকেরা miss করেন এই ভয়ে। বিশেষ করে এই বই সম্বন্ধে এত অনুরাগের কারণ কি? বিদ্যাসাগরের অর্থাৎ তাঁর দাদামশায়ের বই বলে নয়কি? (ঙ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর ভিতর এই বেনামী রচনাগুলি স্থান পেয়েছে এবং রচনাগুলি যে বিদ্যাসাগরের সে সম্বন্ধে একাধিক প্রমাণ প্রয়োগ ক'রে পাঠকদের নিঃসংশয় করা হয়েছে।

নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদীয়ার চাঁদ বলিয়াছেন। উভয়েই বিদ্যারত্ন উপাধিধারী, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য, বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ও উভয়ের একই ধরণের। সুতরাং উভয়েই নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদীয়ার চাঁদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এ পর্যন্ত এক সময়ে দুই চাঁদ দেখা যায় নাই। সুতরাং একজন বই, দুজনের নদীয়ার চাঁদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে, একজন একেবারেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভাল দেখায় না; এবং ঐ উপলক্ষে দুজনে হুড়াহুড়ি ও গুঁতগুঁতি করিয়া মরিবেন, সেটাও ভাল দেখায় না। এজন্য আমার বিবেচনায়, সমাংশ করিয়া, দুজনকেই, এক এক অর্ধচন্দ্র দিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া, বিদায় করা উচিত।"

আবার :—

"কিছুদিন হইল, অধুনা লোকান্তরবাসী, এক চিরস্মরণীয়, বহুদর্শী বিচক্ষণ, 'পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বে মূর্খে দোষা হি কেবলম্' এই নীতিবাক্যের, 'পণ্ডিতের সব গুন, দোষের মধ্যে বেটারা বড় মূর্খ'; এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। নিবিষ্টচিত্তে, বিশিষ্টরূপ বিবেচনা করিয়া বলুন দেখি, এই চমৎকারিণী ব্যাখ্যা সর্বাংশে সুসঙ্গত বলিয়া নির্বিবাদে প্রতিপন্ন হয় কি না।"

এর পর বিদ্যাসাগরের দুটি ছোট গল্প দেখুন :—

বিদ্যাসাগর রচিত একটি ছোট গল্প

"এক গ্রামে দুই বিদ্যাবাগীশ খুড় ছিলেন। ইঁহারা দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ নৈয়ায়িক, কনিষ্ঠ স্মার্ত। একদিন, এক ব্যক্তি ব্যবস্থা জানিতে গিয়াছিলেন। স্মার্ত বিদ্যাবাগীশ বাটীতে নাই শুনিয়া, তিনি চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, নৈয়ায়িক বিদ্যাবাগীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্যে আসিয়াছ। তিনি কহিলেন, আমার একটি তিন বৎসরের দৌহিত্র মরিয়াছে; তাহাকে পুতিব বা পোড়াইব, ইহার ব্যবস্থা জানিতে আসিয়াছি। নৈয়ায়িক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, তাহাকে পুতিয়া ফেল। সে ব্যক্তি জানিতেন, তিন বৎসরের ছেলেকে পোড়াইতে হয়, পুঁতিতে হয় না; তথাপি, সন্দেহ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে, পুতিতে হইবে, এই ব্যবস্থা শুনিয়া তিনি সন্দিগ্ধ মনে ফিরিয়া যাইতেছেন; এমন সময়ে পথিমধ্যে, স্মার্তের সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসিলেন, পুতিব না পোড়াইব। তিনি পোড়াইতে বলিলেন। তখন সে ব্যক্তি কহিলেন, তবে

বড মহাশয় পুতিতে বলিলেন, কেন। স্মার্ত, জ্যেষ্ঠেব মান বক্ষার জন্য, কহিলেন, তিনি পবিহাস কবিযাছেন। অনন্তব তিনি বাটীতে গিয়া জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, কি বুঝিযা আপনি এরূপ ব্যবস্থা দিলেন, পোড়াইবাব স্থলে পুতিতে বলা অতি অন্যায হইযাছে। নৈয়াযিক কহিলেন, আমি, অনেক বিবেচনা কবিয়াই, পুতিতে বলিযাছি। পুতিযা বাখিলে, যদি পোড়াইবাব দবকাব হয, তুলিযা পোড়াইতে পাবিবেক, কিন্তু যদি পোড়াইতে বলিতাম, তখন পোড়াইযা ফেলিলে, যদি পুতিবাব দবকাব হইত, তখন কোথায পাইত।" —ব্রজবিলাস

বিদ্যাসাগরের রচিত আর একটি ছোট গল্প

"কিছুকাল পূর্বে, এই পবম পবিত্র গৌড় দেশে, কৃষ্ণহবি শিবোমণি নামে, এক সুপণ্ডিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইযাছিলেন যাহাবা তাহাব কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক মধ্যবযস্কা বিধবা নাবী, প্রত্যহ, তাব কথা শুনিতে যাইতেন কথা শুনিয়া, তিনি মোহিত হইযাছিলেন, যে তিনি, অবাধে সন্ধ্যাব পব, তাহাব বাসায গিযা, তদীয পবিচর্যায নিযুক্ত থাকিতেন ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিযা, অবশেষে, ঐ বিধবা বমণী গুণমণি শিবোমণি মহাশযেব প্রকৃত সেবাদাসী হইযা পড়িলেন।

একদিন, শিবোমণি মহাশয, ব্যাসাসনে আসীন হইযা, স্ত্রী জাতিব ব্যভিচাব বিষযে অশেষবিধ দোষ কীর্তন কবিযা, পবিশেষে কহিযাছিলেন, 'যে নাবী পবপুরুষে উপগতা হয, নবকে গিযা, তাহাকে অনন্তকাল, যৎপবোনাস্তি কষ্ট ভোগ কবিতে হয। নবকে এক লৌহময শাল্মলী বৃক্ষ আছে তাহাব স্কন্দদেশ, অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পবিপূর্ণ। যমদূতেবা ব্যভিচাবিণীকে, সেই ভযঙ্কব শাল্মলী বৃক্ষেব নিকটে লইযা গিযা বলে, তুমি জীবদ্দশায, প্রাণাধিক প্রিয উপপতিকে, নিবতিশয প্রেমভবে, যেরূপ গাঢ আলিঙ্গন দান কবিতে, এক্ষণে, এই শাল্মলী বৃক্ষকে উপপতি ভাবিযা, সেইরূপ গাঢ আলিঙ্গন দান কব। সে ভযে অগ্রসব হইতে না পাবিলে,যম দূতেবা, যথাবিহিত প্রহাব ও যথোচিত তিবস্কাব কবিয বলপূর্বক তাহাকে আলিঙ্গন করায, তাহাব সর্বশবীব ক্ষত বিক্ষত হইযা যায, অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকে ; সে যাতনায অস্থিব ও মৃতপ্রায হইযা, অতি করুণস্বরে বিলাপ, পবিতাপ ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই সমস্ত অনুধাবন কবিযা, কোনও স্ত্রীলোকেবই, অকিঞ্চিৎকব, ক্ষণিকসুখের অভিলাষে, পবপুরুষে উপগতা হওযা উচিত নহে', ইত্যাদি।

ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগ বৃত্তান্ত শ্রবণে, কথক চূড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যাহা করিয়াছি তাহার আর চারা নাই; অতঃপর, আর আমি প্রাণান্তেও পরপুরুষে উপগতা হইব না।' সে দিন সন্ধ্যার পর, তিনি পূর্ববৎ, শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া, যথাবৎ আর আর পরিচর্যা করিলেন; কিন্তু অন্যান্য দিবসের মত, তাঁহার চরণ সেবার জন্য, যথাসময়ে তদীয় শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন না।

শিরোমণি মহাশয়, কিয়ৎক্ষণ, অপেক্ষা করিলেন; অবশেষে, বিলম্ব দর্শনে অধৈর্য হইয়া তাঁহার নামগ্রহণ পূর্বক, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেবাদাসী, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন; এবং গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, গলদশ্রু লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিলেন, 'প্রভো! কৃপা করিয়া, আমায় ক্ষমা করুন। সিমুল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি; আপনকার চরণ সেবা করিতে, আর আমার কোনও মতে প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছে না। না জানিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে কেমনে নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি।'

সেবাদাসীর কথা শুনিয়া, পণ্ডিত চূড়ামণি শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; এবং দ্বারদেশে আসিয়া, সেবাদাসীর হস্ত ধরিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, 'আরে পাগলি। তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছ না? আমরা পূর্বাপর যেরূপ বলিয়া আসিতেছি, আজও সেইরূপ বলিয়াছি। সিমুল গাছ পূর্বে ঐরূপ ভয়ঙ্কর ছিল যথার্থ বটে; কিন্তু শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে লৌহময় কণ্টক সকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে, সিমুল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে। এখন আলিঙ্গন করিলে, সর্বশরীর শীতল ও পুলকিত হয়।' এই বলিয়া অভয়দান ও প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক শয্যায় লইয়া গিয়া গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাহাকে পূর্ববৎ চরণ সেবায় প্রবৃত্ত করিলেন।" (—ব্রজবিলাস)

ঈশ্বরচন্দ্র যে অত্যন্ত সুন্দর ছোট গল্প লিখতেন, তার নমুনা আরও অনেক আছে। 'রত্নপরীক্ষা'তে দুটি সুন্দর ছোট গল্প ও 'ব্রজবিলাস' গ্রন্থে অনেক স্থলেই অনেক সুন্দর ছোট গল্প রচনা ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র আপন রসসৃজনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের হাস্যরসিক হিসেবে কোনও স্থান

স্বীকৃত হয়নি। পাঠকেরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী'র বেনামী রচনাগুলি পাঠ করবেন। তারপর তাঁরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, 'এমন modern বাংলা লেখক এবং হাস্যরসস্রষ্টা বাংলা সাহিত্যে সে-যুগে বিরল।'

॥ ৩ ॥

বিদ্যাসাগর মহাশয় গল্প বলেছেন বটে কিন্তু সে-গল্প অনুবাদ-অনুসরণ আর চুটকি শ্রেণীর। তার মধ্যে সংস্কৃত, ইংরাজী আর হিন্দীর ঋণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা-কাহিনীর মধ্যে সেই ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ ঐশ্বর্য ছিলনা যা বঙ্কিমচন্দ্রের কথা-কাহিনী-প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজকে যে-পরিমাণ দান করেছেন কথা-সাহিত্যকে সে পরিমাণ দান করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বে কথা-কাহিনীর ক্ষেত্রে আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। ভূদেব মুখোপাধ্যায় কেবল প্রবন্ধকার ছিলেন না। যেখানে গল্পের ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল সেদিকেও তিনি হাজির হয়েছিলেন। কথা-কাহিনীর ক্ষেত্রে অনুবাদের মধ্য দিয়ে বঙ্গভারতীর সেবা বিষয়ে তিনি এসেছিলেন এগিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রকাশের পূর্বে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রকাশ করেন। ভূদেববাবুর এই গ্রন্থের প্রকাশ কাল ১৮৬২ সাল হ'লেও এর রচনা কাল ১৮৫৭। সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে এর বিলম্বিত প্রকাশের কোনও যোগ আছে কিনা জানা যায় না। এই বইয়ের 'সফল স্বপ্ন' আর 'অঙ্গুরীয-বিনিময়' গল্প দুটি 'Romance of History' হ'তে গৃহীত। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ও 'Romance of History' হ'তে 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৭-৫৮) ও 'বিচিত্রবীর্য' (১৮৬২) রচনা করেন। এই ঐতিহাসিক নামধেয় কল্পিত কাহিনীর শীর্ণধারা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে প্রবাহিত হ'লেও বঙ্কিমচন্দ্রের ভরাস্রোতের দান না পেলে তা কবে মরুপথে ধারা হারিয়ে ফেলত। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য গদ্যে কাহিনী পরিবেশনের ক্ষেত্রে কালগত বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা অগ্রণী হ'লেও গুণগত বিচারে একেবারেই অগ্র-গণ্য নন।

বঙ্কিমের পূর্ববর্তী এমন কি প্যারীচাঁদেরও পূর্ববর্তী বাংলা কথা-কাহিনীর আর একটি রচনার দিকে সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। গ্রন্থটি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট এ্যাণ্ড বুক-সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত ও ছাপা

ক্যাথেরীন ম্যুলেন্স লিখিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ।' এই গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য বিষয়ে আমার শ্রদ্ধেয় দুই বন্ধু বিপরীত মতাবলম্বী। ডক্টর শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "শ্রীমতী ম্যুলেন্সের বাংলা উপন্যাস প্যারীচাঁদের 'আলালের' পূর্বেই রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কাহিনী, চরিত্র, ভাষা প্রভৃতি আলোচনা করিলে ইহাকে কোনদিক দিয়াই নিন্দা করা যায় না।...সে যুগে এরূপ সরল সাধু-ভাষায় আখ্যায়িকা রচনা অসম্ভব বলিলেই হয়।"

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' একেবারে গুরুত্বহীন।"* আমার ব্যক্তিগত মত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বা 'আলালের ঘরের দুলাল' কোনওটিই উপন্যাস নয়। কালানুগত আলোচনায় 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও রচনার রস বিচারে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সঙ্গে গ্রন্থটির তুলনাই চলে না। আলাল অনেক জীবন্ত।

বাংলা সাহিত্যের প্রাগ্‌বঙ্কিম কথা-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি নাম যোগ করা উচিত। এঁদের রচনা সম্বন্ধে কোনও বিবরণ কোথাও পড়েছি বলে মনে করতে পারছি না। কলিকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে British Museum Catalogue of Bengali Books, Vol I এ নিম্নলিখিত কয়েকটি বাংলা বই সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পেয়েছি। গ্রন্থগুলি হ'ল—

(১) চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান। ১৮৫৯।—পরিচয় লেখা আছে, বাঙ্গালী জীবনের কাহিনী। অরুণোদয়, শ্রীরামপুর হতে পুনর্মুদ্রিত ("a tale of Bengali life. Reprinted from the Arunoday, Serampore, 1859")।

(২) হেমপ্রভা (১৮৫৯)—দ্বারকানাথ গুপ্ত লিখিত একটি বাংলা উপন্যাস ("a Bengali Novel" (1859) by Dwarkanath Gupta)।

এই সকল গ্রন্থ এবং আরও অনেক গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাঙ্গালীর গল্পপিপাসু মনের তাগিদে রচিত হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমের পূর্বে বাংলা কথাসাহিত্য যা ছিল তা অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ববিদের আলোচিতব্য বিষয়। সাহিত্যের লক্ষ্য হোল রস সৃষ্টি করা। তা পরিবেষণে হবে অভিনব আর

* বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ: শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ বিষয়ে এই ধরণের বিশ্লেষণাত্মক ও পুনর্গঠনমূলক পদ্ধতিতে আলোচনা আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আর একটিও হয়নি...এমন নীরব উপেক্ষাও লাভ করেনি কোন গ্রন্থ।

আস্বাদনে হবে চিরন্তন। তা নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথ্বীর রসলোকে নিত্য আনন্দের সামগ্রী। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী কথাকাহিনী আমাদের বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত। বঙ্কিমচন্দ্র আজও আমাদের আনন্দ-বেদনার নিত্যসঙ্গী। মহাকাল তাঁকে সোনার তরীতে গ্রহণ করেছে। তাই একথা বলতে গেলে অতিভাষণ হবে না যে, সত্যকার বাংলা কথাসাহিত্যের সূচনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) হ'তে। বাংলা সাহিত্যের 'মরা গাঙ্গে' এর পূর্বে রসস্রোতের দূরস্থিত ধ্বনি এসেছিল, হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্র প্রবল জোয়ারের প্রচণ্ড বেগ নিয়ে সেই পূর্বশ্রুতির প্রতিভাদীপ্ত পরিণামরূপে আবির্ভূত হ'লেন। বাংলা সাহিত্যের কবিতা-নিবন্ধ-গল্প-উপন্যাস শাখায় সে দানের তালিকা হ'ল :—

১। ললিতা ও মানস (১৮৫৬) ... কবিতা
২। Rajmohan's Wife (১৮৬৪) ... ইংরাজী উপন্যাস
৩। দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) ... বাংলা রোমান্স
৪। কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) ... উপন্যাস-রোমান্স
৫। মৃণালিনী (১৮৬৯) ... ঐ
৬। বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) ... উপন্যাস
৭। ইন্দিরা (১৮৭৩) ... গল্প
[ঐ (১৮৯৩) ... ঐ বর্ধিত]
৮। যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪) ... গল্প
৯। লোকরহস্য (১৮৭৪) ... কৌতুকধর্মী রচনা
১০। বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫) ... নিবন্ধ
১১। চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) ... উপন্যাস-রোমান্স
১২। রাধারাণী (১৮৭৫) ... গল্প
[ঐ (১৮৯৩) ... বর্ধিত]
১৩। কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫) ... রচনা সাহিত্য
১৪। রজনী (১৮৭৭) ... উপন্যাস
১৫। দীনবন্ধু মিত্র (১৮৭৭) ... জীবনী ও সাহিত্যালোচনা
১৬। কবিতা পুস্তক (১৮৭৮) ... কবিতা সংকলন
১৭। কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) ... উপন্যাস
১৮। প্রবন্ধ পুস্তক (১৮৭৯) ... প্রবন্ধ

১৯।	সাম্য	(১৮৭৯)	...	প্রবন্ধ
২০।	রাজসিংহ	(১৮৮২)	...	উপন্যাস
২১।	আনন্দমঠ	(১৮৮৪)	...	উপন্যাস
২২।	মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত	(১৮৮৪)	...	সরস কাহিনী
২৩।	দেবী চৌধুরাণী	(১৮৮৪)	...	উপন্যাস
২৪।	কৃষ্ণচরিত্র	(১৮৮৬)	...	প্রবন্ধ
২৫।	সীতারাম	(১৮৮৭)	...	উপন্যাস
২৬।	বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ)	(১৮৮৭)	...	প্রবন্ধ
২৭।	ধর্মতত্ত্ব ও অনুশীলন	(১৮৮৮)	...	প্রবন্ধ
২৮।	বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ)	(১৮৯২)	..	প্রবন্ধ
২৯।	শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা [রচনা কাল ১৮৮৬-৮৮]	(১৯০২)	...	গীতা ব্যাখ্যা
৩০।	বারিবাহিনী (অসম্পূর্ণ)		...	

এই দীর্ঘ তালিকার মধ্যে আমাদের বর্তমান গ্রন্থে আলোচিতব্য কেবল সেই রচনাগুলি যেগুলি কথাকাহিনীর পর্যায়ভুক্ত। আমরা এ গ্রন্থে তার অপূর্ব নিবন্ধ নিয়ে আলোচনা করব না...'রচনা সাহিত্য' আমাদের আলোচনা-বহির্ভূত। শুধু একবার যুগস্রষ্টা বঙ্কিমের কথাকাহিনীর মধ্যে ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণের পূর্বে একথা বলা আবশ্যক মনে করি, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রেই প্রচণ্ড force নন...সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর দান ও প্রভাব অজস্র ও বিপুল। সমগ্র উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত সাহিত্যের আধুনিকীকরণে তাঁর কাছে চিরঋণী। হিন্দী-আসামী-ওড়িয়া হ'তে সুরু ক'রে কন্নড়-তামিল পর্যন্ত ভাষা গল্প-উপন্যাস-নিবন্ধ-রচনা প্রভৃতি সাহিত্যশাখায় প্রাণশক্তি এই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে কম পায়নি। গ্রন্থ-পরিশেষে সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা ক'রব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিভার ক্রমবিকাশে 'দুর্গেশনন্দিনী'

॥ ১ ॥ রূপকথা : রোমান্স ঃ উপন্যাস

উপন্যাস বস্তুটি আমাদের দেশে একশ বছরের আগন্তুক যদিও কথাটি পুরোনো। সংস্কৃতে কল্পিত কাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কথাটি। কিন্তু গদ্যে রচিত এক বিশেষ ধরণের কল্পিত কাহিনীরূপে ইংরেজী নভেলের প্রতিশব্দ হিসেবে এ কথাটির ব্যবহার খুব বেশী দিনের নয়। মোটামুটি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে উপন্যাসের সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র হ'তে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র জগৎ সিংহকে গড়মান্দারণের পথে রোমান্সের জগতে নিয়ে গেছেন। ওয়াল্টার স্কটের আদর্শ অনুসরণ ক'রে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় ইতিহাসের মোগল পাঠানের বিরোধবিক্ষোভের মধ্যে কাহিনীর উপাদান খুঁজে নিয়েছেন। জগৎ ও জীবন-কেন্দ্রিক ব্যাপকতর রহস্যবোধ বঙ্কিমচন্দ্রকে রোমান্সের ক্ষেত্র হ'তে আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত পৃথিবীর মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বই দুটিতে। তবু সেখানেও উঁচু সুরের কথাবার্তা, নির্বাচিত বিশেষ ঘটনার প্রবাহ, বিষপান, পলায়ন, রহস্যময় পুনরাবির্ভাব, জলনিমজ্জন, পিস্তল ব্যবহারের ঘনঘটায় আমাদের জীবনপ্রবাহের মধ্যে দূর রোমান্সের তরঙ্গচাঞ্চল্য যেন অনুভব করা যায়। অবশ্য রোমান্সের স্থান কাল পাত্র যথা, অসি ঝন্ ঝন্, আগ্রাপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র, নারীর পুরুষবেশ ধারণ, জনহীন অরণ্যে কাপালিক, নিবিড় নীল নীরদমালায় ভৈরবী, সম্মোহন বিদ্যার প্রয়োগ, অন্ধের চক্ষুপ্রাপ্তি প্রভৃতি নেই। তবু বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থে আমাদের সমস্যা-সমাকীর্ণ বাস্তব সমাজের ওপরে দূর-নক্ষত্রের রসরহস্যমধুর আলোকধারা বর্ষণ করেছেন।

রোমান্সের ক্ষেত্র রূপকথা ও উপন্যাসের মধ্যবর্তী। একদিকে রূপকথার অতিপ্রাকৃত, অপরদিকে উপন্যাসের প্রাকৃতের আতিশয্য। একদিকে নাম-না জানা দেশের ইতিহাসের স্পর্শবিমুক্ত মনুষ্য-দেহধারী রাজপুত্র, পক্ষিরাজ ঘোড়া, ব্যংগমা-ব্যংগমী, অরণ্যের নিভৃত স্নেহচ্ছায়ায় মরণঘুমে অচেতন রাজপুরী, সোনার

কাঠি রূপোর কাঠির ছড়াছড়ি, রাক্ষসরাক্ষসী, খোক্কসখোক্কসী, ময়নাপাখির শরীরের ভেতর দৈত্যের প্রাণ লুক্কায়িত। আর একদিকে—আমাদের সংসারের অনতি-বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সমস্যা, সংস্কার ও শাসন-বদ্ধ জীবনের ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমি। ভাঙা ঘরে চাঁদের আলোর মত এ রিক্ত নিরানন্দ জীবনের মধ্যে আবির্ভূত হয় *প্রেম; সে-প্রেমের সঞ্জীবনী স্পর্শে জীবনের শাখায় বসন্তের কিশলয় আবির্ভূত হয়* রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পুনরুজ্জীবিতা অহল্যার মতো। যৌবনলক্ষণাক্রান্ত হয়ে ওঠে জীবন। আর সে-প্রেমের আঁকাবাঁকা পথে কত প্রতিকূলতা, কত সমাজের সংকট-সঙ্কোচের বিহ্বলতা। আমাদের বিধিবদ্ধ জীবনের অবদমিত যৌবন সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বাইরে প্রেমের বীর্যে বীর্যবান হ'য়ে বিদ্রোহ জানায়। উপন্যাসে এই প্রেমই প্রধান অবলম্বন, এই সমাজই ঘটনাস্থল, বর্তমান পৃথিবী কাহিনীর কাল আর পরিচিত নরনারী উপন্যাসের পাত্রপাত্রী।

রোমান্সের আলো-আঁধার ঘেরা জগতে আমরা রূপকথার অবাস্তবতাকেও পাই না, উপন্যাসের অতি-বাস্তবতাকেও লাভ করি না। বর্তমান পৃথিবী বড় বেশী মাত্রায় বিষয়বিষবিকারজীর্ণ। রূপকথার জগৎ বিষয়-বিবক্ত। তারই মাঝে রোমান্সের আনন্দলোক। তার ঘটনাস্থল নাম-না-জানা দেশ নয়, তার পাত্র অচিন্‌পুরের রাজপুত্র নয়। নায়িকা কঙ্কাবতী নয়। তালপাতার খাঁড়া দিয়ে নায়কনায়িকার মিলনের মস্ত প্রতিবন্ধক দৈত্যকে বিনারক্তপাতে বিদূরিত করা হয় না। কিন্তু উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মত রোমান্সের নায়কনায়িকা আমাদের ব্যথাজর্জর জগতের প্রতিবেশী নয়। প্রেমজনিত আশাভঙ্গের বেদনা হৃদয়কে বিহ্বল করে না। তাই দেখি অচিন্‌পুরের রাজপুত্র না হ'লেও অতীতকালের রাজপুত্র জগৎসিংহ এক শৈলেশ্বরের মন্দিরে চকিত চাহনির স্পর্শেই তিলোত্তমাকে সঞ্জীবিত করেছে; সঞ্জীবিত করেছে আয়েষার ঘুমন্ত-হৃদয়পুরীর মধ্যে যৌবনবেদনারস-উচ্ছলতাকে। আর এক রকম বিনা রক্ত-পাতেই বিনা আন্তর বেদনাতে ওস্‌মানের প্রাতিকূল্যকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে গিয়েছে। রূপকথা-রাজ্যের সাত সমুদ্র তের নদীর পারবর্তী জনহীন অরণ্যের নিভৃত নিরালায় নিঝুমপুরী না থাকলেও সাগরপারবর্তী এক জনহীন অরণ্যের মধ্যে পথভ্রষ্ট নবকুমার গোধূলির ম্লান আলোকে এক অচিরোদ্ভিন্নযৌবনার অপ্রত্যাশিত পরিচয় লাভ করেছে। তালপাতার খাঁড়া দিয়ে রাজপুত্র যত অবলীলাক্রমে দৈত্যকে বিনাশ ক'রেছিল,

তেমনি ক'রেই অনতিপরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে সঙ্গে নিয়ে কাপালিকের হাত থেকে সাময়িক মুক্তিলাভ করেছে। অচিনপুরের রাজপুত্র রাজকন্যা কঙ্কাবতীকে নিয়ে নিজের দেশে ফিরেছে—তারপরেই কথা ফুরিয়েছে, নটে গাছটি মুড়িয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমারও বনকুমারীর সাথে মিলিত হয়েছে। রূপকথা এখানেই শেষ হ'ত। উপন্যাস ব'লে তারপরেই কথা সুরু হ'য়েছে। সুরু হয়েছে উপন্যাস। 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে আয়েষার বেদনার স্পর্শটুকু সন্ধী ংশেরের ক্ষীণবেশের মত চিত্তকে স্পর্শ ক'রে চলে গিয়েছে। কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্ত রোমান্সের ক্ষেত্র হ'তে উপন্যাসের পরিচিত জগতে প্রবেশ ক'রে পৃথিবীর বিননিশ্বাসকেও কিছুটা গ্রহণ করেছে। তাই নবকুমার বনকুমারীকে কাছে পেয়েছে বটে, কিন্তু কিছুই পায় নি। এখানেই উপন্যাসের সুর বা সুরু। কপালকুণ্ডলা এসেছে, অরণ্য থেকে নিয়ে এসেছে আরণ্য সংস্কার, যা তার মর্মমূলে। নবকুমার চায় সংসারের সুখ, কপালকুণ্ডলা চায় অরণ্যের অবাধ আনন্দ। নবকুমারের কাছে সমাজ সত্য, কপালকুণ্ডলার জীবনের মর্মমূলে বাস নিয়েছে সংস্কার। সেই সংস্কার তাকে সংসার হ'তে কেন্দ্রাতিগ শক্তি দিয়েছে। তাই নবকুমার কপালকুণ্ডলা'কে জয় ক'রেও ভয়হীন হ'তে পারেনি। অরণ্যের রহস্য যেন কপালকুণ্ডলার চিত্তের মধ্যে, অরণ্যের অপার বিস্ময় যেন কপালকুণ্ডলার আলুলায়িত কুন্তলের মধ্যে। অবেণীসংবদ্ধ কেশকলাপ নিয়ে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের প্রথম পরিচয়। আবার অবেণীসংবদ্ধ কেশকলাপ নিয়ে নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার শেষ সাক্ষাৎ। মাঝখানে সংসার এসেছে, এসেছে ননদিনী, চুলবাঁধার প্রয়াস হয়েছে, প্রলোভন এনেছে কোলে খোকা দেবার। কিন্তু নীল আকাশের মধ্যে দেখা দিয়েছেন জগন্মাতা, আবির্ভূত হয়েছে অরণ্যলোকের কাপালিক, সঙ্গী হয়েছে রোমান্স জগতের ব্রাহ্মণবেশী নারী। উৎকট মন্ত্র, নবকুমারের কি কর্তব্য-বিমূঢ়তা, রণরঙ্গিণী নবসঙ্গিনীর ষড়যন্ত্র, কাপালিকের মারণযজ্ঞ ও কপাল-কুণ্ডলার আরণ্যসংস্কার পরিণয়ের পরিণতিতে ব্যর্থ প্রণয়ের বেদনা এনেছে। কিন্তু তবু রোমান্সের আনন্দলোকের মধ্যে, কমেডির মধ্যে, উপন্যাসে ট্র্যাজেডির সুরটুকু শোনা গেলেও বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত পৃথিবীকে অনেক সময় পাশ কাটিয়ে গেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' খাটি রোমান্স বলেই জগৎসিংহ ও ওসমানের কৃত্রিম বাইরের দ্বন্দ্বযুদ্ধই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা'র মধ্যে উপন্যাসের

কালো ছায়া বিস্তৃত হয়েছে রোমান্সের আনন্দপ্রদীপ্ত আলোকনিষ্ণাত লোকে। তাই প্রেমের করুণ-কোমলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ঘটেছে; কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বা 'বিষবৃক্ষ'-এর মত আপাত-অটুট জীবনের তলদেশে ভাঙ্গনের লোলপ্রসার নেই। ওপরের কাটল যে শক্তমাটির নীচে ক্রমবর্ধমান লোলজিহ্বার মৃত্যুচিহ্ন তা তেমন স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করি না যেমন করি আমরা 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ। 'বিষবৃক্ষ'-এ নগেন্দ্র-সূর্যমুখী পুনর্মিলিত হয়েছে। সংসারের দৃঢ়ভিত্তির ওপরে দাম্পত্যপ্রেম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই আপাত শান্তির নেপথ্যে কুন্দনন্দিনীর চাপা নিঃশ্বাস যে পুনর্মিলনের মধ্যে চিরকালের অদৃশ্যব্যবধান রচনা করেছে তা নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে ছোট্ট কুন্দকলিটি হঠাৎ ফুটে উঠে নগেন্দ্রের চিত্তক্ষেত্রের মধ্যে বিভ্রম উৎপাদন করেছিল তা সূর্যমুখীকে স্থান ছেড়ে দিয়ে দৃষ্টির অন্তরালবর্তী হয়েছে বটে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে চিত্তের অন্তরালবর্তী হয়নি। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর মিলনের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর অশরীরী আত্মা সাহানার মধ্যে পূরবীর সৃষ্টি করেছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ অনুতপ্ত গোবিন্দলাল ফিরেছে অভিমানিনী ভ্রমরের কাছে; কিন্তু রোহিণীর সঙ্গে মিলিত জীবনের স্মৃতি ভ্রমরকে বিক্ষুব্ধ করেছে, গোবিন্দলালকে বেদনার্ত করেছে। এই বেদনাই উপন্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। রূপকথায় প্রতিকূল-দৈত্যকে সরিয়ে দিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে প্রেমের নিছক আনন্দ লাভ করেছে অচিনপুরের রাজপুত্র। রোমান্সের জগৎসিংহ, ওস্মানকে বিদূরিত করেছে বাইরের দ্বন্দ্বে, তলোয়ারের আঘাত লাগেনি চিত্তে। কিন্তু উপন্যাসের নায়িকা সূর্যমুখী বা ভ্রমর প্রতিকূল উপগ্রহকে প্রণয়ীর চিত্তক্ষেত্র হ'তে বিদূরিত করেছে বটে কিন্তু পুনর্মিলনের আনন্দে উল্লাস-উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি। এ পুনর্মিলন বেদনাজর্জর। বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে প্রতিভার পূর্বাভাষ আছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' রোমান্স। 'কপালকুণ্ডলা'য় প্রতিভার পূর্ণ পরিচয়। তবু 'কপালকুণ্ডলা'ও সম্পূর্ণ উপন্যাস নয়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের পূর্ণ পরিচয় সামাজিক উপন্যাসের —'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ। সেখানে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার পূর্ণ [illegible]।

এইবার প্রশ্ন উঠতে পারে বঙ্কিমের ঔপন্যাসিক প্রতিভা প্রথম রোমান্সের ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত পদক্ষেপ করেছিল কেন।

আমার মনে হয় :—

(১) বঙ্কিমচন্দ্রেব পূর্বে যে সকল কথাকাহিনীকাব আবির্ভূত হ'য়েছিলেন তাঁদেব মধ্যে ভূদেব, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি Romance of History-ব পথেই পা বাড়িয়েছিলেন। উপন্যাস লেখাব ট্র্যাডিশন দেশে তখনও দেখা দেয়নি। যে-দেশ আবব্য উপন্যাস, হাতেমতাই, গোলেবকাওলী, কামিনীকুমাব, বিদ্যাসুন্দর নিয়ে মাতামাতি ক'রছিল সে দেশে টেকচাঁদেব সমাজ সচেতন মনেব সাহিত্যিক প্রকাশ বা তার পরের প্রমথনাথ শর্মাব লেখাকে বাঙ্গালী সমাদব কবেছিল মুখরোচক চাটনিব মত। ঔপন্যাসিক সম্ভাবনাব জন্য 'আলালেব ঘবেব দুলাল'কে নিয়ে লোকে মাতামাতি কবেনি। দেশেব লোক বোমান্স-জাতীয় লেখা পড়তে ভালবাসে। এ অবস্থায় কথাসাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপে যে বঙ্কিমচন্দ্র জনপ্রিয় হবাব জন্য বোমান্সেব সোজা পথটিই বেছে নেবেন তাতে আশ্চর্য হবাব বিশেষ কিছু নেই।

(২) কেবল পাঠক সম্প্রদায় নয়, লেখকের কথাও আলোচনাব যোগ্য। ওয়াল্টাব স্কট দেশকে যেমন করে মাতিয়েছিলেন তেমন সমাদব কিন্তু ডিকেন্স পাননি। বাংলা দেশেও 'আইভান্‌হো'র সঙ্গে 'ডেভিড কপারফিল্ডে'ব জনপ্রিয়তাব দিক থেকে কোনও তুলনাই চলে না। আব থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট, জেন অস্টেন স্কটেব মত লোককে পাগল করতে সেদিনও পারেননি। সেদিনকাব ইংবেজী-শিক্ষিত বঙ্গ বিশেষ করে স্কটেব অনুবক্ত ছিলেন, সুতবাং স্কটেব মত জনপ্রিয় ও বিশিষ্ট লেখক যে পথে চলেছেন সকলেব কবযশঃপ্রার্থী বঙ্কিমেব পক্ষে সেই পথই সব চেয়ে মনোহব মনে হবে। তাই বোমান্সেব বাজপথই বঙ্কিম বেছে নিলেন।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্র এব আগেও বাজমোহনেব স্ত্রী নিয়ে ইংবেজীতে বোমান্স লেখাব চেষ্টা কবেছেন। তখনও তিনি উপন্যাস লেখাব মত সাবালক হয়ে উঠতে পারেন নি, কাবণ তখন তাব বয়স ছিল কাঁচা। ইংবেজীতে 'বাজমোহনেব স্ত্রী' আব বাংলাতে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যখন হাত দিয়েছিলেন তখন তাঁব বয়স বেশী নয়। মনেব বঙ্গীণ অবস্থা। এ অবস্থায় হালকা চটুল কবিতা বা হালকা চটুল বোমান্স লেখাই স্বাভাবিক। বিশেষ কবে মাত্র চাব পাঁচ বছব হোলো তিনি দ্বিতীয় বাব দাব-পবিগ্রহ কবেছেন। আর 'দুর্গেশনন্দিনী' বচনাব সময় তাব দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী বাজলক্ষ্মী দেবী তো ষোড়শী। যুবা বয়স, সচ্ছল অবস্থা, আব যুবতী ভার্যা সবগুলিই চটুল বচনাব উপযুক্ত মন গঠনেব সহাযতা কবেছে।

(৪) বঙ্কিমচন্দ্র অল্প বয়স থেকেই ইতিহাসপ্রিয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হতে তিনি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির মেম্বর, ঐতিহাসিক গবেষণায় লিপ্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ৭ম অধিবেশনে (১৩২০) কোলকাতায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছেন, "বঙ্কিমবাবু ইতিহাস ও নবেল পড়িতে ভালবাসিতেন। তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস ছিল না ও হয়ও নাই। বঙ্কিমবাবু ইউরোপের ইতিহাস খুব ভাল জানিতেন। ভারতবর্ষের মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে যে সকল ইতিহাস ছিল তাহা সমস্তই তিনি পড়িয়াছিলেন।"

ইতিহাস-প্রিয়, তরুণ, রোমান্স-অনুরাগী, পৃথিবী সম্বন্ধে অল্প অভিজ্ঞ, ২৬।২৭ বছরের বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশেষ ক'রে মোগল পাঠানের ইতিহাসকে কাহিনীর কেন্দ্রস্থলে আনার ইচ্ছা হবে এ তো খুবই স্বাভাবিক। ইচ্ছা সফল করতে হ'লে রোমান্স রচনাই স্বাভাবিক নয় কি? কারণ উপন্যাসে বর্তমান বাস্তব জগৎকে প্রতিফলিত করাই ঔপন্যাসিকের কাজ, আর রোমান্সে মধ্যযুগীয় কল্পনার জগৎকে পরিকল্পিত করে দেখানোই লেখকের কাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের এ অতীত ইতিহাস-প্রীতি ও রোমান্স-অনুরাগ তাঁর পরবর্তী জীবনের একাধিক রচনার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে, যেমন কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতি।

ঔপন্যাসিকের পক্ষে সংসার-জ্ঞান, পরিণত বুদ্ধি আর একটু মর্বিডিটি (morbidity) থাকা দরকার। 'দুর্গেশনন্দিনী'র সময় বঙ্কিমচন্দ্রের তা ছিল না। ধীরে ধীরে তা হয়েছে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছেন রোমান্স হতে উপন্যাসের ক্ষেত্রে। (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) 'দুর্গেশনন্দিনী' সমস্যাবিহীন খাঁটি রোমান্স। (১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) পরবর্তী রচনা 'কপালকুণ্ডলা' সমস্যাসমন্বিত বিয়োগান্ত রোমান্স; এতে উপন্যাসের ছোঁয়াচ লেগেছে। (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) 'বিষবৃক্ষ' রোমান্সের সামান্যস্পর্শযুক্ত উপন্যাস। আর পরবর্তী জীবনের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রোমান্সের স্পর্শহীন খাঁটি উপন্যাস।

॥ ২ ॥ রীতির বিকাশ

'দুর্গেশনন্দিনী'র আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—পৃঃ ৫৭), "অনেক লেখক আছেন যাঁহাদের প্রতিভা বেশ ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া ক্রমশঃ চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয়; তাঁহাদের ক্রমোন্নতির রেখাটি বেশ স্পষ্টভাবেই টানা যায়। তাঁহাদের রচনা সম্বন্ধে কালানুক্রমিক আলোচনাই প্রশস্ত; কালানুক্রমিক আলোচনা দ্বারাই তাঁহাদের প্রতিভার ক্রমবিকাশটি বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বোধ হয় এই প্রণালী তাদৃশ কার্যকরী হইবে না; কেননা তাঁহার প্রতিভা সময়ানুবর্তী হইয়া ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই, প্রায় প্রথম হইতেই একটা সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণতালাভ করিয়াছে।" এই মতটি গ্রহণ ক'রতে আমরা দ্বিধা বোধ ক'রছি। অপরের মতই বঙ্কিমের প্রতিভা—তা প্রথম থেকেই পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় ছিল না; ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা গদ্যরচনা ঈশ্বরগুপ্তের আদর্শ অবলম্বন ক'রে যমক অনুপ্রাসের হাস্যকর বাহুল্যে এত আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো যে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বয়ং ঈশ্বরগুপ্ত শিষ্য হিসাবে স্বীকার করতে গিয়েও বঙ্কিমের বঙ্কিমীভাষাকে দূরে সরিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছেন, "[বঙ্কিম] রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলিন্ প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিমভাষা ব্যবহার না করেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের যে গদ্য স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্রকে সন্ত্রস্ত করেছিল তার নমুনা নীচে উদ্ধৃত হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষমগদ্য এইরূপ :—

> গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পাসংকাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহরহঃ বিষয়বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে।...যে তপনেন্দু শত শত শশধরসঙ্কাশ শোভা পাইতেছে সে বদন কর্দমমণ্ডিত হওত মৃন্মণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অনুরেণ আসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধররস পান না করিয়া অন্যরস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্রভক্ষণে কষ্ট পাইবেক। অতএব হে মানবগণ অনিত্যযত্নে ক্ষান্ত হও।" (সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার ১২ই বৈশাখ, ১২৫৯। কার্ত্তিক ১৩৩৩ 'মানসী ও মর্মবাণী'।)

এই গদ্য রচনায় ঈশ্বরগুপ্ত খুশী হলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাষাবিষয়ক কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। যদি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এই ভাষাই থেকে যেত তাহলে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর স্থান অন্যরূপ হ'ত। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা অজস্র ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ হ'লেও তার সঙ্গে এই গদ্যের আকাশপাতাল প্রভেদ। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল মজুমদার অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন, এমন অশুদ্ধ—"শুধুই ব্যাকরণ নয়, ইডিয়ম বিরুদ্ধ, শিথিল এবং ছন্দহীন বাক্যযোজনা কোন সার্থক রসসৃষ্টিমূলক রচনায় কখনও লক্ষিত হয় নাই।...একজন বিলাতি পণ্ডিত কিছু সংস্কৃত শিখিয়া তাহারই সাহায্যে কোন ক্রমে বাংলা উপন্যাস রচনা করিয়াছে।...ভাষা হিসাবে 'দুর্গেশনন্দিনী'র মত অপকীর্তি আর নাই।" বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক পাঠকেরই মোহিতলাল-কৃত 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা বিষয়ক আলোচনা পাঠ করা কর্তব্য (বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা : দুর্গেশনন্দিনী : শ্রীমোহিতলাল মজুমদার)। মোহিতলাল যে উদাহরণ দিয়েছেন তারই কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত হ'ল :—

"মানসিংহ নিজের প্রতিনিধিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন" (যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন)

"বর্ষা প্রভাতে" (অর্থাৎ 'বর্ষার শেষে')।

"পঞ্চদশ সহস্র ভগ্ন করিলে অধিক থাকে না।" (বাংলা ইডিয়মের সংস্কৃতকরণ)।

"আকবর শাহের সহিত যুদ্ধে কার্য কি" (ঐ)।

"জগৎসিংহ কৌশলময়"।

"দিগ্‌গজের হৃদ্বোধ হইল"।

"বিমলা দ্রুত পদনিক্ষেপে শীঘ্র মান্দারণ পশ্চাৎ করিলেন"।

"ঐ প্রদেশ শত্রুব্যস্ত হইয়াছে"।

"রাজপুত্রের কর্ণে লোল হইয়া একটি কথা বলিলেন।"

"গুণের সীমা দিতে পারি না।"

"জগৎসিংহের লয় হইবার সম্ভাবনা।"

"কপালে ক্ষত কেন? রুধির যে বাহিত হইতেছে"।

"আমি তাহার নিকট আর একবার সাক্ষাতের প্রার্থী"

"মন্ত্রপূতি ব্যতীত পাণিগ্রহণ"

"আমাকে বিদ্যা শিখাইবার পদবীতে আরূঢ় করিয়া দিলেন"। (যাহাতে শিখিতে পারি সেইরূপ করিলেন)।

"আত্মপ্রতিশ্রুতি উদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য নহে"। (যেমন ইংরেজী—'to redeem a pledge')।

"জগৎসিংহের আরোগ্য জন্মিতে লাগিল"।

"আয়েষা প্রকৃতিনিয়মিত রাজ্ঞীস্বরূপ"।

"ঋণবদ্ধ আছি কখন যে তাহার প্রতিশোধ করিব"।

"অভিরামস্বামী দৌহিত্রীকে জগৎসিংহের পাণিগৃহিত্রী করিলেন"। (ভাষা যেমনই হোক—কন্যা বরের পাণিগ্রহণ করে কি ?)

"করে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল"।

"যাহা প্রয়োজন ইচ্ছাব্যক্তির পূর্বেই পাইতেছেন"।

"এ চতুর্বিংশতির পরপারে পড়িয়াছে"।

"আমাদের নদী কলকল রবে প্রবহন করে"।

শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের আলোচনার সঙ্গে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা বিষয়ক ত্রুটির উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি যোগ করতে পারি—

"তাহারা তাঁহাদিগের রক্ষিগণ (রক্ষী) বটে।"

"অবশিষ্ট সেনাগণকে অগ্রসর হইতে বল।"

"গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।" (গৃহ হইতে)।

"যোদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করণাশয়ে দিল্লীযাত্রা করিলেন।"

"সবস্ত্রের গঠন সুন্দর।"

"এই যে কদক্ষরসম্বদ্ধ পত্রী।"

"জগৎসিংহ রুগ্নশয্যায়।"

"উন্নিদ্রায় বহুক্ষণাবধি উৎকট মানসিক যন্ত্রণা-সহনে অবসন্ন হইয়াছিলেন।"

"কেবল কাল ভূতপূর্বস্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।"

"মুখের নিকট কর্ণাবনত করিলেন।"

"আপাদমস্তক শয্যোত্তরচ্ছদে আবৃত।"

"চমকিতের ন্যায় ঋজ্বায়ত হইয়া।"

"পুনঃ পুনঃ পানীয়াভিষিঞ্চন করিতে লাগিলেন।"

"নয়নপল্লব জলভারস্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতেছে।"

"তিলোত্তমা তত্তাবতের গৌরব করিতে লাগিলেন"।

কেবল ব্যাকরণ বিশুদ্ধির ক্ষেত্রেই নয়, স্টাইলের ক্ষেত্রেও ক্রমবিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করা যায়। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে কেবল ঘটনার ঘনঘটা নহে, ভাষার ঘনঘটাও :—

"(আয়েষা) প্রস্ফুট শারদ সরসীরুহের মন্দান্দোলনস্বরূপ সেই মৃদুমধুর হাসিতে সর্বত্র শ্রী সম্পাদন করিতে লাগিলেন।"

এই উদ্ধৃতির সঙ্গে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হ'তে নিম্নোদ্ধৃত অংশের তুলনা করলেই বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যবিকাশের একটি মোটামুটি ধারণা হ'তে পারে :—

"শেষে সূর্য অস্ত গেলেন। ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল—শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল। গোরুসকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল—অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহার কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে। তখন গোবিন্দলাল উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন—যাইবার সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া আছে।"

সুতরাং এ কথা বলা অসমীচীন হবেনা যে বঙ্কিমের প্রতিভাও অন্য সকলের প্রতিভার মতই ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছে। অক্ষয় সরকার মহাশয় বঙ্কিম-প্রতিভাকে Indefatigable exertion in pursuit of an object বলেছেন। একথাটি স্টাইল বা বঙ্কিমের রচনারীতিক্ষেত্রেই সত্য নয়, আরও অনেক বিষয়ে বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো যেতে পারে। বঙ্কিমের গদ্য অশুদ্ধ থেকে শুদ্ধ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে, তার পর সুন্দর গদ্যকাব্য হয়েছে। রচনারীতিতে এই শ্রীবৃদ্ধিটুক আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। আরও কয়েকটি বিষয়ে বঙ্কিমের রচনা যে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছে তা আলোচনা ক'রে দেখানো হচ্ছে।

পরিচ্ছেদের নামকরণেও আমরা বঙ্কিম-প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করি। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচ্ছেদ-নামকরণ কোন বিশেষ পরিকল্পনার অন্তর্গত নয়। কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থ 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিম সচেতন শিল্পীর গভীর পরিকল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। 'কপালকুণ্ডলা'র প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের নাম এ-কারান্ত; যথা :—সাগর সঙ্গমে; উপকূলে; বিজনে; স্তূপশিখরে; সমুদ্রতটে; কাপালিক সঙ্গে; অন্বেষণে; আশ্রয়ে; দেবনিকেতনে; রাজপথে; পান্থনিবাসে; সুন্দরীসন্দর্শনে;

শিবিকারোহণে ; স্বদেশে ; অবরোধে ; ভূতপূর্বে ; পথান্তরে ; প্রতিযোগিনীগৃহে ; রাজনিকেতনে ; আত্মমন্দিরে ; চরণতলে ; উপনগর প্রান্তে ; শয়নাগারে ; কাননতলে ; স্বপ্নে ; কৃতসংকেতে ; গৃহদ্বারে ; পুনরালাপে , সপত্নী-সম্ভাষে ; গৃহাভিমুখে ; প্রেতভূমে। পরিচ্ছেদের নামকরণের মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিমচন্দ্র যে একটা দৃঢ় পরিকল্পনার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ তুলে ধরা গেল।

'পাঠক'-সম্বোধনের দিকে নজর দিলে দেখতে পাওয়া যায় যে সেখানেও বঙ্কিম-প্রতিভা 'দুর্গেশনন্দিনী' হতে বিকশিত হ'য়ে চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে পাঠক সম্প্রদায়ের মাঝখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন, তাই প্রথম পরিচিতির সম্ভ্রমসমাহভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, পাঠক মহাশয়, পাঠক দেখিয়াছেন, পাঠক মহাশয়ের যদি কিঞ্চিৎ বয়স হইয়া থাকে তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিবেন, ইত্যাদি।

অনেক পরিবর্তিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র যে সংস্করণ বাজারে প্রচলিত তাতে পাঠককে কখনও কখনও বঙ্কিমচন্দ্র 'তুমি' ব'লেও সম্বোধন করেছেন। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'তে পাঠিকাকে সম্বোধন করেন নি। 'কপালকুণ্ডলা'য় পাঠকের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক একটু নিকটবর্তী হয়েছে কিন্তু সেখানেও পাঠিকাকে সম্বোধন করা বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যাস হয়নি। তবে পাঠকের সঙ্গে পরিচিতি বশতঃ পাঠকের পত্নীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে পেরেছেন, যেমন, "পুরুষ পাঠক, ইনি আপনার গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী।" সুন্দরী পাঠিকাকে সম্বোধন 'কপালকুণ্ডলা'র পরবর্তী সংস্করণে অর্থাৎ পাঠকসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার পর, এবং সেখানেও সঙ্কোচের সঙ্গে এইটুকুমাত্র বলেছেন, "সুন্দরি পাঠকারিণি। ইনি আপনার দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় রূপবতী।" প্রথম সংস্করণ 'কপালকুণ্ডলা'র দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই অংশটি ছিল না। তার বদলে ছিল :—

> "আমি বলিয়াছি, নবকুমারের সঙ্গিনী অসামান্য রূপসী এস্থলে যদি প্রচলিত প্রথানুসারে তাহার রূপবর্ণনে প্রবৃত্ত না হই, তবে পুরুষ পাঠকেরা বড়ই ক্ষুণ্ণ হইবেন আর যাহারা স্বয়ং সুন্দরী তাঁহারা পড়িয়া বলিবেন, 'মাগী পাঁচপাঁচী'। সুতরাং এই কামিনীর রূপবর্ণনে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইল।'

'কপালকুণ্ডলা'র পরবর্তী সংস্করণে পাঠিকাকে সম্বোধন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র পাঠিকামহলে প্রতিষ্ঠালাভের পর, যখন তার অন্য গ্রন্থ অন্দরমহলে আলোড়ন

সৃষ্টি ক'রেছে তারপর। এর পর পাঠিকাদের সম্বোধন তিনি পরবর্তী অনেক গ্রন্থেই করেছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্বে বাংলাভাষার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ছোটখাট গদ্য ও পদ্য রচনায়। "সে গদ্যরচনা সাহিত্য পদবাচ্য নয়, সে পদ্য কবিতা হয়নি। তার মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের অক্ষম অনুকরণ আছে, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তে যে বাঙ্গালী জীবনবোধ ছিল তার প্রকাশ তার মধ্যে ঘটেনি।

বাংলাসাহিত্য ক্ষেত্রে 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার পূর্বে ইংরেজীতে 'Rajmohan's Wife' Indian Field পত্রিকায় সম্পূর্ণ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী রোমান্স-উপন্যাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছেন। বাংলা সাহিত্যে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছেন তারই প্রস্তুতি Rajmohan's wife-এ। এ পরিবর্তন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন—'গোলেবকাওলী', 'হাতেমতাই', 'আরব্য উপন্যাস', 'সহস্র রজনী'র ক্ষেত্র হ'তে—পাশ্চাত্ত্য রোমান্স উপন্যাসের ক্ষেত্রে আদর্শ অনুসরণের প্রয়াস। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে ইতিহাস ও কল্পনার লাগাম আলগা ক'রে সাহিত্যের ক্ষেত্রে উদ্দামপ্রগতির পরিচয় রেখেছেন, এখানে সে ইতিহাস নীরব। মোগল পাঠানের যুদ্ধবিগ্রহ, রাজপুতদের রণকৌশল; সন্ন্যাসী ইংরেজের লড়াই, ইংরেজ ও বাংলার নবাবের সংঘর্ষের যে ঘনঘটা পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাসে অভিব্যক্তি লাভ করেছে তার ছাপ নেই 'রাজমোহনের স্ত্রী'-তে। অবশ্য তাই ব'লে 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মতন সামাজিক উপন্যাস, সমস্যাসঙ্কুল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনাদর্শে রিপুপ্রাবল্যের অভিঘাত, বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ তার মধ্যে নেই। বরঞ্চ ডাকাতি, নারীবিগ্রহ, গুপ্তগৃহে বন্দীদশা প্রভৃতি চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলি সমাজ-সমস্যামূলক রচনা অপেক্ষা বঙ্কিমমানসে রোমান্সপ্রীতির পরিচিতি বহন করে। 'Rajmohan's wife' সম্বন্ধে আলোচনা অন্যত্র করা হবে, এখানে কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে বঙ্কিমচন্দ্রের মন যে কাহিনী রচনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উল্লিখিত গ্রন্থটি। পূর্বে তিনি ঈশ্বরগুপ্তের আদর্শে গদ্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন, হাত দিয়েছিলেন পদ্য রচনায়—কিন্তু তার মধ্যে সাহিত্যগুণ খুবই দুর্লক্ষ্য। ঈশ্বরগুপ্তের সার্টিফিকেট সত্ত্বেও ঐ জাতীয় রচনার না আছে মর্যাদা, না আছে মাহাত্ম্য।

॥ ৩ ॥ দুর্গেশনন্দিনী : বিচার ও বিশ্লেষণ

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা রচনা 'দুর্গেশনন্দিনী'-র পূর্বে তিনি বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা করেছিলেন, ইংরেজী সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রয়াস করেছিলেন ; কিন্তু এবার তিনি বাংলা ভাষার পরীক্ষা ক্ষেত্র হ'তে সরাসরি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। আর সরাসরি প্রবেশ করলেন বাঙ্গালীর অন্দরমহলে, বাঙ্গালীর অন্তরক্ষেত্রে। জগৎসিংহ যেমন গড়মান্দারণ জয় করতে এসে তিলোত্তমা ও আয়েষার চিত্তদুর্গকে অবলীলাক্রমে ধূলিসাৎ করতে পেরেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি সহজে সবলে প্রবেশ করলেন বাংলাদেশের হৃদয়মন্দিরে, লুট ক'রে নিলেন বাঙ্গালীর মন। বাঙ্গালী চমকিত হ'ল 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়ে। এ তো আরব দেশের কাহিনী নয়, আমাদের (সোসাইটি প্রেস) 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল' নয়, এ যে একেবারে রস-রহস্যভরা শক্তি ও অশক্তির বিচিত্র কাহিনী। অবশ্য শক্তির কাহিনী কতদূর তা বলা শক্ত। কারণ জগৎসিংহ মানসিংহের কাছ থেকে যুদ্ধজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অল্প সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, ইন্দ্রজিৎ যেমন ক'রে রাবণের কাছ থেকে বা রুদ্রপীড় যেমন ক'রে বৃত্রাসুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর হেমচন্দ্র-মধুসূদনের কাহিনী বীররস সৃষ্টির ক্ষেত্রে এগিয়েছে আর বঙ্কিমচন্দ্রের কমেডি সৃষ্টির ক্ষেত্রে। তাই জগৎসিংহের ঘোড়া হ'ল পঙ্গু, অস্ত্র হ'ল অসার্থক··· তিনি শক্তিচর্চার ক্ষেত্র হ'তে অশক্তির ক্ষেত্রে নেমে এলেন অবলীলাক্রমে। তিলোত্তমার জন্য তার গোপন অভিসার ভারতচন্দ্রের সুন্দরের অভিসার। তার মধ্যে যৌবনচাঞ্চল্য ছাড়া আর কিছুই নেই। [আশ্চর্য, জগৎসিংহ তিলোত্তমাকে ভাল ক'রে না দেখেই উন্মাদ। আর যাকে কাছে পেলেন সেবায়, শুশ্রূষায়, প্রেমের স্বীকৃতিতে, আত্মত্যাগে, যার রূপের তুলনা নেই, যার গুণের কোন তুলনাই হয় না, তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেলেন জগৎসিংহ। একটিবারের জন্যও কোন দ্বিধা, কোন চাঞ্চল্য তাঁর চিত্তকে বিচলিত করেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎসিংহ এখানে শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন অবলীলাক্রমে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের শক্তিতে নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিতে।] কতলু খাঁর পরাজয় জগৎসিংহের দ্বারা কোনোকালে ঘটত না, যেমন 'মৃণালিনী'র হেমচন্দ্রের ন্যায় চরিত্রের দ্বারা বঙ্গের জাতীয় নেতৃত্ব অসম্ভব। জগৎসিংহ তলোয়ার

চালিয়েছেন, কিন্তু তা খেলার তলোয়ার। তাঁর মনের মধ্যে কখনও ক্ষাত্রশক্তি লক্ষ্য করি না, লক্ষ্য করি না পরাজয়ের বেদনা। বন্দী অবস্থায় তিলোত্তমা ছাড়া তাঁর ভাবনার অন্য কিছু নেই। অর্থাৎ রাজপুত বীরত্বের কোন ছাপ নেই তাঁর চরিত্রে। জগৎসিংহের তলোয়ার ঘোরানোও যেমন শিশুসুলভ, ওসমানের বুকের ওপর চেপে লম্ফঝম্পও সেই ধরণের হাস্যকর। আর এ দুটি ক্ষেত্র ছাড়া জগৎসিংহ আর কোথাও লড়াইয়ের চেষ্টাও করে নি। (হেমচন্দ্রের বীরত্ব কেবল হাস্যকর নয়, বিরক্তিকরও।)

'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনী যদিও সুপরিচিত তথাপি আলোচনার সূত্র হিসেবে এর সামান্য আভাস মাত্র দেওয়া গেল, কেননা, পরবর্তী বিশ্লেষণে ঘটনাপরম্পরা ও বিবরণের ধারাবাহিকতা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

কাহিনী—পাঁচশত বৎসর পূর্বের বাংলা। উড়িষ্যা তখন পাঠান অধিকারে। বাংলার মেদিনীপুর পাঠান অধিকারে। বাংলার অন্যত্র মোগল অধিকার। মোগল পাঠানের সংঘর্ষ ক্ষেত্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা। মোগল সেনাপতি মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ একদা বিষ্ণুপুর হ'তে মান্দারণের পথে চলেছেন এগিয়ে। এমন সময় সন্ধ্যা এল ঘনিয়ে···মেঘ এল আকাশ কাল ক'রে। বজ্রবিদ্যুতের মুহূর্ত। সুরু হ'ল ঝড়জল। জনহীন প্রান্তরে বিদ্যুতের আলোকে দেখা গেল দেবমন্দির। জগৎসিংহ আশ্রয় নিতে এগিয়ে এলেন সেই মন্দিরে। সেখানে পূর্বেই আশ্রয় নিয়েছিলেন তিলোত্তমা ও বিমলা।

তিলোত্তমা গড় মান্দারণের অধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা। বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের পরিচারিকারূপে পরিচিত হ'লেও আসলে বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী। তিলোত্তমা-জননী বীরেন্দ্রসিংহের অপর পত্নী। এই দুই পত্নীই শশিশেখর ভট্টাচার্য ওরফে অভিরাম স্বামীর দুই কন্যা। তিলোত্তমা জননী তিলোত্তমার জন্মের পর মারা যান। দ্বিতীয়া পত্নী বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের পরিচারিকারূপে পরিচিতা। এই ঝড়বাদলে তিনি তিলোত্তমার সঙ্গিনীরূপে মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন।

এই ঝড়বাদলের দিনে মন্দিরে চকিত দৃষ্টিপাত হ'ল জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার—পঁচিশ বছরের যুবা জগৎসিংহ ও ষোড়শী সুন্দরী তিলোত্তমা। দর্শনজাত পূর্বরাগের প্রথম পালা উদ্‌যাপিত হ'ল। মোগল ও পাঠানের যুদ্ধে গড়মান্দারণের অধিপতি বীরেন্দ্রসিংহ মোগলের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন বটে কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে নানাকারণে পূর্ব হ'তে রাজা মানসিংহের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। এদিকে

মোগলসৈন্যের পরিচালনাভার জগৎসিংহ স্বহস্তে গ্রহণ ক'রে পাঠানের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ।

শৈলেশ্বরের মন্দিরে প্রথম সাক্ষাতের এক পক্ষ কাল পরে বিমলার সহায়তায় মান্দারণ দুর্গে প্রবেশ করলেন জগৎসিংহ। তিলোত্তমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল দুর্গের অভ্যন্তরে। এই মিলনের আনন্দময় মুহূর্তে পাঠানসৈন্য ওসমানের পরিচালনায় প্রবেশ করল বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গে। বন্দী হলেন জগৎসিংহ, তিলোত্তমা, বিমলা, বীরেন্দ্রসিংহ।

পাঠানশিবিরে জগৎসিংহ আহত অবস্থায় নীত হ'লেন। তাঁর শুশ্রূষার ভার নিলেন কতলুখাঁর কন্যা আয়েষা। বিমলা ও তিলোত্তমা নারী—সুতরাং নারীমাংস-লোলুপ কতলুখাঁর জন্য অন্যত্র সযত্নে রক্ষিত হ'লেন। বিচারে বিদ্রোহী বীরেন্দ্রসিংহের প্রাণদণ্ড হ'ল। সেই প্রাণদণ্ডের মুহূর্তে—চোখে জল আর বুকে আগুন নিয়ে স্বামীর হত্যাকারী কতলুখাঁর হত্যার প্রতিজ্ঞা নিলেন বিমলা।

পাঠানশিবিরে আয়েষার সেবায় শারীরিক আরোগ্যলাভ করলেন জগৎসিংহ, কিন্তু মানসিক ব্যাধি আক্রমণ করল আয়েষাকে। আয়েষাকে পত্নীরূপে চেয়ে এসেছেন পাঠান সেনাপতি ওসমান, কিন্তু আয়েষা এবার ভালবেসেছেন রাজপুত্রকে। জগৎসিংহ 'প্রাণেশ্বর'···একথা ওসমানের সামনে বলায় তাঁর কোন দ্বিধা নেই। অথচ জগৎসিংহ তিলোত্তমার প্রেমে বিহ্বল।

কতলুখাঁর জন্মোৎসবের নারীমেধ যজ্ঞে বিমলা রূপের আগুনে ঝল্‌সে দিলেন কতলুখাঁকে, তারপর বিভ্রম উৎপাদন করে প্রথম মিলনের পূর্বমুহূর্তে শাণিত ছুরিকা বসিয়ে দিলেন কতলুখাঁর বুকে। স্বামী বীরেন্দ্রসিংহের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলেন তিনি। গোলমালের মধ্যে অবরোধ হ'তে পলায়ন করলেন বিমলা; অন্যভাবে তিলোত্তমাও মুক্তিলাভ করেছিলেন।

মৃত্যু-মুহূর্তে কতলুখাঁ জগৎসিংহের নিকট মোগল-পাঠানের সন্ধিপ্রস্তাব ক'রে গেলেন। আর জানিয়ে গেলেন তিলোত্তমা এখনও তাঁর অনাঘ্রাত···কুমারী।

কতলুখাঁর মৃত্যুর পর মুক্ত জগৎসিংহ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হাজির হ'লেন মোগল সেনাপতি পিতা মানসিংহের কাছে। তাঁর চেষ্টা সফল হ'ল। মোগল-পাঠানের সন্ধি হ'ল বটে, কিন্তু রাজপুত্র জগৎসিংহকে আয়েষার প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে ওসমান দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হ'লেন ওসমান। অবশেষে তিলোত্তমার পাণিগ্রহণ করলেন জগৎসিংহ; আয়েষা চোখের জলে মহার্ঘ অলংকারে

সাজিয়ে দিলেন তিলোত্তমাকে—বিবাহের বধূকে। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার মিলিত জীবনের নেপথ্যে আয়েষা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে মিলিয়ে গেলেন।

ঘটনাকাল—এই উপন্যাসে যে সকল ঘটনা আছে তা ঘটতে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের হিসেবে "চব্বিশ দিনও লাগে নাই"। আমাদের হিসেবে ঘটনাকালের ব্যাপ্তি আরও কিছু বেশী। কারণ—

(ক) তিলোত্তমার সঙ্গে মন্দিরের প্রথম সাক্ষাতের দিন জগৎসিংহ বিমলাকে বলেন যে "অদ্য হইতে পক্ষান্তরে রাত্রিকালে এই মন্দির মধ্যেই আমার সাক্ষাৎ।" সেই সাক্ষাতের রাত্রেই তিনি বিমলার সঙ্গে গড়মান্দারণে যান ও পাঠানসেনা-কর্তৃক বন্দী হন। এই প্রথম খণ্ড পনের দিনের ঘটনা মাত্র।

(খ) "দুর্গজয়ের দুই দিবস পরে"···"বীরেন্দ্রসিংহের দণ্ড" ও বিমলার বৈধব্য।

(গ) "বৈধব্য ঘটনার দুই দিবস পরে" বিমলা আত্মপরিচয় লিপি জগৎসিংহের উদ্দেশ্যে ওসমানের হাতে দেন। পত্র পাঠ ক'রে ওসমান বলেন, "কতলুখার জন্মদিন আগতপ্রায়।" আনুমানিক এক সপ্তাহ পরে কতলুখার জন্মদিন উৎসব ধরা যেতে পারে।

(ঘ) কতলুখার জন্মোৎসবে মৃত্যু। "মৃত্যুর পর মোগল পাঠানের সন্ধি সম্বন্ধ ও সমাপন করিতে ও শিবির উদ্যোগ করিতে কিছুদিন গত হইল।" কমপক্ষে সাতদিন ধরলে এই সকল ঘটনা কালের ব্যাপ্তি তেত্রিশ দিনের কম নয়। এই সময় ওসমানের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও 'দুই দিবসের কিছুদিন পরে' অভিরাম স্বামী ও অসুস্থ তিলোত্তমার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

(ঙ) জগৎসিংহের সেবার ফলে তিলোত্তমার রোগমুক্তি ও তিলোত্তমার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব ও বিবাহ কমপক্ষে পনের দিনের ব্যাপার।

অর্থাৎ ঘটনাকালের ব্যাপ্তি "চাব্বশ দিনের ব্যাপার" নয় তার দ্বিগুণ অর্থাৎ আটচল্লিশ দিনের বেশী সময়ের ব্যাপার। ডক্টর সেনগুপ্ত লিখেছেন, "সন্ধির পর জগৎসিংহ-ওসমানের যুদ্ধ ও তিলোত্তমার বিবাহ। ইহাতে পাঁচদিন সময় লাগিয়াছিল"। এ হিসেব যে কিভাবে করা হয়েছে বোঝা গেল না।

* * *

'দুর্গেশনন্দিনী'কে খাটি রোমান্স হিসেবে রচনা করা হয়েছে। এটি যে উপন্যাস নয় এবং কোনক্রমেই ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় তা বঙ্কিমচন্দ্র বিলক্ষণ

জানতেন। তাই স্বয়ং "Bengali Literature" প্রবন্ধে লিখেছেন, "Among the Romance writers, Babu Protap Chandra Ghose, author of Bangadhip Parajay has recently been noticed at length in this review. The only other of this class, whose works it seems necessary to notice, is Babu Bankim Chandra Chatterjee, whose Durgesnandini, Kapal Kundala, and Mrinalini are among the most popular of Bengali books".

রূপকথা ও রোমান্সের পার্থক্যের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সংক্ষেপে উভয় রচনার স্থান কাল পাত্রের মধ্যে পার্থক্য আর একবার প্রদর্শিত হ'ল: রূপকথায় ঘটনার স্থান—নাম-না-জানা দেশ; রোমান্সে নাম জানা দেশের অতীত ঘটনা। রূপকথার ঘটনার কাল কোন কালের দ্বারা পরিচিহ্নিত নয়। রোমান্সের ঘটনাকাল সাধারণতঃ অতীতকাল। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সে এই ঘটনার কাল হয় মোগল পাঠান সংঘর্ষের কাল, নয় মোগল-রাজপুতের সংঘর্ষের কাল। মুসলমান ও ইংরেজ সংঘর্ষের কালও বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সে স্থান পেয়েছে। অপরপক্ষে রূপকথার পাত্র-পাত্রী কল্পলোকের। যে অচিনপুরের রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে তালপাতার খাঁড়া দিয়ে ময়না-পাখীর মধ্যে নিহিত দৈত্যের প্রাণ বিনা রক্তপাতে হরণ ক'রে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় হাজার বছরের ঘুমে অচেতন রাজকন্যাকে জাগিয়ে বিবাহ করেন তার রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা ও তাদের বিবাহের সাহায্যকারীরা, সবাই কল্পলোকের। রাজকন্যাকে যে রাজপুত্র বিবাহ করলেন তা নিছক বাস্তবের সঙ্গে আপোষ রফা মাত্র…এবং এ ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই ব'লে। কিন্তু বাস্তবের ছোঁয়াচ যদি কাহিনীতে আর একটু লাগত তাহলে বিবাহের পরিণতি আসত না। কারণ হাজার বছরের মরণ ঘুমে যে রাজকন্যা ঘুমিয়ে ছিলেন তার বয়স হাজার বছরের কম কোনও হিসেবেই হবে না। আর অচিনপুরের যে রাজপুত্রের কাহিনী আমরা পাই তাঁর চালচলনের আভাস ইঙ্গিত পেয়ে মনে হয় তিনি কিশোর বয়স খুব বেশী দিন ছাড়াতে পারেন নি। বাস্তবের রাজপুত্র কি এত প্রাচীনা রাজকন্যাকে সহজে বিবাহ করতে রাজী হবেন? রোমান্সের পাত্রপাত্রী আমাদের পৃথিবীর হ'লেও তাদের প্রতিদিনের পরিচিত পৃথিবীর পরিবেশের মধ্যে বিশেষ পাই না। রোমান্সের জগৎসিংহের ঘোড়া পশ্চিমের নাইটদের (Knight) থেকে বাংলা দেশে বঙ্কিমবাবু ধার চেয়ে এনেছেন। আর জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষাকে রূপকথার চরিত্রের

ন্যায় অবাস্তব ব'লে মনে হয় না, কেবল অপরিচিত ব'লে মনে হয়। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ, বিমলা, আসমানী, ওসমান কাউকে কোনও দিন পথে ঘাটে আমরা দেখিনি, তবে গড়মান্দারণে তাদের অসম্ভব বলে মনে হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সে ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছেন। মোগল পাঠান হিন্দু মুসলমান তারই সামনে এসেছে। ইতিহাসের বিরোধ বিক্ষোভের মধ্যে একটি শান্ত অচঞ্চল প্রেমকাহিনীর পরিবেশনই 'দুর্গেশনন্দিনীতে' মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই ইতিহাসের ঘটনা কিছু থাকলেও অনৈতিহাসিক ঘটনাতে তিনি বিশেষ মন দিয়েছেন। এখানে history এবং his story-র মধ্যে শেষেরটিই লেখকের লক্ষ্য, প্রথমটি উপলক্ষ্য মাত্র। 'রাজসিংহ'-তে প্রথমটিকে তিনি বিশেষভাবে অবলম্বন ক'রে কাহিনী রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তাও 'রাজসিংহ'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা বিষয়ে কিছু অসুবিধা হবে। কারণ যে-আলমগীরকে আমরা এখানে পাই তিনি ইমলীবেগম ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে কখনও ভালবাসেন নি: আর রাজসিংহ মানিকলালের মত সাধু দস্যুর বর্ণবিদ্যাতে, মবারকের মত মোগলের সাহায্যে আর নির্মলকুমারীর বুদ্ধিমত্তায় আওরঙ্গজীবকে বন্দী করেন ও সন্ধিগ্রহণে রাজী করান। এই আওরঙ্গজীব ও রাজসিংহকে কোনও ইতিহাসের ছাত্র চিন্‌তে পারবেন কিনা সন্দেহ। তবে নানাদিক থেকে বিচার ক'রে শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং আচার্য যদুনাথ সরকার 'রাজসিংহ'কে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ বিষয়ে আলোচনা যথাস্থানে করা হবে। বঙ্কিমচন্দ্র যে 'রাজসিংহ' ছাড়া আর কোন রচনাকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে যান নি তা স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে। তার কারণ পাত্রপাত্রী এবং কাহিনী কোন দিক দিয়েই ইতিহাস হ'তে উপাদান 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বেশী নেই। ইতিহাসের আলোছায়া-ঘেরা অপরিচিত জগতে কল্পলোকের প্রেম-কাহিনীর উপাখ্যানই এখানে লক্ষ্য। পরবর্তী রচনা 'কপালকুণ্ডলা'তে রোমান্স ও উপন্যাসের অপূর্ব মিশ্রণ। সেখানে জনহীন সমুদ্রের পরবর্তী অরণ্যের নিভৃতে প্রেমের উদ্ভব হ'লেও তার পরিণতির ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন আমাদের সমাজে সংসারে। সেখানে মিলনের মধ্যে না-পাওয়ার বেদনা-সুন্দর বাস্তব-চিত্র।

এখানে 'দুর্গেশনন্দিনী'র ঘটনার অনেক কিছুই আমাদের বিশ্বাসবোধের ওপরে পীড়ন করে। যেমন বন্দী অবস্থায় জগৎসিংহ সরাসরি নীত হয়েছেন পাঠান কতলুখাঁর একেবারে অন্দরমহলে। আর সেবার ভার পড়েছে

কতলুখাঁর কন্যার উপর। আর শুধু তাই নয়; জগৎসিংহের আরোগ্য-লাভের জন্য কন্যার উপর সেবার ভার ছেড়ে দিয়ে কতলুখাঁ একবারও তাঁর শারীরিক সুস্থতার সংবাদ নিতে ভুল ক'রেও আসেন নি। অথচ রাজা মানসিংহের পুত্রকে হস্তগত করার জন্য আয়েষার দ্বারা সেবার অবিশ্বাস্য ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই তাঁর নির্দেশে করা হয়েছিল।

রোগমুক্তির কাল বর্ণনাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনায় ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ('তুমি না তিলোত্তমা' নামক পরিচ্ছেদে) পাই 'অনেকক্ষণ পরে আয়েষার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "আমি কোথায়?" ...দুই দিবসের পরে রাজপুত্র এই প্রথম কথা কহিলেন।'..."কিয়ৎ-ক্ষণ নীরবে বিশ্রামলাভ করিয়া কহিলেন, "আমি কয়দিন এখানে আছি?"

"চার দিন"

...জগৎসিংহ আবার কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কি হইয়াছে?"

"বীরেন্দ্রসিংহ কারাগারে আবদ্ধ আছে, অদ্য তাঁহার বিচার।"

জগৎসিংহের নিকট আয়েষার উক্তি হ'তে জানা যায় যে দুর্গজয়ের চতুর্থ দিবস পর্যন্ত বীরেন্দ্রসিংহ জীবিত আছেন এবং চতুর্থ দিনে তাঁর বিচার হবে। অথচ পরবর্তী পরিচ্ছেদে (২য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ: অবগুণ্ঠনবতী) বঙ্কিম লিখেছেন—

'দুর্গজয়ের দুইদিবস পরে বেলা প্রহরেকের সময় কতলুখাঁ নিজ দুর্গের মধ্যে দরবারে বসিয়া আছেন।...অদ্য বীরেন্দ্রসিংহের দণ্ড হইবে।'

বীরেন্দ্রসিংহের সেইদিনই শিরশ্ছেদ হয়। সুতরাং আয়েষার উক্তিটি জগৎসিংহের নিকট সান্ত্বনা বাক্য এবং মিথ্যা বাক্য না ধরলে এটি বঙ্কিমের পরিকল্পনাগত ত্রুটি।

এ ধরণের ত্রুটি 'চন্দ্রশেখর' 'রজনী' 'রাজসিংহ' 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারাম'-এ আছে। যেমন 'চন্দ্রশেখর'-এ (২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদে) লরেন্স ফস্টরের নৌকার প্রহরী প্রতাপের সহকারী রামচরণের গুলির আঘাতে মারা গিয়ে জলে পড়ামাত্রই তার শবদেহ জলে ভাসতে ভাসতে চলে গেল।

'বজরার প্রহরী গুলির দ্বারা আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল।...লরেন্স ফস্টর বাহিরে আসিয়া চারিদিক ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

দেখিলেন, তাঁহার "তেলিঙ্গা" প্রহরী অন্তর্হিত হইয়াছে—নক্ষত্রালোকে তাহার মৃতদেহ ভাসিতেছে।'

গুলির আঘাতে মৃতদেহ জলে অবশ্যই ভাসতে পারে কিন্তু কিছুদিন বাদে। কারণ মানুষ ভাসতে জানে না ব'লেই ডুব মারা যায়, আবার মারা যাওয়ার কিছুদিন বাদে বিনা কৌশলেই ভাসতে পারে।

অন্ধ 'রজনী'র ভুলটি শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় আলোচনা করেছেন। ১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদে অন্ধ রজনী বলছে, 'হীরালাল তৎকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরের এদিক সেদিক দেখিতে লাগিল।' অন্ধ রজনীর পক্ষে হীরালালের 'এদিক সেদিক দেখার' কথা জানা সম্ভব নয়।

রাজসিংহ-গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে, মাণিকলাল ও তার দস্যু সঙ্গীদের অনুসরণের সময় রাজসিংহ দক্ষিণহস্তে 'দৃঢ় মুষ্টিতে অসি' আর 'বাম হস্তে পিস্তল' নিয়েছিলেন। মাণিকলাল যখন বর্শা নিয়ে তাঁকে মারতে গেল তখন 'রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তল দস্যুর দক্ষিণহস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন, দারুণ প্রহারে তাহার হাতের বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া, মাণিকলালের চুল ধরিলেন এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন।'

উল্লিখিত অংশে দেখা যাচ্ছে পিস্তলটি ছুড়ে মেরে আঘাত করার পর রাজসিংহের ডানহাতে অসি ছিল। মাণিকলালের হাত থেকে খসে পড়া বর্শা, বা পিস্তল ("তাহা") বামহাতে তুলে নিলেন। এ অবস্থায় দুটি হাতই যখন জোড়া তখন কোন হাতে মাণিকলালের চুল ধরলেন?

* * *

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রেমের উপন্যাস। প্রেমের রূপের আলোচন। 'তিলোত্তমা' মুগ্ধা হ'তে মধ্যার দিকে চলেছে। যে কিশোরী বধূকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমবার জন্মের মত হারিয়েছেন, যার তার একটি প্রতিমা পেয়েছেন দ্বিতীয়া পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবীর মধ্যে ('দুর্গেশনন্দিনী' রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ২৬, রাজলক্ষ্মী দেবীর বয়স ১৬), তাঁকেই যেন তিনি রূপ দিয়েছেন তিলোত্তমার মধ্যে। আয়েসা পূর্ণতরুণী—মধ্যা হ'তে প্রগল্‌ভার স্তরে চলেছেন। বিমলা প্রগল্‌ভা "রসেনাক্রান্ত-বল্লভা" "পূর্ণতরুণী"। আয়েষার মধ্যে লজ্জা ও মাধুর্য, অন্তর্বেদনা ও সুন্দর সত্য প্রণয় স্বীকৃতি। বিমলার মধ্যে লজ্জা অতীতের বস্তু···সে মুখরা, চতুরা।

প্রেমনিবেদনের মধ্যে বহ্নিলুব্ধ পুরুষের চিত্তবিভ্রম ঘটায় সে কৌতুকছলে, কার্যসিদ্ধির জন্য। তারই প্রেমের লীলাতরঙ্গে বিদ্যাদিগ্‌গজ গঙ্গা-লাঞ্ছিত ঐরাবতের মত ভেসে যায়; তারই বিলাস-বিভ্রমে মুসলমান প্রহরীর কর্তব্যবোধ শিথিল হ'য়ে আসে, তারই শরীরের স্পর্শে সে যৌবনচঞ্চল হয়ে উঠে বন্দিনী বিমলার বাঁধন আল্‌গা ক'রে দেয়। তারই রূপের আগুনে আর ছুরির আঘাতে কতলুখাঁর মৃত্যু ঘটে। অথচ বাইরেব কৃত্রিম প্রেমের অভিনয়ের মধ্যে সত্যিকার গভীর প্রেমের বহ্নিশিখা তার অন্তরে। তাই কতলুখাঁকে কৃত্রিম প্রেমের টানে আহ্বান জানিয়ে ছুরিকার মুখে নিজের সত্য প্রেমের পরিচয় দেয়। এ প্রতিশোধ প্রেমের প্রতিশ্রুতি। আবার প্রেমিকারূপে সে কেবল বিভ্রম উৎপাদন করেনি, স্ত্রীরূপে পতিহত্যার প্রতিশোধ নেয়নি, পূর্বে সে তিলোত্তমা-জগৎসিংহের প্রেমের দূতী। আয়েষা প্রেমে স্বয়ং দূতী, সে নিজেই জগৎসিংহের কাছে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিমলার মধ্যে প্রেমের কড়ি ও কোমল, আয়েষার মধ্যে প্রেমের করুণ কোমলতা। বিমলার শাণিত ছুরিকা রুদ্ররূপের অভিব্যক্তি। আয়েষার তিলোত্তমার নিকট বিদায় সম্ভাষণ বেদনাবিহ্বল। আয়েষার হাতে বিষের আংটি। সে যদি পারে তো কেবল নিজের প্রাণ দিতে পারে…ছুরির আঘাতে অপরেব প্রাণ নিতে পারে না। এই দুটি নারী চরিত্রের মধ্যে প্রথমার্ধে বিমলা ও দ্বিতীয়ার্ধে আয়েষা প্রধান নারী চরিত্র হয়ে উঠেছে। নায়িকা তিলোত্তমা সানাইয়ের স্থিব সুরের ন্যায় আদ্যোপান্ত আছে বটে…কিন্তু প্রথমার্ধে সে বিমলা-পরিচালিতা, দ্বিতীয়ার্ধে আয়েষার পাশে ম্লান। যত কিছু সুরের খেলা বিমলা-আয়েষার তানে…সে কেবল দুই অর্ধেই পটভূমি রচনা করেছে মাত্র। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার মধ্যে তাই প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ কিছু নেই। তিলোত্তমাব ব্যক্তিত্বই বিকশিত হয়নি। বিমলার প্রখর ব্যক্তিত্ব ও আয়েষার অতুলনীয় রূপ ও গুণের পাশে সে একান্তই ম্লান। সত্যই আয়েষা এ আখ্যায়িকা মধ্যে অতুলনীয় রমণীরত্ন। "যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনি আয়েষা"। আয়েষা-তিলোত্তমার মত নায়িকা-প্রতিনায়িকা আমরা পেয়েছি বঙ্কিমের অন্যান্য গ্রন্থেও। এ গ্রন্থে নায়িকা-প্রতিনায়িকার মধ্যে বিশেষ করে নায়িকাটি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্বল চরিত্রচিত্রণের নিদর্শন। পরবর্তী বৎসরের 'কপালকুণ্ডলা'-'মতিবিবি'তে বঙ্কিমের প্রতিভা অদ্ভুতভাবে দীপ্ত হয়েছে। তিলোত্তমা হিন্দু, আয়েষা মুসলমান। 'কপালকুণ্ডলা'তে হিন্দু প্রতিনায়িকা মুসলমানে পরিবর্তিত। মুগ্ধা-মধ্যা নায়িকা…কপালকুণ্ডলা…বঙ্কিম সৃজনীশক্তির

অপূর্ব উজ্জ্বল উদাহরণ। তিলোত্তমাতে হিন্দুনারীর কোন বিশেষ রূপ ফুটে ওঠেনি। কপালকুণ্ডলার মধ্যে হিন্দুনারীর আবাল্য সংস্কার ট্র্যাজেডির নিয়ামক হয়ে দেখা দিয়েছে। মতিবিবি মুসলমান এবং আয়েষার মত নবকুমারকে জানিয়েছে প্রেমের কথা। তার প্রেম ও প্রেমপ্রার্থনার ব্যাপার, পরবর্তী ষড়যন্ত্র, দাম্পত্য প্রেম প্রতিষ্ঠার আকুল চেষ্টা জীবন্তরূপ পরিগ্রহ করেছে। আয়েষার জন্যে pathetic হয়ে উঠেছে 'দুর্গেশনন্দিনী'। 'কপালকুণ্ডলা'র ট্র্যাজিক পরিণতির বিশেষ কারণ মতিবিবি। তার মধ্যে রূপ আছে, গুণ আছে, পরিহাসমুখরতা আছে, প্রেমপ্রকাশ আছে, প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে অলংকারে সজ্জিত করার উদারতা আছে, হত্যার ষড়যন্ত্র করার দুঃসাহস আছে, জাহাঙ্গীরের প্রেমের অস্বীকৃতি আছে। হিন্দু ও মুসলমানের মিলন তার মধ্যে, অর্থাৎ আয়েষা ও বিমলার মিলিত রূপ বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন তার মধ্যে। বঙ্কিমের প্রতিভা সার্থকভাবে ট্র্যাজেডি-বিধায়িকা, ব্যর্থ প্রেমিকা, দুশ্চরিত্রা মতিবিবিকে অঙ্কিত করেছে। আরণ্য-মোহ ও প্রাকৃত-সারল্য রূপ পেয়েছে কপালকুণ্ডলাতে। তার বিপরীত চরিত্র মতিবিবিতে 'নাগরমোহ' ('নাগর' শব্দটি যে অর্থেই গ্রহণ করা যাক) ও নারীর পক্ষে অস্বাভাবিক কুটিলতা স্থান নিয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে নায়িকা-প্রতিনায়িকার মধ্যে তা অনতিস্ফুট।

'দুর্গেশনন্দিনী' গ্রন্থের নায়িকা 'দুর্গেশনন্দিনী'। কিন্তু লেখক 'তিলোত্তমা' নাম করেন নি গ্রন্থের। কারণ তিলোত্তমা গড়মান্দারণ দুর্গাধিপতি বীরেন্দ্র-সিংহের নন্দিনী হ'লেও তিনিই একমাত্র 'দুর্গেশনন্দিনী' নন। কতলুখাঁ কর্তৃক গড়-মান্দারণ জয়ের পর আয়েষাও পরবর্তী 'দুর্গেশে'র নন্দিনী। দুজনেই একই দুর্গের অধিকারীর নন্দিনী। সে দুর্গ কেবল গড়মান্দারণ নয়, জগৎসিংহের চিত্তদুর্গও। চিত্তদুর্গের মধ্যে যে প্রেম অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রে 'দুর্গেশ' হয়েছিল সেই দুর্গেশের, সেই প্রেমের, আনন্দিনী শক্তি দুজনেই—তিলোত্তমা-আয়েষা। তাই 'তিলোত্তমা' অপেক্ষা 'দুর্গেশনন্দিনী' নামটি সার্থক হয়েছে ব'লে মনে হয়। এক 'দুর্গেশনন্দিনী' তিলোত্তমা জগৎসিংহকে বিবাহের মধ্যে চিরকালের জন্য পেয়ে গেল। আর এক 'দুর্গেশনন্দিনী' আয়েষা বিরহের মধ্যে জগৎসিংহকে চিরকালের জন্যে পেল স্মৃতিলোকে। সেই স্মৃতির আনন্দলোকে দুঃখসাগর মন্থন করে অমৃত উঠবে। তাই আয়েষা "যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন?" ব'লে "গরলাধার অঙ্গুরীয়" দুর্গপরিখার জলে "নিক্ষিপ্ত" করলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুর্গেশনন্দিনী—> কপালকুণ্ডলা

রুচি ও রীতি বিবর্তন

সাহিত্যের লক্ষ্য হ'ল রসসৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের মতে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যে হাস্যরস বা করুণরস সৃষ্টি করেন তা প্রাচীন কালের মত নয়। তাঁর হাস্যরস বিদূষকের ঔদরিকতা ও গ্রাম্যতাদোষ থেকে মুক্ত, তাঁর করুণরস গভীর ও গম্ভীর। আর সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রধান, আদিম ও আদি রস শৃঙ্গাররসের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের শালীনতাবোধের কথাও আলোচনা করেছেন কবিগুরু। এক সেকেলে পণ্ডিতের প্রাচীন ধরণের আদিরসের অবতারণায় লজ্জিত হয়ে সেই আলোচনাক্ষেত্র হ'তে দ্রুত পলায়নকারী বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বচক্ষে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে যে-বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা পাই তিনি আদিরস, হাস্যরস, করুণরস ইত্যাদির ক্ষেত্রে বররুচি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আলোচনা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে-বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা তাঁর বিশ্লেষণের মধ্যে পাই তাঁর কিঞ্চিৎ বয়স হয়েছে…চুলে এবং মনে তাঁর পরিপক্কতা। সামনে তাঁর প্রসিদ্ধি, সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা। কিন্তু জীবনে বা সাহিত্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ পরিপক্কতা নিয়ে মানুষ প্রথম হ'তেই পথে অগ্রসর হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের রুচিও প্রথম থেকে পরিপূর্ণ বিকশিত ছিল না। অবশ্য শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা প্রথম থেকেই পূর্ণ বিকশিত। কিন্তু শ্রদ্ধেয় ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ তথ্য আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না। বঙ্কিমের প্রতিভা প্রথম থেকে পূর্ণ বিকশিত ছিল না। তাঁর রুচিও প্রথম থেকেই বররুচি ছিল না। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে-বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা পাই, তিনি প্রাচীন সাহিত্যধারা-জলে স্নান ক'রে হাস্যরস ও শৃঙ্গাররস পরিবেশন করেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিদ্যাদিগ্‌গজ সংস্কৃত-প্রাকৃত নাটকের বিদূষকের নিকট-আত্মীয়। এ হাস্যরস খুব শুচিশুভ্র নয়। আদিরসের ক্ষেত্রেও এখানে তিনি প্রাচীন আদর্শকে বেশ কিছুটা অনুসরণ করেছেন।

বিশদ আলোচনা করা যাক। সংস্কৃত-প্রাকৃত নাটকে হাস্যরস অনেক পরিমাণে

বিদূষক-নির্ভর। এ বিদূষক ব্রাহ্মণ, উদরপরায়ণ, স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন। কখনও নামেন তিনি দাসীর সঙ্গে বৈদগ্ধ্যের প্রতিযোগিতায়। কিন্তু প্রতি প্রতিযোগিতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যাভিমানী রসিকম্মন্য বিদূষকের ঔদরিকতা আর দাসীর বিচক্ষণতা। ফলে দাসীকে গালি দেন বিদূষক। দাসীর প্রত্যুত্তর পান তিনি। নারীর শাস্তি-বিধানের হুমকি আসে তারপর। 'শকুন্তলা'র বিদূষক 'বয়স্য' ব্রাহ্মণ, ঔদরিক। রাজাকে প্রেমের 'হিতোপদেশ' দেন তিনি, আর আমাদের শোনান প্রেমের 'পঞ্চতন্ত্র' যথা, "পিণ্ডখর্জুরে অরুচি জন্মালে মানুষের যেমন তিন্তিড়ী ভক্ষণের সাধ জাগে সেইরূপ পুরনারী-ভোগক্লান্ত রাজা এখন মুখ বদলাবার জন্য আশ্রমকন্যার দিকে নজর দিচ্ছেন।" বিদূষকের মাথায় কেবল খাবার চিন্তা। তাই রাজা যখন তাঁকে একটা শক্ত কাজ করতে বলেন তখন চট ক'রে প্রশ্ন করেন বিদূষক, "কি কাজ ? মিষ্টি খাওয়ার ব্যাপার ?" 'বিক্রমোর্বশীয়ম্'-এ বিদূষক চাঁদ দেখে মিষ্টির টুকরোর কথা স্মরণ করেন ("খংড মোদঅ সরিসে।")। রাজার সঙ্গে রাজপ্রিয়-ঘটিত আলোচনায় তিনি মন্ত্রী। 'দুর্গেশনন্দিনী'র হাস্যরসও অনেক পরিমাণে 'বিদ্যাদিগ্‌গজ'-নির্ভর। ঔদরিক ব্রাহ্মণ বিদ্যাদিগ্‌গজের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় তার নামেতেই। আবার বন্দী জগৎসিংহ তাঁর কাছ থেকে প্রিয়া তিলোত্তমার সমাচার সংগ্রহ করতে চেয়েছেন।

'কর্পূরমঞ্জরী'তে বিদূষক বসন্তবর্ণনা করেছেন। বসন্তের সাদা ফুল তাঁর কাছে ভাতের মত আর হলদে ফুল তাঁর কাছে "মহিষ-দধি"র বাণী বহন ক'রে এনেছে। পেটুক বিদূষকের পরাজয় ঘটাল দাসী বসন্তবর্ণনার বৈদগ্ধ্যে। তারপর কথা-কাটাকাটির সূত্রে সে-দাসী নূপুরপরা পায়ের লাথিমারার হুমকি দেখিয়েছে, কান ছিঁড়ে দেবার ভয় দেখিয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিদ্যাদিগ্‌গজ আশমানী ও বিমলার রূপতরঙ্গে ঐরাবতের মত নাকানি-চুবানি খেয়ে যে-হাস্যরস সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে প্রাচীন বিদূষক ঘটিত হাস্যরসের সাদৃশ্য কোথায়, তা আলোচনা করা যাক। এখানে আশমানী দাসী এবং বিমলা দাসীরূপে পরিচিত। বিদ্যাদিগ্‌গজ পেটুক ব্রাহ্মণ... নির্বোধ রসিক। 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণে (যখন বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি পরবর্তী বঙ্কিমের রুচির মত শুচিশুভ্র হয়ে ওঠেনি) আশমানী কেবল পরিহাস-রসিকতা করেনি, দিগ্‌গজের মুখের ভিতর পানের পিক ঢেলে দিয়েছে। প্রথম সংস্করণে পাই "দিগ্‌গজ গিলিতেও পারেন না, এই ভোজনের পর এক গাল থুতু কেমন করিয়াই বা গেলেন ? নীলকণ্ঠের বিষের ন্যায় গালের মধ্যেই রহিল।" ঐ সংস্করণে

আশমানী দিগ্‌গজের গাল কামড়ে রক্ত বার ক'রে পরিহাসের চূড়ান্ত করেছে। এই ধরণের হাস্যরসকে নিশ্চয়ই শুচি-শুভ্র হাস্যরস বলা চলে না। এ হচ্ছে প্রাচীন ধারার হাস্যরস। এখানে হাস্যরস বর্তমান কালের পাঠকের কাছে বীভৎস রসের উদাহরণ বলে বোধ হবে।

আদিরসের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে প্রাচীন কাব্যধারা-জলে অবগাহন স্নান করেছেন, তা দেখানো যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে-বঙ্কিমচন্দ্রকে পণ্ডিতী আদিরসের অবতারণায় লজ্জিত হয়ে পলায়ন করতে দেখেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনাকালের সাতাশ বছরের যুবক বঙ্কিমচন্দ্র নন। সকলেই জানেন যে সংস্কৃত-প্রাকৃত কাব্যসাহিত্যে সারাদেহের 'স্ট্যাটিস্টিক্‌স্' (vital statistics) বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনায় লজ্জার স্থান ছিল না। এখন যেমন বিশ্বের সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর প্রতিযোগিতায় ওপরের ঘের, মাঝের ঘের, আর নিচের ঘের মাপবার জন্য ফুট-ইঞ্চির দরকার হয়, তখন সংস্কৃত প্রাকৃত কবিতায় নারীদেহের সৌন্দর্য বর্ণনায় স্তনের কাঠিন্য ও পীনত্ব, কটির ক্ষীণত্ব, আর নিতম্ব-উরুর গুরুত্ব বর্ণনা না হ'লে কবিতাই হোত না। প্রাকৃতের কবিগুরু রাজশেখর বালকমুষ্টিতে ধরা যায় এমন নারী-কটির, আর দুই বাহু দিয়েও ঘেরা যায় না এমন নিতম্ব ঘেরের বর্ণনা করেছেন (মণণে মজঝং তিবলিবলিদং ডিম্ভ মুট্‌ঠিঅ গেজ্ঝ। ণো বাহুহিং রমণফলঅং বেট্‌ঠিত্তুং জাদি দোহিং॥)। সংস্কৃত-প্রাকৃতের পদাঙ্কানুসারী প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকেরা নারীদের ঐ সকল অঙ্গের খোলাখুলি আলোচনা করতে দ্বিধা-সঙ্কোচ বোধ করেন নি। ইংরাজী সাহিত্যের নব-ধারাজলে স্নাত ভিক্টোরিয়-রুচিবিশিষ্টেরা এবম্বিধ বর্ণনায় "শক্‌ড" (shocked) হয়েছিলেন। যে-বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে দিয়ে প্রাচীনপন্থীর স্থূল রসিকতায় পালিয়ে গিয়েছিলেন সলজ্জ-সঙ্কোচে, তিনি ইংরাজী-শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র। আর যে-বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে কলম ধরেছিলেন তিনি বয়সে নবীন আর ইংরাজী-শিক্ষিত হ'লেও ভাটপাড়া এবং সংস্কৃত হতে খুব দূরে ছিলেন না। তাই 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিনি স্তন-উরু-নিতম্ব বর্ণনায় রসায়িত। পরবর্তীকালে তিনি যে কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনীর 'ভাইট্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স' দেননি তার কারণ তাঁর মধ্যে নব্য রুচির ক্রমবিকাশ। 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণে তিনি প্রাচীন সাহিত্যাদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' হ'তে অনেক অংশ বাদ দিয়েছেন। আশমানীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ;—

"কুচযুগ দেখিয়া দাড়িম্ব বঙ্গদেশ ছাড়িয়া পাটনা-অঞ্চলে পলাইয়া রহিলেন···বাকি ছিলেন ধবলগিরি, তিনি দেখিলেন যে, আমার চূড়া কতই বা উচ্চ আড়াই ক্রোশ বই ত নয়, ইহার পয়োধর (পরবর্তী সংস্করণে "এ চূড়া") অন্যূন তিন ক্রোশ হইবেক।···নিতম্ব ধরার অপেক্ষায় বৃহৎ তাঁহাতে বিস্তর গাছপালা, গো-মনুষ্যাদি থাকিতে পারে, কিন্তু নিকটে উরুস্বরূপ দুইটি কদলী গাছ; কদলীগাছের আওতায় অন্য গাছ গজায় না; আর পাছে কলাগাছ খাইয়া ফেলে বলিয়া বিধাতা তথায় গো-মনুষ্যের সৃষ্টি করেন নাই।"

'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণে বেশনিরত বিমলার অনাবৃত বক্ষের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে লিখেছেন, "কাঁচুলি-শূন্য বক্ষস্থল কালজয়ী কি না দেখ।"

পরবর্তী সংস্করণে বিমলা বীরেন্দ্র সিংহের নিকট বিদায় নিয়ে (দশম পরিচ্ছেদ) বিদ্যাদিগ্‌গজের কাছে যাবার প্রাক্কালে কেবল দৃষ্টিপাতে বীরেন্দ্র সিংহকে নন্দিত ক'রে গেছেন। কিন্তু প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র আদিরস সৃষ্টির এই সুযোগ ছাড়েন নি। সেখানে "বীরেন্দ্রের হৃদয়ে (বিমলার) কাঁচলিমুক্তা স্পর্শ হইল। একবার দ্বারের দিকে নেত্রপাত করিয়া (বিমলা) নিজ রসাল ওষ্ঠাধর বীরেন্দ্রের ওষ্ঠে সংক্ষিপ্ত করিলেন।"

পরবর্তী সংস্করণে মার্জিতরুচি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে, তিলোত্তমা গীতগোবিন্দ পড়ে লজ্জিত হলেন। কিন্তু প্রথম সংস্করণে ছিল তিলোত্তমা গীতগোবিন্দের কোন্ অংশ পাঠ করে লজ্জিত হয়েছিলেন ("রিপুমিব কেলিষু লোলম্")।

কতলুখাঁর হত্যা দৃশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণে বিমলা ও নর্তকীদের আদিরসের যে ফোয়ারা ছুটিয়েছেন তা পরবর্তী সংস্করণে কিছু বাদ দিয়েছেন (প্রথম সংস্করণের পাঠান্তর 'দুর্গেশনন্দিনী'র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণে দ্রষ্টব্য)।

বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ যে 'দুর্গেশনন্দিনী' হ'তে অনেক বদলেছে তা আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করলেই বুঝতে পারা যাবে। ভারতচন্দ্রও কবি, মধুসূদনও কবি। ভারতচন্দ্র প্রাচীন কাব্যধারার কবি, আদিরসের কবি। মধুসূদন আধুনিক কাব্যধারার কবি, বীররস বা করুণরসের কবি। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনাকালে ভারতচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণ করেছেন দ্বাদশ পরিচ্ছেদে। তিনি আশমানীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বিদ্যার রূপবর্ণনার আদর্শ অনুসরণ করেছেন। যথা—

"আশমানীর বেণীর শোভা ফণিনীর ন্যায়; ফণিনী সেই তাপে মনে ভাবিল, যদি বেণীর কাছে পরাস্ত হইলাম, তবে আর এ দেহ লোকের কাছে লইয়া বেড়াইবার প্রয়োজনটি কি? আমি গর্তে যাই। এই ভাবিয়া সাপ গর্তের ভিতরে গেলেন।"

ভারতচন্দ্র বিদ্যার রূপবর্ণনা ক'রে লিখেছেন ঃ—

বিননিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥

সত্যই বঙ্কিমচন্দ্র যে এই সময় গভীর ভাবে ভারতচন্দ্রের কবিতা পড়েছিলেন তার পরিচয় 'মৃণালিনী'র (১৮৬৯) মধ্যেও রেখেছেন। ভারতচন্দ্রের বিপরীত বিহার বর্ণনা আদিরস-রসিকের পরম উপভোগ্য সামগ্রী। তার মধ্যে ভারতচন্দ্রের—

'আজি দিন দ্বিপ্রহরে দেখিলাম সরোবরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করী।'

প্রভৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত 'মৃণালিনী'র চতুর্থ পরিচ্ছেদে গিরিজায়ার নিম্নোদ্ধৃত গানটি—

দেখিনাম সরোবরে কাঁপিছে পবন-ভরে
মৃণাল উপরে মৃণালিনী।

'মৃণালিনী'র প্রথম সংস্করণে গিরিজায়ার মুখে আদিরসের যে গীতিটি ছিল তা হ'ল—

কটি-বাস কসিয়ে রাস-রসে রসিয়ে
মাতিল রস-কামিনী।

এই গীতটি পরবর্তী সংস্করণে মার্জিতরুচি বঙ্কিমচন্দ্র পরিত্যাগ করেছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' হ'তে 'কপালকুণ্ডলা'র কালানুক্রমিক ব্যবধান মাত্র এক বছরের কিন্তু রুচি-পার্থক্য প্রায় এক শতাব্দীর। 'কপালকুণ্ডলা'তে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা আপন পথ খুঁজে নিল। সেখানে অনেক কবির উদ্ধৃতির সাথে পরিচ্ছেদের শিরোদেশে মধুসূদন হ'তে উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে মৃণালিনী আবার একটি প্রতিভাহীনতার অধ্যায়। 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র যেন হঠাৎ প্রাক্-'কপালকুণ্ডলা' যুগে ফিরে গেছেন (সত্যই আমার সন্দেহ হয় 'মৃণালিনী' কপালকুণ্ডলা'র পরবর্তী না পূর্ববর্তী? 'কপালকুণ্ডলা'র পরে এর প্রকাশকাল বটে কিন্তু রচনাকালও কি পরবর্তী? কেন না, রচনারীতির বিচারে কিছুতেই 'মৃণালিনী'কে 'কপালকুণ্ডলা'র পরবর্তী বলে মনে হয় না)। মৃণালিনীতে ভারতচন্দ্র আবার স্থান পেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। সৌভাগ্যক্রমে সে অধ্যায় অতিক্রম করে বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি আবার সার্থক কাব্যধারার দিকে এগিয়ে চলেছে। পরবর্তী কালে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে ভারতচন্দ্রের স্থলে মধুসূদন অদ্বৈত মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত। 'দুর্গেশনন্দিনী'-

'মৃণালিনী'তে ভারতচন্দ্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 'কপালকুণ্ডলা'তে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচ্ছেদে মধুসূদনকে শিরোধার্য করেছেন কিন্তু উদ্‌বৃতি ছাড়া আপন বর্ণনায় অনুসরণ নেই। 'বিষবৃক্ষ' গ্রন্থে মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার মধ্যে ধীরে ধীরে নিজেকে বিস্তৃত করেছেন। বিষবৃক্ষের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায় মধুসূদনেব প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

যেমন বহু দীপ-সমুজ্জ্বল বহু লোক-সমাকীর্ণ গীতধ্বনিপূর্ণ নাট্যশালা নাট্যরঙ্গ সমাপন হইলে পর অন্ধকার, জনশূন্য, নীরব হয়, এই মহাপুবী সূর্যমুখী-নগেন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেইরূপ আঁধার হইল।

উপরি-লিখিত অংশটি মধুসূদনের নিম্নোদ্‌ধৃত অংশের প্রভাবপুষ্ট :

কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী। কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ;
নীরব রবাব, বীণা, মুবজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি বে এখানে ?

বঙ্কিম-প্রতিভা বিকাশের ইতিহাসে এই আদর্শ-পরিবর্তন বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র বয়সে নবীন, আদর্শে প্রাচীন। পরবর্তী কালে, বিশেষতঃ 'বিষবৃক্ষ'-এ, বঙ্কিমচন্দ্র বয়সে খুব নবীন (৩৫ বৎসর) না হ'লেও আদর্শে নবীন। তিনি সেখানে একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা ও বিধবা-বিবাহকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। আবার স্বীকৃতিদানের মধ্যে প্রাচীন সংস্কার-ব্যাধিটি রিল্যাপ্‌স ক'রে সে বিবাহের মৃত্যু ঘটিয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কপালকুণ্ডলা

॥ ১ ॥ রোমান্স ও উপন্যাস

মাত্র এক বৎসরের ব্যবধানে যে এক শতাব্দীর রচনা-রীতিগত প্রবীণতা প্রদর্শন করা যেতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র তা সার্থকভাবে দেখিয়েছেন 'কপালকুণ্ডলা'র মধ্যে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনায, চরিত্রচিত্রণে, ভাবায় ও রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে প্রথম প্রকাশের সলাজ সংকোচ দেখা দিয়েছিল তা 'কপালকুণ্ডলা'তে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে প্রেম গড়মান্দারণে এবং জগৎসিংহের চিত্তে—অর্থাৎ দূরের স্থানে দূরের মানুষের মধ্যে। 'কপালকুণ্ডলা'র মধ্যে যে-প্রেমের চিত্র তিনি দিয়েছেন সে-প্রেম আমাদের জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। প্রেমের যে চিরন্তন রূপ যুগে যুগে কবিচিত্তকে উদ্বেল করেছে, যে প্রেম জয় করেও ভয়হীন হতে পাবে না, যে প্রেম কাছে থেকেও দূর রচনা করে, যে প্রেম সংসারের মধ্যেও মরুভূমি সৃষ্টি করে, সেই পাওয়া ও না পাওয়ার বেদনাযুক্ত প্রেমকে চমৎকারভাবে বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন 'কপালকুণ্ডলা'তে। কপালকুণ্ডলাকে যখন নবকুমার প্রথম দেখলেন তখন সে দেখার মধ্যে রোমান্স-লোকের রসরহস্য ছিল, ছিল সুন্দরী আর অরণ্য। আর পরবর্তী কালে পরিচিতা কপালকুণ্ডলা, পরিণীতা কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে সংসারের সমাজের মধ্যে যখন নবকুমার উপলব্ধি করলেন ইনি অপরিচিতা ও অপরিণীতা তখন যে-বেদনাবিহ্বল-রক্তাক্ত-হৃদয়টিকে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীর কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠা করেছেন সে-বেদনা উপন্যাসের উপজীব্য। রোমান্টিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করে ওয়াল্টার পেটার তাঁর Appreciation গ্রন্থের Postscript পর্যায়ে আলোচনা করে বলেছেন যে, রোমান্টিক অনুভূতির মধ্যে সুন্দরের সঙ্গে অপরিচিতের মিলন ঘটে ("Strangeness added to Beauty")…নবকুমার অরণ্যের অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে আলুলায়িতকুন্তলা অচিরোদ্ভিন্নযৌবনা যে বনকুমারীকে দেখেছেন প্রথমবারে, সে দেখা রোমান্টিক হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে অপরিচিতা নারী, অপরিচিত পরিবেশ, সুন্দর গোধূলি এবং সুন্দর দেহের ষড়যন্ত্র আছে। নবকুমারের অনতিপরিতৃপ্ত তরুণ হৃদয়ের বুভুক্ষাও

সেই দর্শনজাত পূর্বরাগের ইন্ধন জুগিয়েছে। সেই গোধূলির আলোছায়াঘেরা মুহূর্তে অসীম সমুদ্র আর অসীম অরণ্যের সম্মুখে অপরিচিতা অচিরোদ্‌ভিন্ন-যৌবনা তাঁর মনে যে সুর সৃষ্টি করেছে সে সুর 'Strange' এর সঙ্গে 'Beautiful' এর সংমিশ্রণ জাত যৌবনের বেদনারস-উচ্ছলতার সুর। তারপর সেই কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে অরণ্য থেকে সংসারে ফিরেছেন নবকুমার। সেই সংসার তাঁর কাছে অরণ্য হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতে একটি সুভাষিত আছে যার অর্থ হল—মা যার ঘরে নেই আর স্ত্রী যার অপ্রিয়বাদিনী তার গন্তব্যস্থল হল অরণ্য কারণ তার কাছে অরণ্যও যা গৃহও তা। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেন নি; নবকুমারের কাছে বিবাহ বিশেষরূপে বহনের বেদনা হয়ে দেখা দিয়েছে। কপালকুণ্ডলা বনহরিণীর স্বচ্ছন্দ গতি হারিয়ে সংসারের সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে অবাধ বিচরণের অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পান নি। তাঁর আবাল্য সংস্কার যৌবনের সংসারের কাছে কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করেনি। তাই মনে মনে ট্র্যাজেডি রচনা হয়েছে দীর্ঘদিন। পদ্মাবতীর ষড়যন্ত্রের সাহায্যে, নবকুমারের উন্মত্ততায়, কাপালিকের পানীয় ও আভিচারিকের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার চিত্ত-আকাশের ভৈরবীমূর্তি মিলিত হয়ে চরম পরিণতি ঘটিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরীক্ষামূলক উপন্যাস সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস হয়ে উঠতো এবং সার্থক উপন্যাস হয়ে উঠতো যদি এর মধ্যে আগ্রা দুর্গ, মতিবিবি ও কাপালিকের ষড়যন্ত্রের উল্লেখ না থাকতো। কাহিনীর মধ্যে এগুলি বাইরের ঘটনা। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার মনে মিলনের মধ্যেও যে বিচ্ছেদের বেদনা জেগেছিল তারই স্বাভাবিক পরিণতি সুন্দর Domestic Tragedy রূপে দেখা দিত এবং তাই বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি নারীর বিবাহোত্তর জীবন নিয়ে আলোচনা করবার জন্য সংকল্প নিয়েছিলেন যার প্রাগবিবাহ জীবন কেটেছে সম্পূর্ণভাবে মনুষ্য সমাজের বাইরে মনুষ্য-দেহধারী একমাত্র কাপালিকের (ও কিছুটা অধিকারীর) সংস্পর্শে। যে-সংসারের পরিচয় লাভ করেনি সে-সংসারের মর্মমূলে এসে প্রেমের আস্বাদ লাভ করলে, সে নিজে কি প্রেম-উদ্বেল হয়ে উঠবে, না মনুষ্য-সমাজের বাইরে তার যে জীবন কেটেছে সেই জীবন সেই সংস্কার তার বিবাহিত জীবন কি ব্যর্থ করে তুলবে? এই সমস্যা নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে রোমান্স-লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণের মতই রোমান্সের

অংশটুকু নিজের হাতে লিখে দিয়ে গেছেন। তারই ফলে মনস্তত্ত্বমূলক একটি সুন্দর গার্হস্থ্য উপন্যাস রোমান্সের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। যে ট্র্যাজেডি অন্তরের বেদনা হতে স্বাভাবিকভাবেই আসতো এবং এসে স্বাভাবিক সৌন্দর্য লাভ করতো সেই 'চরিত্রই নিয়তি-মূলক ট্র্যাজেডির উপরে খল চরিত্র ও ষড়যন্ত্র বিস্তৃত হয়েছে অকারণে। কাপালিক ও পদ্মাবতীর সাহায্য ব্যতীতই বঙ্কিমচন্দ্র গার্হস্থ্য ট্র্যাজেডিতে সিদ্ধিলাভ করতেন, কিন্তু মতিবিবি আসার ফলে তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটেছে বটে কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেনি। মতিবিবির মত নারী যে কোন নারীর চিত্তে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করতে পারে, যে কোন সংসারে বেদনা সৃষ্টি করতে পারে। কাপালিকের মত বিক্ষুব্ধ, নির্মম, কঠোর, প্রতিবিধিৎসাচঞ্চল, সংস্কারমুগ্ধ তান্ত্রিক মারণযজ্ঞের সাহায্যে যে কোন দম্পতীর মধ্যে মৃত্যুর অভিশাপ নিয়ে আসতে পারে। তাই মতিবিবি ও কাপালিকের প্রয়োজনীয়তা বেশী করে স্বীকার করার ফলে বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থের উত্তরার্ধে আপন পূর্বকল্পিত পরীক্ষার পথ পরিত্যাগ করে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্র হতে নিরানন্দ রোমান্স রচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন। তাই আমার মতে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের পক্ষে মতিবিবি অপ্রয়োজনীয় চরিত্র। 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থের মাঝখানে তার প্রাধান্য-স্বীকৃতি 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটির স্বাভাবিক পরিণতির পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। মতিবিবি চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা হবে। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এক বছরের মধ্যে এক শতাব্দীর পরিপক্কতা কি ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তার আলোচনা করা যাক্।

(ক) 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী আমাদের জীবনের ও সমাজের পরিমণ্ডলের বাইরে। 'কপালকুণ্ডলা'র মধ্যে অরণ্য ও আগ্রা দুর্গ থাকলেও আমাদের সংসার ও সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের সুখদুঃখকে তা বিধৃত করেছে।

(খ) 'দুর্গেশনন্দিনী'তে পাশ্চাত্ত্য রোমান্স রচনার ধারা সরাসরি অনুসৃত। রোমান্সের পরিণতির অম্লমধুরতা তিলোত্তমার বিবাহে ও আয়েষার দীর্ঘনিশ্বাসে। রোমান্সের পক্ষে অস্বাভাবিক এবং উপন্যাসের পক্ষে স্বাভাবিক পরিণতি হ'ল মৃত্যু বা জীবনের ব্যর্থতা। জীবনের ব্যর্থতা এবং শেষে নিরুদ্দেশ যাত্রায় 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

(গ) 'দুর্গেশনন্দিনী' বাহিরের ঘটনামূলক, 'কপালকুণ্ডলা' অন্তর্বেদনামূলক। এ বেদনা নবকুমারের দাম্পত্য সুখের জন্য, এ বেদনা কপালকুণ্ডলার আরণ্য-আনন্দের জন্য। এ অন্তর্বেদনায় সংযুক্ত হয়েছে নবকুমারের ক্ষেত্রে সংসারের সংশয় আর

কপালকুণ্ডলার ক্ষেত্রে সহজাত সংস্কার। নবকুমারের সংশয়জাত সন্দেহ ও সন্দেহ-জাত সাময়িক বুদ্ধিভ্রংশ সেই অবস্থাকে জটিল করে তুলেছে। কপালকুণ্ডলার সহজাত সংস্কার তাঁর স্বপ্নে, তাঁর ভৈরবী দর্শনের মধ্যে আপনাকে অভিব্যক্ত করেছে। এই সংস্কারের প্রবল স্রোতে কপালকুণ্ডলার সংসার-তরণী নিমজ্জিত হয়েছে।

(ঘ) 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে সাংকেতিকতা, অলৌকিক রহস্য ও নিয়তি নির্দেশের বিশেষ ব্যাপার নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-রীতির মধ্যে এই সকল বিশেষ প্রাধান্যলাভ করেছে। 'কপালকুণ্ডলা'য় তার প্রথম সার্থক প্রকাশ।

(ঙ) 'দুর্গেশনন্দিনী'র নায়িকা তিলোত্তমা অপরিস্ফুট। 'কপালকুণ্ডলা'র নায়িকা চরিত্র সম্বন্ধে কারো কোন সংশয় নেই। কপালকুণ্ডলা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একটি অপূর্ব চরিত্র। দেশ বিদেশের কোন সাহিত্যেই ঠিক এই ধরণের চরিত্র এত সুন্দর, এত উজ্জ্বল, এত করুণ ও মর্মস্পর্শীভাবে বোধহয় ফুটিয়ে তোলা হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনী শক্তি কপালকুণ্ডলাকে অমরত্ব দান করেছে। একটি অভিনব ও চিরন্তন চরিত্র কপালকুণ্ডলা। রহস্যে ঘেরা দ্বীপের মত সে সংসার তরঙ্গের মধ্যে অনড় অচল। রহস্যে ঘেরা অরণ্যের মত আলুলায়িতকুন্তলা কপালকুণ্ডলা কোন দূর দেশের মানুষ, তাকে কাছে পেয়েও পাওয়া যায় না, সংসারের মধ্যে এসেও সংসারকে সে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে না—অথচ স্নেহে, দয়ায়, রূপে ও কয়েকটি গুণে এমন জীবনলক্ষণা-ক্রান্ত চরিত্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বড় একটি দেখা যায় না।

(চ) 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রতিনায়িকা আয়েষা এবং অপ্রধান চরিত্র বিমলা ঘটনার পরিচালিকা হয়ে দেখা দিয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনীর' প্রথমার্ধে বিমলা ও দ্বিতীয়ার্ধে আয়েষা সমস্ত ঘটনাকে বিধৃত করে আছে। নায়িকা চরিত্র সেখানে পার্শ্বচরিত্রের মত কোন রকমে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নায়িকার চরিত্রচিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরণের ত্রুটি প্রদর্শন করেন নি। প্রতিনায়িকা চরিত্র সুন্দর ও সার্থক হয়ে ফুটেছে অথচ মতিবিবি আয়েষার মত নায়িকাকে আড়াল করে দাঁড়ায়নি। 'দুর্গেশনন্দিনী' পাঠ সমাপনান্তে তিলোত্তমার বিবাহের আনন্দ অপেক্ষা আয়েষার জীবনের ব্যথাই পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে রাখে। কিন্তু পাঠকসাধারণের সহানুভূতি 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থে প্রতিনায়িকা মতিবিবি অসঙ্গতভাবে আকর্ষণ করে না। কপালকুণ্ডলার বেদনা ও নবকুমারের ব্যর্থতার পাশে মতিবিবি তার বেদনা নিয়ে অপমানিত অবস্থায় দূরে যায়। পাঠকচিত্তের মধ্যে সে সম্মানের আসন পায় না আয়েষার মত। অথচ তার বেদনা তো কম নয়।

তার সাহস ও শক্তি কারো চাইতেও কম প্রশংসার যোগ্য নয়। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের প্রাণরক্ষা করেছেন বনের মধ্যে; আর সংসারের মধ্যে প্রাণ হরণ করেছেন ধীরে ধীরে। মতিবিবি পরিত্যাগ করেছে আগ্রার ঐশ্বর্য, এত দিনের প্রবৃত্তির পথ। নবকুমারের কাছে প্রেম নিবেদন করেছে, পূর্বস্ত্রী হিসাবে অনুগৃহীত হয়ে থাকার প্রার্থনা করেছে। তার চিত্তের দুরন্ত প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়ে দুর্দান্ত প্রতিহিংসার রূপ নিয়েছে। অথচ সপত্নীবিদ্বেষকে সে স্তিমিত করেছে। কপালকুণ্ডলার প্রাণরক্ষার জন্য সে সচেষ্ট। কাপালিকের ষড়যন্ত্রের সে কিছুটা প্রতিবাদও করেছে। তার সমস্ত ঘৃণ্য কার্যকলাপের মধ্যে তার যৌবনচঞ্চল মনের সত্যজাগ্রত প্রেমের অপ্রতিহত বেগ লক্ষ্য করা যায়। আর যত প্রবলভাবে সে পাবার চেষ্টা করেছে ততই নবকুমার তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা দুজনকেই সে হারিয়েছে চিরকালের মত। অথচ তারই আশা এবং তার ভালোবাসা নবকুমারকে কেন্দ্র করেই। তার আশাভঙ্গের বেদনা তার কাছে যতখানি তীব্র বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গতভাবেই পাঠকের কাছে ততখানি তীব্র করে তোলেন নি। প্রতিনায়িকার ব্যর্থ প্রেমের বেদনার অভিব্যক্তি 'দুর্গেশনন্দিনী' অপেক্ষা এ উপন্যাসে আরও সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রতিনায়িকা কাব্যের উপেক্ষিতা, তাকে কাব্যের প্রয়োজনেই নায়িকার পাশে কিছুটা উপেক্ষিত করতে হয়—বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসের মধ্যে প্রবীণ শিল্পীর মত তা করেছেন। অনুভূতিশীল পাঠক কিন্তু পদ্মাবতীর অন্তর্বেদনাকে কপালকুণ্ডলার বেদনা অপেক্ষা কম তীব্র মনে করবেন না। কারণ, কপালকুণ্ডলা অন্তরের মাঝখানে অন্বেষণ করে কোথাও নবকুমারকে পাননি এবং সহজেই নবকুমারকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে রাজি হয়েছেন মতিবিবির কথায়। তাঁর কাছে সংসার অপেক্ষা, নবকুমার অপেক্ষা, অরণ্য ও সংস্কার অনেক বেশী মূল্যবান। তাই নবকুমারকে হারানোর বেদনা মতিবিবিকে যতখানি অভিভূত করে ততখানি কপালকুণ্ডলাকে করেনি। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে গ্রহণ করেছেন অথচ অন্তরের মধ্যে পাননি। সংসারের মধ্যে কপালকুণ্ডলা এসেছেন মাটির পুতুলের মত। তাকে মৃন্ময়ী মূর্তি ছাড়া নবকুমার আর কোন মূর্তিতে লাভ করেন নি। হতে পারে নবকুমার সে মূর্তির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। কিন্তু প্রেমহীনা পত্নীর সঙ্গে বিবাহিত জীবন যে বেদনা-বিহ্বল ব্যর্থ জীবনের নামান্তর ('a man married is a man marred') তা উপলব্ধি করেছেন। সুতরাং তাঁর জীবনে মৃত্যু তো দীর্ঘদিন ধরেই ঘটেছিলো, দেহের

অবসান ঘটলো সেই মানস মৃত্যুর স্বাভাবিক পরিণতি রূপে। সে মৃত্যুর সঙ্গে মুক্তির যোগ আছে। অন্তরের প্রেমের টানে তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন কপালকুণ্ডলাকে তুলতে কিন্তু কপালকুণ্ডলার চরিত্রের মাঝখানে যে বিশেষ প্রবণতা তাঁর জীবনকে ব্যর্থ করেছে, জল হতে উদ্ধার পেলেও সে প্রবণতা লুপ্ত হতো না—একমাত্র দামোদর মুখোপাধ্যায়ের পরিকল্পনাতেই মৃন্ময়ীর গার্হস্থ্য জীবন সম্ভব। কপাল-কুণ্ডলা চরিত্রের পৌর্বাপর্ব বিচার করলে কপালকুণ্ডলার চরিত্রই যে ট্র্যাজেডির নিয়ামক (Character is destiny) তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সুতরাং কপালকুণ্ডলা গ্রন্থের শেষ পরিণতিতে নায়িকা কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার চরিত্রের স্বাভাবিক মুক্তি ঘটেছে। সে মুক্তি আনন্দের। কিন্তু পাঠকের চিত্ত এমন সুকৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র ট্র্যাজেডির করুণা ও বিভীষিকায় পরিপূর্ণ করে দেন যে আমরা সাধারণতই এই পরিণতিকে দুঃখজনক বলে মনে করি এবং কপালকুণ্ডলার দুঃখে ও নবকুমারের দুঃখে অভিভূত হই। কিন্তু দুঃখ তো সবচেয়ে তীব্র মতিবিবির। যে নিবিড় ভাবে সব চেয়েছিল সে একেবারেই কিছু পেল না। কপালকুণ্ডলার নিরাসক্ত মনে আত্মত্যাগেচ্ছু হৃদয়ে দাম্পত্য প্রেমের ব্যর্থতা জনিত বেদনা কোথায়? সে বেদনা নবকুমারের—পেয়ে হারানোর বেদনা। সে বেদনা মতিবিবির—না পাওয়ার বেদনা। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকৃতিত্ব ; তা এমনি একটি বিভ্রম সৃষ্টি করে যাতে প্রতিনায়িকার তীব্র বেদনাকে অনাদর করে ও নায়িকার বেদনাকে অনেক বেশী মূল্য দেয়। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র করুণ রস সৃষ্টিতে পাঠক চিত্তের সমস্ত সহানুভূতি কেন্দ্রীভূত করেছেন আয়েষার দিকে —প্রতিনায়িকার দিকে।

(ছ) 'দুর্গেশনন্দিনী'তে হাস্যরস স্থূলতা ও গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট। তাতে বিদূষকের আদিরসঘটিত ও ঔদরিকতা-কেন্দ্রিক রসসৃষ্টির প্রয়াস আছে। বিদ্যা-দিগ্‌গজ রূপে কৃষ্ণ, গুণে বিদূষক। সে ভালোবাসে আহার্য ; ব্রাহ্মণত্বের মিথ্যা অনুষ্ঠানের মধ্যে এঁটোকাঁটার বিচার বাদ দিয়ে সে আপন উদরসর্বস্বতার পরিচয় দেয়। সে সত্যিকার ব্রাহ্মণের মত উদার নয়, সে পেটুক ব্রাহ্মণের মত উদরপরায়ণ। এরি ফাঁকে সর্বগ্রাসী আহার চিন্তার মধ্যে রাঙা মুখের আকর্ষণ তাকে চঞ্চল করে তোলে। সে আশমানী ও বিমলাকে নিয়ে নির্বোধের স্বর্গ রচনা করতে চায়। বিদ্যাদিগ্‌গজকে অবলম্বন করে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র যে ধরণের অমার্জিত স্থূল হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তার কিছু নমুনা পর্বেই দেওয়া গেছে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'দুর্গেশনন্দিনী'র সংস্করণের পাঠভেদটি এ বিষয়ে দেখা কর্তব্য। 'কপালকুণ্ডলা'র মধ্যে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরণের ভাঁড়ামির অবতারণা করেননি।

'দুর্গেশনন্দিনী' এবং 'কপালকুণ্ডলা'র মধ্যে প্রকাশকালগত ব্যবধান এক বৎসরের হ'লেও লেখকচিত্তের পরিণতিতে এই স্বল্পকালের মধ্যে যথেষ্ট পরিপক্কতা এসেছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্ত আমাদের সংসারের বাইরে রূপকথা-রাজ্যের ধার-ঘেঁষা দেশে এক রাজপুত্র আর দুই 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে মিলনবিরহের সুখপাঠ্য কাহিনী রচনা করেছে। 'কপালকুণ্ডলা'তে সেই বঙ্কিমচন্দ্র অরণ্যের নিভৃত স্নেহচ্ছায়ায় প্রবর্ধিত এক অচিরোদ্ভিন্নযৌবনা নারী এবং সংসার-তাপদগ্ধ মধ্যবিত্ত যুবকের পরিণয়-পরবর্তী জীবনের বিষাদ-বিদীর্ণ চিত্ত এঁকেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে নায়কনায়িকার বিবাহের আনন্দে ও আয়েষার বিরহবেদনায় কাহিনীর পরিসমাপ্তি। 'কপালকুণ্ডলা'য় কাহিনী কেবল আমাদের সংসারের মধ্যে ক্রমবিকাশ লাভ করেনি। দাম্পত্যজীবন হ'তেই কাহিনীর উপন্যাস অংশের সূত্রপাত এবং নায়কনায়িকার তিরোধানের সঙ্গে তার পরিসমাপ্তি। বিবাহোত্তর জীবনের মধ্যে প্রাগ্‌বিবাহ জীবনের সংস্কার ও পূর্বপরিবেশের প্রভাব কতখানি তাই নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পরীক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্র একদা আত্মীয় বন্ধুদের নিকট প্রশ্ন করেছিলেন, "যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক-ভিন্ন কাহারও মুখ দেখিতে না পায়, সমাজে কাহারও সঙ্গে মিশিতে না পাবে, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারেই অন্তর্হিত হইবে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জীবচন্দ্র বলেছিলেন, "কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে, পরে সন্তানাদি হইলে স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারেই তিরোহিত হইবে।" …বঙ্কিমচন্দ্র এই উত্তর অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেননি। তিনি আপনার ধারণার যথোচিত কাহিনীরূপ দিয়েছেন 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে। জনহীন সমুদ্রতীরবর্তী কাপালিক-তপোবনে পরিবর্ধিতা কপালকুণ্ডলা আপনজীবনের মর্মমূলে যে ধর্ম-চেতনা, সংস্কার এবং বনহরিণীর চঞ্চলতা অভ্যস্ত করেছিলেন তা নবকুমারের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়নি। দাম্পত্যজীবনে পাতিব্রত্যের দীক্ষা

তিনি অনেক পরবর্তীকালে পেয়েছিলেন—বিবাহিত জীবনের প্রথম পাদে। আর ধর্ম-সংস্কার সম্বন্ধে কাপালিকের নিকট দীক্ষা লাভ করেছিলেন চৈতন্য উন্মেষের প্রথম লগ্নে। মগ্নচৈতন্যের মধ্যে দীর্ঘদিনের সংবর্ধিত সেই সংস্কার নবকুমারের প্রণয় বা পরিণয় কোন কিছুই উন্মূলিত করতে পারেনি।

কপালকুণ্ডলার জীবন প্রণয়বিহীন পরিণয়। নবকুমারের জীবনও তাই। কপালকুণ্ডলা অতীতের দিকে তাকিয়ে কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন এবং নবকুমার ভবিষ্যতের আশায় বুক বেঁধেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের রায় সযত্নে উল্টে দিয়েছেন। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের নির্দিষ্ট পন্থায় তিনি চলেননি। সন্তানাদি কপাল-কুণ্ডলার হয়নি এবং বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ সহ-অবস্থিতির পূর্বে, বিবাহোত্তর প্রণয় বিকাশের বেশী অবসর না দিয়ে তিনি ক্রূরকর্মা কাপালিক ও ঈর্ষা-উদ্বেজিত প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিনী মতিবিবির আবির্ভাব ঘটিয়ে কাহিনীকে পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে গেছেন। ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে কপালকুণ্ডলার যৌনজীবন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছেন। প্রকৃতি যেখানে উগ্র যৌনচেতনায় পরিপূর্ণ (ferociously sexual) সেখানে কপালকুণ্ডলার যৌন অপবিতৃপ্তি sexual sterility'র পরীক্ষা কিনা তাই নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত সমীচীন ভাবেই বার্নার্ড শ বর্ণিত দুটি নারীর বিষয় তুলে ধরেছেন। বার্নার্ড শ বর্ণিত প্রথম মহিলা কিছুতেই শান্ত হতেন না। তাঁর যৌনক্ষুধা প্রচণ্ড। আর অপর ভদ্রমহিলা যৌন আনন্দকে তীব্র পীড়ন বলে মনে করতেন। তাঁর কাছে চোখের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেওয়া আর যৌন আনন্দ ছিল একই ধরণের তীব্র বেদনাদায়ক অনুভূতি ("like someone sticking a finger into my eye")। নারীতে নারীতে রয়েছে পার্থক্য। কপালকুণ্ডলাকে সেদিক থেকে বিচার না করে কপালকুণ্ডলার বঙ্কিম-পরিকল্পিত চিত্র কতখানি consistent বা পৌর্বাপর্য সমঞ্জস হয়েছে তাই বিচার্য।

'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে ছিল কাহিনীর প্রাধান্য আর 'কপালকুণ্ডলা'র মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে এসেছেন মনস্তত্ত্বের জটিলতা। অর্থাৎ রাজপুত্র হ'তে মধ্যবিত্ত, গড় মান্দারণ হতে আমাদের ঘরে, বাহিরে তলোয়ার ঘোরানো ও দ্বৈরথ যুদ্ধের প্রতিযোগিতা-প্রাঙ্গণ হ'তে একেবারে হৃদয়সমস্যার গভীরে, বঙ্কিমচন্দ্র সরে এসেছেন। আর তারই ফলে কাহিনীটি অনিবার্যভাবে চিত্তসমস্যামূলক হয়ে উঠেছে। সেই সমস্যার মধ্যস্থলে কপালকুণ্ডলা। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে একটি চমৎকার মনস্তত্ত্বমূলক

উপন্যাস রচনার দুর্লভ অবসর পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটি সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বমূলক হয়ে ওঠে নি। তাঁর পরীক্ষাক্ষেত্রে তিনি এমন কিছু উপাদান মিশ্রিত করেছেন যা কাহিনীতে বাহ্য বৈচিত্র্য আনলেও পূর্বনির্দেশিত পরীক্ষাক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। বঙ্কিমচন্দ্রের পরীক্ষা ছিল কপালকুণ্ডলার দাম্পত্যজীবন-মধ্যগত হৃদয়টুকু নিয়ে। সে-হৃদয়ের উপরে তার ফেলে-আসা জীবনের প্রভাব কতখানি তাই ছিল তাঁর বিচার্য। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার সেই হৃদয়ের বিচার-বিশ্লেষণের সঙ্গে কাপালিকের পুনরাবির্ভাব, সংহাবসঙ্কল্প; প্রণয়-বিক্ষুব্ধা প্রতিনায়িকার প্রতিহিংসা এবং নবকুমারের ঈর্ষা-সন্দেহ—এই সকল বাহ্য জটিলতার মধ্যে কপালকুণ্ডলার ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাহিনীটি পরিবেষণ করেছেন। বস্তুতঃ কাপালিকের মত উগ্র বীরোপাসক এবং মতিবিবির মত চতুরা প্রণয়কুপিতার ষড়যন্ত্রের মধ্যে কপালকুণ্ডলার জীবনের চরম ব্যর্থতা এসেছে। কপালকুণ্ডলার বিবাহপূর্ব সংস্কার ও ধর্মমোহের অবধারিত পরিণতি রূপেই দাম্পত্যজীবনের তলদেশে ভাগীরথীর লোলজিহ্বা প্রসারিত হয়নি।

ট্র্যাজেডির নিয়ামক নায়ক নায়িকার চারিত্র-বৈশিষ্ট্য (Character is destiny); বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচিত বিষয় তাই ছিল। কপালকুণ্ডলার জীবনের আদর্শের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজেডির বীজটি কোথায় লুকিয়ে ছিল তা তিনি স্বকৌশলে দেখিয়েছেন। কিন্তু সেই বীজ অঙ্কুরে পরিণত হয়ে জীবনকে ব্যর্থ করেনি। সংসার-অনাসক্তি কপালকুণ্ডলার মধ্যে ছিল এবং তারই অনিবার্য পরিণতি রূপে mutual incompatibility বা কাছে থেকেও দূর বচনার মধ্যে গার্হস্থ্য ট্র্যাজেডি অনিবার্যভাবে সংঘটিত হত। আর তখনই কপালকুণ্ডলার চরিত্রসম্বন্ধীয় পরীক্ষা সম্পূর্ণ সফল হত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ট্র্যাজেডি সংঘটন ক্ষেত্রে আরও দুটি উপাদানের সাহায্য নিয়েছেন। চারিত্রিক দুর্বলতার রন্ধ্রপথেই (Hamartia) কেবল ভাগ্যবিপর্যয়ের শনি প্রবেশ করে না। ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে অনেক সময় যোগ থাকে নিয়তির (বা অদৃষ্টের) এবং খল চরিত্রের। নিয়তি বা গ্রীক Nemesis ভাগ্যবিপর্যয়ের ক্ষেত্রে কপালকুণ্ডলার জীবনে কম প্রভাব বিস্তার করেনি। আর কূটকৌশলী মতিবিবির সঙ্গে ক্রূরকর্মা ভীষণ আদর্শবাদী উগ্র বীরাচারী তান্ত্রিকের সহযোগিতা কপালকুণ্ডলা এবং নবকুমারের জীবনকে শেষ পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছে। আমরা কাপালিককে ঠিক খল চরিত্ররূপে গ্রহণ করতে পারি না, কেননা কাপালিক এখানে বিভ্রান্ত আদর্শের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে আপন ধর্ম ও সংস্কারের যূপকাষ্ঠে একটি সরল প্রাণকে বলি দেওয়া পরমকর্তব্য মনে করেছেন। মতিবিবি আপন

স্বামীকে নায়িকার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাই কাপালিক বা মতিবিবি কাউকেই ঠিক villain বলা না চললেও কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে এদের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ দুরাত্মতা বা villainyর পর্যায়-ভুক্ত বলে মনে হয়, এবং এই দুরাত্মতা বা নাশকতামূলক কার্যের পরিণতি দেখিয়েই গ্রন্থকার তাঁর কাহিনী শেষ করেছেন। ফলে কপালকুণ্ডলা-চিত্তকেন্দ্রিক একটি খাঁটি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বাহিরের বিচিত্র বিরোধ বিক্ষোভে বিবর্ধিত হয়ে অনেকটা রোমান্সে পরিণতি লাভ করেছে।

'কপালকুণ্ডলা'কে রোমান্স পর্যায়ভুক্ত করবার আরও কতকগুলি কারণ আছে। 'কপালকুণ্ডলা'র প্রধান কাহিনী দ্বিধাবিভক্ত—নবকুমার-কপালকুণ্ডলার অরণ্যকাণ্ড ও সংসারকাণ্ড এই দুটি খণ্ডে বিভক্ত। লোকালয় হ'তে বহুদূরবর্তী অরণ্যে কাপালিক-বন্ধনমুক্ত নবকুমার ও বনকুমারীর সাগরতীরবর্তী ক্রিয়াকলাপ আমাদের বাস্তববোধের উপর পীড়ন করে না ঠিকই কিন্তু তা প্রতিদিনের পরিচিত পৃথিবীর অলিতে গলিতে, অভাব ও সমস্যাসমাকীর্ণ ধূলিধূসরতা হ'তে অনেক দূরের। সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে আলুলায়িতকুন্তলার চারিদিকে যে রস-রহস্য ঘনীভূত, বনপথে পথহারানো পথিকের নিকট সেই সুন্দরী প্রাণদাত্রীর যে অসাংসারিকতার অপূর্বতা, বন্ধন-মোচন, পলায়ন, বিবাহ প্রভৃতির যে সুরপরম্পরা—এই সকল বিবেচনায়, নবকুমার-কপালকুণ্ডলার অরণ্যকাণ্ড খাঁটি রোমান্স। তবে ঐ রোমান্স প্রচলিত শ্রেণীর রোমান্স নয়। অস্ত্র ঝঞ্ঝন, দ্বৈরথ যুদ্ধ, কোনও কিছুর দ্বারাই নায়ককে সুন্দরী নায়িকা লাভ করতে হয়নি। বরং এখানে নায়িকাই শক্তিস্বরূপিণী .. তিনিই উদ্ধারকর্ত্রী, নায়কের প্রাণদাত্রী। নায়কলক্ষণ নবকুমারের মধ্যে অনুপস্থিত। নায়কের doing এবং sufferingএর মধ্যে নবকুমারের সমগ্র জীবনে কেবল suffering, নৌবিপর্যয়ের প্রথম দিন হ'তে চৈত্রবায়ুতাড়িত জলধারায় তটভঙ্গ পর্যন্ত কেবল ভাগ্যবিড়ম্বনার বিচিত্র ইতিহাস! নবকুমার-কপালকুণ্ডলার আরণ্যপর্বে নবকুমার রোমান্সের হিরোইন। আর এ পর্ব যুদ্ধ-বিগ্রহ সমন্বিত নাইট-কুলগৌরব হিরোর হিরোইন লাভের কাহিনী সম্বলিত যুবতী-সুখপাঠ্য সাধারণ রোমান্স নয়।

কাহিনীর দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ সংসার পর্ব, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ঘরে কাছে থেকে দূর রচনার ব্যাপার। এটি একটা চমৎকার psychological novel-এ বিবর্তিত হ'তে গিয়ে আবার রোমান্সের সুদূরতায় পরিচিহ্নিত হয়েছে। স্কটের রোমান্সে মধ্যযুগীয় নরম্যান-স্যাক্সন সংঘাতের পটভূমিকা। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপ পটভূমিকা

গ্রহণ করেছেন। 'কপালকুণ্ডলা'তে দ্বিতীয়ার্ধে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আকবর বাদশাহ, সেলিম, মেহেরুন্নিসা প্রভৃতি কাহিনীর অপ্রধান অংশেই কেবল রোমান্সের সুদূরতা ও বৈচিত্র্য আনয়ন করেননি ; sub-plot-এর প্রধান চরিত্র বা principal plot-এর প্রতিনায়িকার আবির্ভাব, তিরোধান, পুনরাবির্ভাব, ছদ্মবেশ, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির অনন্যসাধারণ চমৎকারিত্ব উপন্যাসকে রোমান্সধর্মী করেছে। সে-উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয়ের বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে কপালকুণ্ডলার বিবাহোত্তর জীবনে পূর্বজীবনের প্রভাব থাকে কি না দেখাতে যাচ্ছিলেন, সেখানে তিনি হৃদয়ক্ষেত্র হ'তে আবার সরে গিয়ে নারীর ছদ্মবেশ, ষড়যন্ত্র, কাপালিকের পুনরাবির্ভাব প্রভৃতি দেখিয়ে সংসার-মধ্যবর্তী জীবনধারা ও রোমান্সের ধারাকে এক ক'রে দিয়েছেন। আর এই উভয় খণ্ডে 'কপালকুণ্ডলা'তে অনৈসর্গিক শক্তির অভাবনীয় ইঙ্গিত, প্রতিমা-পদপ্রান্তের বিল্বপত্রচ্যুতি, স্বপ্ন-সন্দর্শন ও নিবিড় নীল নীরদমালা-মধ্যবর্তী ভৈরবী মূর্তির অঙ্গুলি-সংকেত প্রভৃতি ঘটনা কাহিনীতে আর এক ধরণের রোমান্স-লোকের সুদূরতা আনয়ন করেছে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার ভাবে তাই বলেছেন, "কপালকুণ্ডলার রোমান্টিক আবেষ্টন-রচনায় বঙ্কিম অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ইতিহাস ও প্রেমকে যতদূর সম্ভব পশ্চাতে রাখিয়া রোমান্সের এমন একটি উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আমাদের বাস্তব জীবনের কঠিন মৃত্তিকা হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইতে পারে। আমাদের শান্ত, ধর্মাভিভূত জীবনের উপর যদি কখনও কল্পলোকের আলোকপাত সম্ভব হয় তবে তাহা প্রবল ধর্মোন্মাদের দিক্ হইতেই আসিতে পারে, যুদ্ধের উদ্দীপনা বা প্রেমের উচ্ছ্বাস হইতে নহে। এই জন্যই কপালকুণ্ডলার জীবনের উপর যে একটা অসাধারণত্ব আসিয়া পড়িয়াছে তাহা তান্ত্রিক প্রথার ভীষণতা ও সহজ ধর্মপ্রবণতা হইতে উদ্ভূত বলিয়া আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত একটা সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে।"...রোমান্স-লক্ষণ সত্ত্বেও তাই 'কপালকুণ্ডলা' সম্পূর্ণ রোমান্স নহে। তা একাধারে রোমান্স ও উপন্যাস। কারণ এই কাহিনীর রোমান্সলোকের উপাদানগুলি—ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—"বিজন সমুদ্রতীরের অতুলনীয় মহিমা, কাপালিকের নির্মম ধর্মসাধনা—কেবলমাত্র একটা বাহ্য বৈচিত্র্যের উপায়মাত্রে পর্যবসিত হয় নাই ; ইহারা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর একটি গভীর, অনপনেয় প্রভাব অঙ্কিত করিয়া অসাধারণ সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।"

॥ ২ ॥ 'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনী

সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনা। গঙ্গাসাগর হ'তে তীর্থস্নান ক'রে নবকুমার আর তাঁর সঙ্গীরা একটি নৌকায় দেশে ফিরছিলেন। মাঘ মাসের রাত্রি...চারিদিকে কুয়াশা। নাবিকেরা দিক্‌-নির্ণয় ক'রতে পারল না।

ভাসতে ভাসতে নৌকা একটি অচেনা উপকূলে এসে ঠেকল। তখন কুয়াশা ভেদ ক'রে মাথার উপর মধ্যদিনের সূর্য উঠেছে। উপকূল হ'তে কিছু কাঠ ও জ্বালানী সংগ্রহের পর সমুদ্রতীরে পাকাদি কাযশেষে আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কথা স্থির হ'ল। তখন ভাঁটা...জোয়ার এলেই নৌকা ছাড়তে হবে। নবকুমার সাহসী যুবক, কাষ্ঠাহরণে প্রবেশ করলেন জনবসতিহীন অরণ্য-সমাকীর্ণ প্রদেশে। কাষ্ঠাহরণে তাঁর বিলম্ব হ'ল...এদিকে জোয়ার এসে পড়ল বলে। নবকুমার আর ফেরেন না...ওদিকে নৌকা ছাড়ার সময় এসে গেছে। নবকুমারকে উপকূলে রেখে নৌকা চলে গেল ..আরোহীরা স্থির সিদ্ধান্ত করল নবকুমারকে বাঘে খেয়েছে। নবকুমার সেই বিজন বনভূমিতে পরিত্যক্ত হ'য়ে পড়ে রইলেন। অন্ধকার রাত্রে সেই বিজন ভূমিতে একটি আলোর রেখা দেখতে পেয়ে নবকুমার সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে দেখলেন এক কাপালিক। নবকুমারকে কাপালিক এক কুটীরে নিয়ে গেলেন। পরদিন অপরাহ্ণ পযন্ত কাপালিক আর দেখা দিলেন না। নবকুমার ফলান্বেষণে বেরিয়ে পড়লেন। সেই গোধূলি-শেষে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে অকস্মাৎ সেই দুর্গম বনমধ্যে এক ষোড়শী মূর্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। অপূর্বসুন্দরী আলুলায়িতকুন্তলা কপালকুণ্ডলা। কপালকুণ্ডলা তাঁকে কুটীরের কাছে নিয়ে এলেন। তারপর আর নবকুমার সুন্দরীকে দেখতে পেলেন না। বনের আড়ালে হারিয়ে গেছেন কপালকুণ্ডলা। নবকুমার কুটীরে চিন্তামগ্ন হ'য়ে রইলেন—একি সত্যই রমণী, না দৈবী মায়া! নবকুমার এইবার কাপালিকের সাক্ষাৎ পেলেন। কাপালিক আপনার সাধনকাযে বলির জন্য নবকুমারকে নিয়ে গেলেন। সৈকতে তাঁকে বন্ধন ক'রে প্রাক্কালিক পূজায় প্রবৃত্ত হ'লেন। কপালকুণ্ডলা কাপালিকের খড়্গের সাহায্যে নবকুমারের বন্ধন ছেদন ক'রে তাঁকে নিরাপদ স্থানের দিকে নিয়ে চললেন। অন্ধকার বনমধ্যে একটি মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের সেবক বা অধিকারী তাঁদের রাত্রে আশ্রয় দিলেন। তারপর অধিকারীর পরামর্শে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা পরদিন গোধূলিলগ্নে দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হ'লেন। পরদিন

প্রভাতে বন ছেড়ে নবকুমার মেদিনীপুরের দিকে চললেন—নববিবাহিত কপালকুণ্ডলার সঙ্গে। মেদিনীপুরে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার সঙ্গে এক প্রকৃতিচপলা মুসলমান রমণীর সাক্ষাৎ হ'ল। রমণী অপরূপ সুন্দরী, সপ্তবিংশতি বৎসরের, ভাদ্র মাসের ভরা নদী। এই মুসলমান রমণী নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী···নবকুমার চিন্‌তে পারলেন না বটে, কিন্তু নবকুমারকে দেখে মতিবিবির অন্তরালে যে পদ্মাবতী ছিল সে জেগে উঠল। মতিবিবি সেলিমের অনুগৃহীতা ছিলেন কিন্তু সেলিম এখন বাদশাহ হয়ে মেহেরুন্নিসাকে প্রধানা মহিষী করবেন। সুতরাং আগ্রার রাজপ্রাসাদে মতিবিবি তাঁর ভবিষ্যৎ স্বপ্নসৌধ গড়তে পারবেন না। নবকুমারকে দেখে নবকুমারের সঙ্গে মিলিত জীবনের জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন। নবকুমার তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। মতিবিবির ধারণা হ'ল কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তাঁর কার্যসিদ্ধি হবে। এদিকে কাপালিক বেরিয়েছেন কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের অন্বেষণে। তাঁর সাধনায় বাধা সৃষ্টি করেছেন কপালকুণ্ডলা। দেবী কাপালিককে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন কপালকুণ্ডলাকে বলি দেবার জন্য। ইতোমধ্যে কাপালিকের হাত দুর্ঘটনায় ভেঙে গিয়েছে। কপালকুণ্ডলাকে আবিষ্কার করেছেন তিনি···কিন্তু নিজে বলি দিতে পারবেন না···হাতে তাঁর শক্তি নেই। মতিবিবি ও কাপালিক মিলিত হ'লেন ষড়যন্ত্রে···উভয়েরই লক্ষ্য কপালকুণ্ডলার অনিষ্ট সাধন। তবে মতিবিবি নারী, তিনি কাপালিকের অভিপ্রায় অনুসারে কপালকুণ্ডলার মৃত্যুদণ্ড দিতে চান না। তাঁর ইচ্ছা তিনি কপালকুণ্ডলাকে বিদূরিত করবেন। ব্রাহ্মণ-বেশধারী মতিবিবির সঙ্গে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ হল। কপালকুণ্ডলা এখন নবকুমার-গৃহিণী হ'লেও আরণ্যমোহ তাঁর যায়নি···সংসার তাঁর কাছে অরণ্য। ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে তাঁর আলাপ ও ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবির নিকট হ'তে পূর্বে প্রাপ্ত কপালকুণ্ডলার একটি পত্র নবকুমারকে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহাকুল ক'রে তুলল। কাপালিক তাঁর সেই সন্দেহকে বাড়িয়ে তুলে আপন কার্যসিদ্ধির জন্য কপালকুণ্ডলাকে বলি দেবার ভার নবকুমারকে দিলেন। নবকুমার তখন ঈর্ষায় উন্মত্ত। নবকুমার গঙ্গাতীরে স্ত্রীবধের আয়োজন করলেন। বধের পূর্বে নবকুমার জানলেন তাঁর সন্দেহ অমূলক। তিনি কপালকুণ্ডলাকে আবার তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মনের মধ্যে নবকুমার ও তাঁর সংসারের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। তিনি আর সংসারে ফিরে যেতে চান না।

এমন সময় সৈকতভূমির তলদেশে চৈত্রবায়ুতাড়িত ভাগীরথীর জলধারা এসে আঘাত করল···যে স্থানে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা দাঁড়িয়ে ছিলেন সে স্থান জলের তলায় মিশে গেল। কপালকুণ্ডলার কোনও চিহ্ন দেখা গেল না।

নবকুমার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। আর উঠলেন না।

['কপালকুণ্ডলা'র প্রথম সংস্করণে কপালকুণ্ডলা 'তটভঙ্গে'র সঙ্গে সঙ্গে জলে তলিয়ে গেলে পর নবকুমার তাঁর অন্বেষণে জলে সাঁতার কাটতে কাটতে তলিয়ে গেলেন বটে কিন্তু তিনি কাপালিক কর্তৃক অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার প্রাপ্ত হন। চেতনা প্রাপ্ত হ'য়ে নবকুমার কেবল মৃন্ময়ি, মৃন্ময়ি ক'রতে থাকেন।···পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারকেও কপালকুণ্ডলাব সঙ্গে সলিল-সমাধি দিয়েছেন।]

॥ ৩ ॥ চরিত্র-বিশ্লেষণ

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কেন্দ্রমণি **কপালকুণ্ডলা চরিত্র**। এই ধরণের পরিচিত-অপরিচিত একটি নারী চরিত্র পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যে আছে কিনা জানি না। মাতা, কন্যা, বধূরূপে যাঁদের আমরা প্রাত্যহিক সংসারের উদয়াচলে জ্যোতির্ময়ী মূর্তিরূপে দেখি কপালকুণ্ডলা সেই নারী-সমাজেরই একজন অথচ তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নশ্রেণীর। পর্তুগীস জলদস্যুদিগেব দ্বারা অপহৃতা হবার পূর্বে কোন আঁধার ঘরের আলোরূপে অকলঙ্ক হাস্যমুখে শৈশবেব দিনগুলি তাঁর কেটেছে কিনা আমরা জানি না। আমরা জানি না শৈশব-যৌবনের সন্ধিলগ্নে, পৃথিবী যখন সকল কুমারীর কাছে আবও সবুজ, আরও সজীব মনে হয়, তখন কেমন ক'রে তাঁর দিনগুলি কাপালিকের নিষ্ঠুর ব্রতপালনে ও বিজন সমুদ্রতীরে প্রকৃতি-প্রেমমোহে আনমনে কেটেছে। দক্ষিণের কোনও বাতাস তাঁর চিত্তে কোনও দিন কোকিল-ডাকা-বসন্তের রঙ্গীন স্বপ্ন আনে নি। মনের মধ্যে কবে থেকে ভৈরবী-ভাবমোহ সংক্রামিত হয়েছে জানা যায় না। মানুষের বসতি হ'তে দূরে, নীল অরণ্য আর ভীম কাপালিক, উদাসী জীবন আর ভৈরবী-ভক্তি তারই মধ্যে তাঁর পিনদ্ধ-যৌবন উপেক্ষায় এসেছে, অবহেলায় আসন নিয়েছে তাঁর দেহে। কিন্তু মনের মধ্যে মীনকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়নি কোনও দিন। প্রেম-প্রীতির বন্ধন-ভরা স্বর্গ-তুচ্ছ-করা মাটির পৃথিবী হ'তে বিদায় নিয়ে তাঁর নির্জন জীবন ধর্মবিশ্বাস আর আরণ্যসংস্কারে ভরে উঠেছে। আর এই বিশ্বাস ও সংস্কার নির্বাধ

বিবাহ এই মাঘ মাসে গোধূলি লগ্নে হয়েছে। মাঘ মাসে গোধূলি লগ্নে বিবাহ একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সঙ্গে বিবাহের পর দেবীর চরণে যে বিল্বপত্র স্থাপন করেছিলেন তা চ্যুত হয়েছে। দেবী যেন তা' গ্রহণ করেন নি। এই ঘটনা একদিকে যেমন কপালকুণ্ডলার মনকে একটি গভীর আশঙ্কায় পরিপূর্ণ করে তুলেছে, অপরদিকে তেমনি ভাবী ঘটনার ইঙ্গিতও দিয়েছেন—দৈবশক্তির অমোঘ প্রতিকূলতায় নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার দাম্পত্যজীবন যে ব্যর্থ হয়ে যাবে তা এখানে সুকৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্ত করেছেন। কপালকুণ্ডলার বিবাহোত্তর জীবনে এই বিল্বপত্রচ্যুতি যে একটা চাপা উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল তা শ্যামাসুন্দরীর নিকট কপালকুণ্ডলার উক্তি হতে জানা যায়।

কপালকুণ্ডলার **স্বপ্নদর্শন ঘটনা** সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। কাপালিককে দেখার পরের রাত্রেই কপালকুণ্ডলা এক ভীষণ স্বপ্ন দেখেছিলেন—যেন তিনি মহাতরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে নৌকারোহণে কোথায় চলেছেন। নাবিকেরা দিক্ নির্ণয় করতে পারে না। এমন সময় এক ভীষণমূর্তি পুরুষ এসে নৌকা ধারণ করে জলমগ্ন করতে উদ্যত হলেন। তখন সেই মহাবিপত্তিকালে এক ব্রাহ্মণবেশী এসে তাঁকে রক্ষা করবেন কিনা জানতে চাইলেন। অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল 'নিমগ্ন কর।' ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছেড়ে দিলেন, কপালকুণ্ডলা জলে নিক্ষিপ্ত হলেন। এই স্বপ্নদর্শন দু'দিক থেকে বিচার করা যায়। একদিকে কপালকুণ্ডলার মন, অপরদিকে কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ। একদিকে কপালকুণ্ডলার অন্তশ্চারী মনের বৈশিষ্ট্য, পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের অনুধ্যান ও মনের সংগোপন ইচ্ছা চমৎকার ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অপরদিকে কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ জীবনের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও রয়েছে। কপালকুণ্ডলার আবাল্যজীবন তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রতীরেই কেটেছে। আর নবকুমারের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের পূর্বমুহূর্তে নবকুমারের জীবনে যে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল সেই বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই তিনি জেনেছেন। নবকুমার তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং নাবিকেরা দিক্ নির্ণয় করতে পারে নি। তারই ফলে নবকুমার ও তিনি মিলিত হয়েছেন। কিন্তু মিলিত জীবন কপালকুণ্ডলার কাছে দুর্বহ বোঝা। তাই স্বপ্ন তাঁর জীবনে রূপক হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সংসাররূপ সমুদ্রে তাঁর জীবন-তরণী যেন পাতাল প্রবেশের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

বিবাহিত জীবনে তাঁর চিত্ত কেবল সমুদ্রতীরবর্তী অরণ্যে স্মৃতি-চারণ করেছে। হঠাৎ এক দুর্যোগের রাত্রে তিনি এক ব্রাহ্মণবেশী ও কাপালিককে পুনরায় দেখেছেন। সেই জটাজূটধারী ভীষণ কাপালিক তাঁর জীবনতরণীকে নিমগ্ন করতে চান, ব্রাহ্মণবেশধারী মতিবিবি কাপালিকের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার মৃত্যু বিষয়ে একমত হন নি। তিনি কপালকুণ্ডলার মৃত্যু চান না, চান নির্বাসন। এ সকল বৃত্তান্ত কপালকুণ্ডলা শ্যামার জন্য ওষধি আনতে গিয়ে দূর থেকে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই স্বপ্নে জটাজূটধারী এক ভীষণ মূর্তি ও ব্রাহ্মণবেশীকে তিনি অনুরূপ ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা আর পারেন না, সংসার তাঁর আর ভাল লাগে না। এই সংসারের অবরুদ্ধ জীবন হ'তে তিনি মুক্তি চান। তাই তাঁর অবচেতন মনের মুক্তির ইচ্ছাই নিমগ্ন করার প্রার্থনারূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। জীবনতরণী যে পাতালে প্রবেশ করবে কপালকুণ্ডলা এটি অনুমান করেছিলেন। স্বপ্ন বহু ক্ষেত্রেই আমাদের বিফল বাসনার সফলরূপ। আমাদের মনের অনেক চাওয়া, পাওয়ার রূপ ধরে স্বপ্নের মধ্যে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। কপালকুণ্ডলার জীবনব্যাপী মুক্তি-ইচ্ছা এই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। আবার এই স্বপ্ন কেবল অতীতচারী মনের নিরুদ্ধ বাসনার সফল প্রকাশই নয়। তা ভাবী ঘটনার ইঙ্গিতও বহন করে আনে। মনস্তত্ত্ববিদেরা স্বপ্নের এবম্বিধ ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে না করলেও পৃথিবীর অনেক অংশেই এ বিশ্বাস আছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই গভীর বিশ্বাসের ভূমি হ'তে ভাবী ঘটনার সুন্দর ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই স্বপ্ন যেমন একদিকে মনস্তত্ত্বসম্মত হয়েছে, অপরদিকে তেমনি অলৌকিক, সূক্ষ্ম, ব্যঞ্জনাধর্মীও হয়েছে। অতঃপর কপালকুণ্ডলা জাগ্রতস্বপ্নে নিবিড়-নীল-নীরদমালার মধ্যবর্তী ভৈরবীমূর্তি দর্শন করেছেন। উপন্যাসের মধ্যে এ ঘটনা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কপালকুণ্ডলার ধর্মবিশ্বাস ও চিত্তের বর্তমান অবস্থাতে এই ধরণের অলৌকিক বস্তু দর্শন খুবই স্বাভাবিক। সমগ্র জীবনব্যাপী ভবানীভাব-মোহ ও দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতাজনিত হতাশার সংমিশ্রণে গঠিত এই ভবানীমূর্তি তাঁকে মৃত্যুপথযাত্রার ইঙ্গিত করেছে। কাপালিকপালিতা কপালকুণ্ডলার চিত্তের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিক তত্ত্বের দিক হ'তে এই অতিপ্রাকৃত দর্শনের ব্যাখ্যা করা যায়।

'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থের অনবদ্য গঠনকৌশলের বিশেষ পরিচয় **পরিচ্ছেদের নামকরণ**। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতি পরিচ্ছেদের নাম এ-কারান্ত করেছেন। যেমন 'সাগর

সঙ্গমে', 'উপকূলে', 'বিজনে', 'স্তূপশিখরে', 'সমুদ্রতটে', 'কাপালিকসঙ্গে', 'অন্বেষণে', 'আশ্রয়ে', 'দেবনিকেতনে', 'রাজপথে', 'পান্থনিবাসে', 'সুন্দরীসন্দর্শনে', 'শিবিকা-রোহণে', 'অবরোধে' ইত্যাদি। এখানে পরিচ্ছেদের নামকরণে তাঁর একটি পূর্বপরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়।

'কপালকুণ্ডলা'র অনবদ্য **ভাষা গদ্যকবিতাধর্মী**। প্রথম খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদে এই কবিতাধর্মী গদ্যমাধুর্যের চমৎকার উদাহরণ আছে। যেমন—

"ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল
যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল ;—
বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইতে লাগিল ;
সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল।
সাগর বসনা পৃথিবী সুন্দরী ,
রমণী সুন্দরী ;
ধ্বনিও সুন্দর" ;

'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থের শেষ অংশে গদ্যের ভিতরকার ছন্দ প্রায় সমমাত্রিক পর্বে ফুটে উঠেছে। এই অংশটুকু দেখুন—

(সেই) অনন্তগঙ্গা/প্রবাহ মধ্যে/বসন্ত বায়ু/বিক্ষিপ্ত বীচি

কি চরিত্রচিত্রণে, কি পরিকল্পনায়, কি ভাষায়, কি, চিত্তবিশ্লেষণে 'কপালকুণ্ডলা' বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মৃণালিনী

॥ ১ ॥ ঐতিহাসিকত্বের বিচার

বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় অবলম্বনে দেশাত্মবোধের জ্বলন্ত আদর্শ প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' উপন্যাস রচনা করেন। 'কপালকুণ্ডলা' রচনার তিন বৎসর বাদে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে মোগল-পাঠানের সংঘর্ষের বর্ণনা করেছিলেন তাতে তাঁর দেশাত্মবোধের আভাস লক্ষ্য করা গেলেও সেখানে জগৎসিংহের বীরত্ব অবলম্বনে হিন্দুর শৌর্যবীর্যের কাহিনী দেখা দেয় নি। 'দুর্গেশনন্দিনী' কাহিনীর পটভূমিকা রচনা করেছে মুসলমানের আত্মঘাতী কলহ—মোগলের সঙ্গে পাঠানের সংগ্রাম। জগৎসিংহ এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে মোগল সৈন্যের সেনাপতি হয়ে এসেছেন মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ও মুসলমানের সংঘর্ষে হিন্দুর জয় ও হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাকে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছেন 'রাজসিংহ' উপন্যাসে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে সে সুযোগ বা পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। 'কপালকুণ্ডলা' একটি পরীক্ষামূলক উপন্যাস। একটি চমৎকার মনস্তত্ত্বমূলক রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে অগ্রসর হয়েছিলেন, 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিমচন্দ্র দেশাত্মবোধের পরিচয় দিতে চান নি।

বাঙ্গালীর পরাধীনতা ও মুসলমানের নিকট হিন্দু রাজার পরাজয়ের সম্ভাব্য কারণ বিষয়ে তিনি দীর্ঘদিন যে-সকল চিন্তা করেছিলেন সেই চিন্তার ফল 'মৃণালিনী' উপন্যাস। উপন্যাস হিসাবে 'মৃণালিনী'কে 'কপালকুণ্ডলা' অপেক্ষা কোনও অংশেই শ্রেষ্ঠ বলা চলে না। তবু যে-বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে আমাদের 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম' উপহার দেবেন, সেই দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুটা পরিচয় 'মৃণালিনী'র মধ্যে পাওয়া যায়। সপ্তদশ অশ্বারোহী যে বঙ্গদেশ জয় করেছিলেন একথা মিনহাজুদ্দিন জোর গলায় বললেও অনেক ঐতিহাসিক মানতে প্রস্তুত হননি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই বিষয়ে মিনহাজুদ্দিন-বর্ণিত সপ্তদশ অশ্বারোহীর আগমন ও লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের একটি কল্পনাভিত্তিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। মিনহাজুদ্দিনের storyকে আমরা history বলে মেনেছি। বঙ্কিমচন্দ্র সেই history অবলম্বনে his

story দিয়েছেন। যাঁরা সাহিত্যের সমালোচনা করেন তাঁদের অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনগড়া ইতিহাসকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় নিয়ে ঐতিহাসিক কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা কতখানি ঐতিহাসিক জানা যায় না। কিন্তু ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—"সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে একটা প্রবাদ মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে, তাহার পশ্চাতে বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্ধ কুসংস্কার উভয়েরই অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়; এবং বঙ্কিম পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতা ও বৃদ্ধ গৌড়-রাজের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের বর্ণনাদ্বারা এই বিরাট বিপর্যয়ের একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও প্রকৃত ইতিহাসজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার অকুণ্ঠিত প্রশংসা ক'রে ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও বলেছেন—"সপ্তদশ অশ্বারোহী যত শক্তিমানই হউক না কেন তাহাদের দ্বারা একটা দেশ জয় ও অধিকার সম্ভবে না। আজকাল নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে এবং টেলিগ্রাম, রেল, এরোপ্লেন প্রভৃতির জন্য সংবাদপ্রদান ও যাতায়াত খুব সহজ হইয়াছে। এখন সতের জন লোক কোন একটা অসমসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিলে তাহাদের সাহায্যার্থে সতের হাজার সৈন্য সমবেত করিতে খুব বেশী সময় লাগে না। কিন্তু হাজার বৎসর পূর্বে সেই সম্ভাবনা ছিল না। বক্তিয়ার খিলজি, আলেকজাণ্ডার-হানিবল-নেপোলিয়নের সমান ক্ষমতাশালী হইলেও মাত্র ষোল জন অনুচর লইয়া এই প্রকাণ্ড প্রদেশ অধিকার করিবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র এই অভিযানের বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন বক্তিয়ার খিলজি অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন; যে ষোল জন অনুচর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা অনন্যসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ('মৃণালিনী' চতুর্থ খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। ইহাদের সাহায্যে বক্তিয়ার গৌড় রাজপুরী অধিকার করিয়াছিলেন এবং ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশ পাঠানের অধীনে আসিয়াছিল। কিন্তু সপ্তদশ অশ্বারোহীর এই বিজয় অভিযান সম্ভব হইয়াছিল দুইটি কারণে। ইহাদের পশ্চাতে পঁচিশ হাজার পাঠান সৈন্য মহাবনে অপেক্ষা করিতেছিল; তাহাদের বলে ইহারা এই অসমসাহসিক কার্যে অগ্রসর হইয়াছিল; আর পশুপতি ইহাদের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিয়াছিলেন। পশুপতির পক্ষেও যে এইরূপ কাজ সম্পূর্ণ সম্ভব হইয়াছিল তাহার কারণ তখন

গৌড়রাজ অসমর্থ ; দেশ শাস্ত্রতাড়িত অতএব হীনবল। সপ্তদশ অশ্বারোহীর আবির্ভাব গৌড়বিজয়ের একটা অংশ সন্দেহ নাই এবং বোধহয় ইহাই সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ অধ্যায় ; কিন্তু ইহাকেই সম্পূর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইলে মানুষের সাধারণ বুদ্ধিও আপত্তি তুলিবে। 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে অস্বীকার করেন নাই ; বরং ইহার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করিয়া ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় ইতিহাসের মর্যাদা কতটা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বিচার করা কঠিন ; কিন্তু ইহা যে অতি উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক কল্পনার পরিচয় দেয় তাহা অস্বীকাব করিবার উপায় নাই ; বোধহয় মিন্‌হাজুদ্দিনও অস্বীকার করিতেন না।"

॥ ২ ॥ 'মৃণালিনী' ঃ কাহিনী

মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্র তাঁর গোপনে বিবাহিত পত্নী মৃণালিনীকে পাবার জন্য মথুরায় বাস ক'রছেন। হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্য। বক্তিয়ার খিলজি রাজপুত্রের অনুপস্থিতির সুযোগে মগধ জয় করে বাংলাদেশ জয় করতে চলেছেন। হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্য হেমচন্দ্রের সহায়তায় যবননিপাত ও ভারতভূমিকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করাব জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। মাধবাচার্য হেমচন্দ্রের ব্যক্তিগত সুখ অপেক্ষা জাতিগত কর্তব্য বড় বলে মনে করেন এবং আশা করেন যে হেমচন্দ্র গৌড়ের সৈন্যের সহায়তায় বক্তিয়ার খিলজিকে পরাজিত ক'রে মুসলমানকে বিতাড়িত ক'রে আপন রাজ্য মগধ পুনরুদ্ধার করবেন। এই প্রকার জাতীয় কর্তব্যের কাছে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রণয় অল্প গুরুত্বপূর্ণ। মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে গৌড়ে বক্তিয়ার খিলজির পরাজয়ের জন্য সৈন্য সংগ্রহার্থে প্রেরণ করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধির পূর্বে হেমচন্দ্র আপন প্রণয়িনীর সন্ধান করবেন না। পাছে হেমচন্দ্র প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজনৈতিক কার্যে উদাসীন হন তাই মাধবাচার্য মৃণালিনীকে রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে হৃষীকেশ নামে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে প্রেরণ করলেন। হৃষীকেশের পুত্র ব্যোমকেশ মৃণালিনীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আপন হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইল্। কিন্তু মৃণালিনীর প্রত্যাখ্যানে ক্রুদ্ধ হ'য়ে আক্রোশ বশে তাঁকে কুলটা অপবাদ দিয়ে গৃহ থেকে বিতাড়িত করায় মাধবাচার্য এই অপবাদকে সত্য বলে মনে করেন। এদিকে বিতাড়িতা মৃণালিনী হেমচন্দ্রের

সঙ্গে মিলিত হবার আশায় গিরিজায়া নামে এক ভিখারিণীর সাহায্যে হেমচন্দ্রের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

গৌড়ের সিংহাসনে তখন বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন। অমাত্য পশুপতি বৃদ্ধ রাজার নামে নিজে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করেন।. হেমচন্দ্র পশুপতির সঙ্গে মিলিত হলেন এবং বক্তিয়ার খিলজিকে বিদূরিত করার জন্য গৌড়ের সৈন্যের সাহায্যে অগ্রসর হলেন। কিন্তু পশুপতি বিশ্বাসঘাতক—লক্ষ্মণ সেনের হাত হ'তে তিনি নিজে শাসনভার গ্রহণ করতে চান ; তিনি বক্তিয়ার খিলজির সহায়তায় লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় ঘটিয়ে মুসলমান প্রসাদপুষ্ট পরবর্তী গৌড়রাজ হ'তে চান। পশুপতির বিশ্বাস-ঘাতকতার কারণ কেবলমাত্র সিংহাসন ছিল না—পশুপতি বাল-বিধবারূপে পরিচিতা মনোরমার প্রণয়ী। তিনি জানতেন না যৌবনে তিনি এই মনোরমাকে বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের রাত্রেই মনোরমার পিতা কন্যাকে নিয়ে দূরদেশে চলে গিয়েছিলেন। কারণ জ্যোতিষী গণনা করে বলেছিলেন যে কন্যা অল্পবয়সে বিধবা হবে এবং স্বামীর সহমরণে যাবে। এই গণনা ব্যর্থ করার জন্য মনোরমার পিতা কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে আসেন এবং জনার্দন শর্মার কাছে মনোরমার সকল রহস্য প্রকাশ ক'রে পরলোকগমন করেন। মনোরমা তখন খুব ছোট। জনার্দন শর্মাও মনোরমাকে বিধবা পরিচয়ে নিজের কাছে রেখেছেন এবং পশুপতিও জানেন না যে সেই অনেকদিন আগেকার বধূই এখন জনার্দন শর্মার আশ্রয়ে বালবিধবা মনোরমা নামে পরিচিত। একদিন হঠাৎ জনার্দন শর্মা ও তাঁর পত্নীর কথোপকথনে মনোরমা আপন জীবনবৃত্তান্ত জানতে পারেন। জানতে পারেন যে তাঁর প্রণয়ী পশুপতি তাঁর স্বামী। পশুপতি সিংহাসনে আরোহণ ক'রে মনোরমাকে বিবাহ করতে চান ; কিন্তু গৌড়ের রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় মনোরমা বিশেষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এদিকে হেমচন্দ্র পশুপতির সাহায্যের জন্য যে গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন সেখানে জনার্দন শর্মা মনোরমাকে নিয়ে থাকেন। হেমচন্দ্র ও মনোরমার মধ্যে ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্পর্ক স্থাপিত হল। গিরিজায়া মৃণালিনী কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে রাজপুত্র হেমচন্দ্রের সন্ধানে এসে মনোরমা ও হেমচন্দ্রকে খুব নিকটস্থ অবস্থায় আলাপনিরত দেখে গেল। মৃণালিনীর প্রতি হেমচন্দ্রের অনুরাগ বিস্মৃত হয়েছে অর্থ ক'রে সে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ফিরে গেল। এদিকে হেমচন্দ্রের নিকট মৃণালিনীর অসতীত্বের মিথ্যা সংবাদ এল। পরে মৃণালিনীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলে তিনি মৃণালিনীকে গ্রহণ করলেন না, কুলটা বলে দূরে সরিয়ে দিলেন। ওদিকে পশুপতির

ষড়যন্ত্রে সম্পূর্ণ অরক্ষিত পুরীর মধ্যে বক্তিয়ার খিলজি পরিচালিত সপ্তদশ অশ্বারোহী গৌড় জয় করে নিল। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করলেন। বিশ্বাসঘাতক পশুপতি চতুরতায় বক্তিয়াব খিলজির নিকট পরাজিত ও বন্দী হলেন। কোন ক্রমে বন্ধনমুক্ত হয়ে যখন তিনি আপন গৃহে ফিরে এলেন তখন চতুর্দিকে যবন সৈন্য কর্তৃক হত্যাব তাণ্ডবলীলা চলেছে। পশুপতির গৃহে আগুন লেগেছে। সেই অগ্নিব লেলিহান শিখাব মধ্যে অষ্টভুজাব মূর্তির সঙ্গে পশুপতির জীবন্ত সমাধি হল। সেই হত্যাবিভীষিকাপূর্ণ নগরে হেমচন্দ্র একাকী দুর্বল নিরীহ প্রজাবৃন্দের সেবাকার্যে অগ্রসব হলেন। অগণ্য যবনসৈন্যেব সঙ্গে যুদ্ধ না করে তিনি অত্যাচাবিতেব সেবাকাযে আত্মনিযোগ ক'রলেন। এই অত্যাচারিতদেব মধ্যে ছিল ব্যোমকেশ। সে মৃত্যুশয্যায মৃণালিনীর সতীত্ব সম্পর্কে হেমচন্দ্রের নিকট অকপটে সত্য স্বীকাব করল। পশুপতিব সঙ্গে মনোবমা সহমবণে গেলেন। মৃত্যুব পূর্বে তিনি পশুপতিব প্রচুব অর্থ হেমচন্দ্রকে দান কবে গেলেন। সেই অর্থ সাহায্যে হেমচন্দ্র নূতন রাজ্য স্থাপন করে মৃণালিনীর সঙ্গে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

॥ ৩ ॥ 'মৃণালিনী' ঃ বিশ্লেষণ

'মৃণালিনী'ব কাহিনীতে দেশপ্রেম ও ঐতিহাসিক সত্যের সংমিশ্রণ থাকলেও এই কাহিনী বিন্যাসে অতিশয় দুর্বল। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রেব যে লেখনী ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'কপালকুণ্ডলা' উপহাব দিয়েছিল সেই লেখনী কিভাবে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'মৃণালিনী'র মত এমন হাস্যোদ্দীপক অসার্থক উপন্যাস তিন বৎসর বাদে উপহার দিতে পারে তা বিস্ময়ের বিষয়। বস্তুতঃ কি বিষয়বস্তুর বিন্যাসে, কি চরিত্রচিত্রণে, কি সাঙ্কেতিকতায়, কি রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে, ভাষার সুপ্রয়োগে 'কপালকুণ্ডলা' যে পরিণত প্রতিভার পরিচয় বহন করে তা 'মৃণালিনী'র মধ্যে বিস্ময়জনকভাবে অনুপস্থিত। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা 'কপালকুণ্ডলা'য় যে বিদ্যুৎদীপ্তির পরিচয় দিয়েছিল তার পরে তাঁর চিত্ত কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তাই 'মৃণালিনী' অজস্র দোষযুক্ত রচনা। তবু এই 'মৃণালিনী'র মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অজস্র দোষত্রুটি সত্ত্বেও

এমন কতকগুলি জিনিস আমরা পাই যা তাঁর পরবর্তীকালে বিকশিত চিন্তাধারার পূর্ব পরিচায়ক।

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র যবন হস্তে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের যে-চিত্র অঙ্কিত করেছেন তার মধ্যে তাঁর চিত্তের ক্রমবর্ধমান দেশাত্মবোধের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়।

(খ) জ্যোতির্বিদ্যক গণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস 'দুর্গেশনন্দিনী' হতে দেখা যায়। 'কপালকুণ্ডলা'য় তা বিশেষ প্রকাশিত হয়নি বটে কিন্তু 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ', 'সীতারাম'-এ তা বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। 'মৃণালিনী'তে এই জ্যোতিষ-বিশ্বাসের একটি বিশেষ রূপ লক্ষ্য করা যায়।

(গ) বঙ্কিমচন্দ্র নায়ক চরিত্রচিত্রণে বাহিরের দ্বন্দ্ব হতে অন্তরের দ্বন্দ্বের দিকে যে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিলেন তার পরিচয় আমরা হেমচন্দ্রের কয়েকটি অগত চিন্তা প্রকাশক দৃশ্যের মধ্যে পাই। 'দুর্গেশনন্দিনী'র জগৎসিংহ হৃদয়ের দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে আমাদের সামনে তত স্পষ্ট হয়ে ওঠেন নি যত স্পষ্ট হয়েছেন হেমচন্দ্র।

(ঘ) মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সতর্ক পদক্ষেপ 'কপালকুণ্ডলা'য়। যে নারী মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়; যে নারী সমুদ্র-তীরের নিভৃত নির্জনে আপন ধর্মসংস্কার এবং যৌনচেতনাহীন ভবানীভাব-মোহ মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি সংসারের প্রেমের ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা ও বেদনার বোঝা নিয়ে গঙ্গাগর্ভে চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে যাবেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা চিত্তবিশ্লেষণ করে চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন। অরণ্যের সমস্ত রহস্য যেন তাঁর অবেণীসংবদ্ধ কেশকলাপের মধ্য দিয়ে তাঁর মস্তিষ্কের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। কপালকুণ্ডলা একটি experiment। 'মৃণালিনী' গ্রন্থে মনোরমা আর একটি পরীক্ষা। বস্তুতঃ কোন কোন মানুষের দ্বৈত সত্তা যে অদ্ভুতভাবে পরস্পরবিরোধী রূপে আত্মপ্রকাশ করে তা ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইডের দ্বারা চমৎকার ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। একই মানুষের মধ্যে মানব ও দানব সহ-অবস্থিতি করে এবং অনুকূল পরিবেশের মধ্যে মানুষের একটি সত্তা যে অপরের উপর প্রাধান্য লাভ করে তা সেখানে সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

এই উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র মনোরমার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা একটি

প্রহেলিকার মত আমাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করে এবং সম্পূর্ণ মনোযোগ দাবী করে। তার বয়স তার আচরণ তার উক্তি সমস্ত কিছুর মধ্যে একটি নারীর দ্বিধাভিন্ন চিত্তের রহস্যজনক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সে সধবা কি বিধবা, সে বালিকা কি যুবতী, সে অনুরক্তা কি বিরক্তা, সে পশুপতির প্রেরণা না বাধা, তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। পশুপতির সুপুরুষ দেহে, পঁয়ত্রিশ বছরের পরিণত মনের অভ্যন্তরে, সিংহাসন অধিকারের যে নীচ চিন্তা এবং মনোরমার সঙ্গে বিবাহের অশাস্ত্রীয় ইচ্ছা ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল সেই বিষয়ে মনোরমার অভিব্যক্ত সম্মতি না থাকলেও মনোরমার চতুর্দিকে যে রহস্য ও মাধুর্যের মায়াজাল বিস্তীর্ণ ছিল তারই মধ্যে পশুপতির হীনতা প্রকাশের প্রেরণা রয়েছে। প্রাত্যহিকতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে নারী আমাদের জীবনে রস ও রহস্যের উৎসরূপে প্রতিভাত হয় নারীর সেই অদ্ভুত রূপ মনোরমার মধ্যে পশুপতি দেখতে পেয়েছিলেন বলে ডক্টর সেনগুপ্ত মনে করেন। কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-বর্ণিত যে নারী 'Phantom of Delight'-এর মত আবির্ভূত হয়ে রোমান্টিক পুরুষের মনকে "haunt, startle and waylay" করে, সেই পুরুষ-বিভ্রম-উৎপাদনকারিণী সাধারণ মানবী কিন্তু মনোরমা নন। পুরুষ নারীর চতুর্দিকে illusion সৃষ্টি করে। সেই illusion-এর মোহমন্ত্রেই নারী পুরুষের কাছে চিরকালের রহস্যের সামগ্রী হয়ে দেখা দেয়। সেখানে পুরুষের প্রেমিক চোখ নারীর মধ্যে রহস্যের অলৌকিকত্ব খুঁজে পায়। কিন্তু মনোরমা এখানে কেবল পশুপতির অন্তর্লোকবাসিনী মায়াবনবিহারিণী নন। ভ্রাতৃপ্রতিম হেমচন্দ্রের নিকটেও তিনি আপন দ্বৈত সত্তায় উদ্ভাসিত, সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত। তাঁর চিত্তের বৈশিষ্ট্য তাঁর নিজের নিকটও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে। তাই নিজেকে তিনি উন্মাদিনী বলে উল্লেখ করে থাকেন। একদিকে বালিকার সৌকুমার্য, অপরদিকে বর্ষীয়সী রমণীর জ্ঞানগম্ভীরতা ও পরিপক্কবুদ্ধি তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় মনোরমার চরিত্র সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমের প্রতিভা কপালকুণ্ডলায় নারী-চরিত্র সম্বন্ধে এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মনোরমা সম্বন্ধে মনস্তত্ত্বের আর একটি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এখানেই বঙ্কিম-প্রতিভার ক্রমবিকাশের একটি সূত্র পাওয়া যায়।

(ঙ) 'কপালকুণ্ডলা'য় যেমন অসংখ্য আচরণের সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে 'মৃণালিনী'তে এই ধরণের ব্যঞ্জনাধর্মী বর্ণনার প্রাচুর্য না থাকলেও এমন

কতকগুলি বর্ণনার উল্লেখ করা যেতে পারে যে-গুলি এই প্রসংগে স্মরণযোগ্য। ব্যঞ্জনাধর্মী বর্ণনা ও সংলাপ 'দুর্গেশনন্দিনী' হ'তে লক্ষ্য করা যায়, যেমন 'দুর্গেশনন্দিনী'তে—

রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "একি আয়েষা? তুমি কাঁদিতেছ?"

আয়েষা কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে গোলাপ ফুলটি ছিন্ন করিলেন।

'কপালকুণ্ডলা'য় আমরা এ ধরণের দৃশ্য অনেক দেখে থাকি ; যেমন :—

"দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?"

নবকুমার বলিলেন, "নবকুমার শর্মা।"

প্রদীপ নিভিয়া গেল।

অন্যত্র 'প্রেতভূমে' দৃশ্যে—

> নবকুমার কহিলেন, "ভয় নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, "কাঁদিবে কেন?"

আবার সেই কণ্ঠ!

এই ধরণের চিত্র 'মৃণালিনী'র মধ্যেও পাওয়া পায়। যেমন :—

মনোরমা কহিলেন, "পশুপতি, কাঁদিতেছ কেন?"

পশুপতি চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন, "তোমার কথায়।"

মনোরমা। "কেন, আমি কি বলিয়াছি?"

পশুপতি। "তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।"

দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা যেমন জগৎসিংহের প্রশ্নের উত্তরে আপন করধৃত গোলাপের পাপড়ি ছিন্ন ক'রে অধোবদনে লজ্জিত কোমল অন্তরের গুপ্ত প্রেমদীর্ণ ব্যথিত অন্তস্তলটিকে তুলে ধরেছিলেন ঠিক সেই ভাবে গিরিজায়া আপন অধীর হৃদয়ের রাগ ও বিরক্তিকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করেছে 'মৃণালিনী'তে—

> গিরিজায়া আরও রাগ করিলেন। বহুযত্নরচিত পর্ণশয্যা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। কহিল, "পাষণ্ড বলিব না?—একবার বলিব?" (বলিয়াই কতকগুলি শয্যাবিন্যাসের পল্লব সদর্পে জলে ফেলিয়া দিল। "একবার বলিব?—দশবার বলিব" (আবার পল্লব নিক্ষেপ)—"শতবার বলিব" (পল্লব নিক্ষেপ)—"হাজার বার বলিব।" এইরূপে সকল পল্লব জলে গেল।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে পেষমন্ যেমন মতিবিবিকে জিজ্ঞাসা করেছিল এবং মতিবিবি উত্তর দিয়েছিলেন সেইভাবে রত্নময়ীর প্রশ্নের উত্তরে মৃণালিনী উত্তর দিয়েছেন।

'কপালকুণ্ডলা'তে—বিরলে আসিলে পেষমন মতিবিবিকে জিজ্ঞাসা করিল।

"বিবিজান! এ ব্যক্তি কে?"

যবনবালা উত্তর করিলেন, "মেরা শৌহর।"

'মৃণালিনী'তে—

তখন রত্নময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরাণি, উনি তোমার কে?"

মৃণালিনী কহিলেন, "দেবতা জানেন।"

সত্যই হেমচন্দ্র মৃণালিনীর কে, এ প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া যায় না। মৃণালিনী এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তা সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

(চ) সংলাপে সংস্কৃত, ওড়িয়া, হিন্দী, ইংরাজী, ফার্সী ব্যবহার করতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেক জায়গায় দেখেছি। 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে তিলোত্তমার স্বপ্নদর্শন প্রসঙ্গে "অহং ব্রাহ্মণঃ" এইটুকু সংস্কৃত আছে। 'কপালকুণ্ডলা'য় প্রথমাংশে কাপালিক "মামনুসর" "ভৈরবীপ্রেরিতোহসি" ইত্যাদি বলেছেন এবং গ্রন্থ-সমাপ্তির পূর্বে নবকুমারও সংস্কৃতে "পানীয়ং দেহি মে" বলে সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। 'মৃণালিনী'র মধ্যে পশুপতি এবং যবনদূত সংস্কৃতে কথাবার্তা বলেছেন। যবনদূতের সংলাপের মধ্যে ফারসীর সংমিশ্রণ খুব বেশী পরিমাণে ছিল। 'কপালকুণ্ডলা'তে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত ছাড়া হিন্দী ও ফারসী ব্যবহার করেছেন মতিবিবি ও পেষমনের উক্তি প্রসঙ্গে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে হিন্দী ফারসী ব্যবহৃত, 'সীতারাম' উপন্যাসেও তাই। 'চন্দ্রশেখর', 'ইন্দিরা' প্রভৃতিতে ইংরাজীর সংমিশ্রণ ঘটেছে সংলাপের মধ্যে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'সীতারাম'-এ ওড়িয়ার ব্যবহার করেছেন হাস্যরস সৃষ্টির জন্য। সংলাপ ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বহু ভাষার ব্যবহার 'আনন্দমঠ' গ্রন্থেও দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী'র মধ্যে কয়েকটি সংস্কৃত কাব্যাদর্শে অনুপ্রাণিত হিন্দী (?) গান উপহার দিয়েছেন।

(ছ) বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত পরবর্তী একাধিক উপন্যাসে—'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) ও পরিবর্ধিত 'ইন্দিরা'য়*

* পরিবর্ধিত 'ইন্দিরা'য় বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "যাহারা বলে বিধবার বিবাহ দাও, ধেড়ে মেয়ে

প্রকাশিত। বিধবাবিবাহ বিষয়ে বঙ্কিমের মন যে চিন্তানিরত তার পূর্বপরিচয় 'মৃণালিনী'তে পাওয়া যায়।

'মৃণালিনী'তে পশুপতি বলেন, "এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব। কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে?"

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে মনোরমাকে বিধবার ছদ্মবেশে উপস্থাপিত করেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ বিধবা করেন নি। মনোরমা ও পশুপতির মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রশ্ন ওঠে না কেননা তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। সে প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ'-এর মধ্যে তুলেছেন এবং তাঁর বিচারবুদ্ধি অনুসারে একটি মীমাংসা করেছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থে বালবিধবা রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের ঠিক বিবাহ হয় নি। বিধবাবিবাহের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের যে একটি স্বতন্ত্র মত দানা বেঁধে উঠেছে তার পূর্বাভাস আমরা মৃণালিনীর মধ্যে পেয়ে থাকি।

(জ) 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দ যখন স্বর্ণমুখার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে দেবেন্দ্রবাবু বৈষ্ণবী সেজে প্রেমের দৌত্য করতে গিয়েছিলেন। সেখানে কুন্দনন্দিনীর কলঙ্ক-রটনা ঘটে এবং কুন্দ হীরার বাড়ীতেই আশ্রয় নেয়। হীরার বাড়ীতে এক আয়ি থাকত। অনুরূপ ঘটনা না হলেও মৃণালিনী যে হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে সন্ধান নিয়ে গিয়েছিল গিরিজায়া বৈষ্ণবীরূপে হেমচন্দ্রের প্রেমের দূতী হয়ে। পরে মৃণালিনীর নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটায় গিরিজায়ার বাড়ীতে আশ্রয় লন। সেখানে থাকে "এক বুড়ী মাত্র। তাহাকে আয়ি বলে।"

(ঝ) 'কপালকুণ্ডলা'র পরবর্তী কালে রচিত 'মৃণালিনী'র মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা'র কিছু কিছু প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যেমন মনোরমার বর্ণনা, "শ্বেতবসনা অবেণীসম্বদ্ধ-কুন্তলা" আমাদের কপালকুণ্ডলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'মৃণালিনী'র প্রথম দৃশ্যে 'গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে ক্ষুদ্র তরণীতে দুইজন নাবিক তন্মধ্যে একজন নবীন' আমাদের 'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম দৃশ্যে সাগর সঙ্গমে নবকুমারের কথা স্মরণে আনে।

(ঞ) 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যের মধ্যে স্বরবর্ণের অনুপ্রাস ঘটিয়েছেন। যেমন—

নহিলে বিবাহ দিও না, মেয়েকে পুরুষ মানুষের মত নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত কর, তাহারা পতিভক্তিতত্ত্ব বুঝিবে কি?" এই অংশ ইন্দিরা প্রথম সংস্করণে (১৮৭৩) ছিল না।

"অনেকে আহ্বান প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ কাযে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিলেন।" —দুর্গেশনন্দিনী

বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা'য় এই ধরণের অনুপ্রাসযুক্ত গদ্য ব্যবহার করেন নি। 'মৃণালিনীতে'ও অনুপ্রাসযুক্ত গদ্য দেখা যায় না। 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে ভাষাগত অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল, তা 'কপালকুণ্ডলা' এবং 'মৃণালিনীতে দেখা যায় না। 'কপালকুণ্ডলা'র সংস্কৃত শব্দাড়ম্বর যে বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বর্জন করবেন তার পূর্বাভাস 'মৃণালিনী'র মধ্যে পাওয়া যায়। 'মৃণালিনী'তে সংস্কৃত শব্দাড়ম্বরের প্রকাশ সংযত, যেমন—

"তদ্ধেতু"; "যবনাগমনকালে", "মধ্যাহ্নমরীচি-বিশোষিত স্থলপদ্মবৎ আরক্ত"; "গর্ভাগ্নিগিরিশিখর তুল্য"; "নবীন শবদুদয়"; "অকাল জলদোদয-বিমর্ষিত গগনমণ্ডলবৎ", "রজনী চন্দ্রিকশালিনী, আকাশ নির্মল, বিস্তৃত, নক্ষত্রখচিত, ক্বচিৎ স্তবপবম্পরাবিন্যস্ত শ্বেতাম্বুদমালায বিভূষিত। বাতায়ন পথে অদূরবর্তিনী ভাগীরথীও দেখা যাইতেছিল। ভাগীরথী বিশালোরসা বহুদূরবিসর্পিণী, চন্দ্রকর প্রতিঘাতে উজ্জ্বল তরঙ্গিণী, দূর প্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগম-প্রহ্লাদিনী।" প্রভৃতি···

এইরূপ কয়েকটি ক্ষেত্রে সংযত ভাষাড়ম্বর ব্যতীত অন্যত্র এই ধরণের গুরুগম্ভীর সংস্কৃত-ঘেঁসা বাংলার নমুনা বিশেষ পাওয়া যায় না। গদ্য রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারানুসরণ হ'তে মুক্তির সন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী কতদূর অগ্রসর হয়েছিল তার পরিচয় 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'ইন্দিরা'র মধ্যে পাওয়া যায়। এখানে তার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়।

(ট) 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নায়িকা, প্রতিনায়িকা ও একটি প্রধান নারী চরিত্রের নাম পুষ্পের নাম। সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী ও কমলের কথা আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী'র পূর্ববর্তী উপন্যাসদ্বয়ে কোন নারীচরিত্রকে পুষ্পের নাম দিয়ে উপস্থাপিত করেন নি। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে নায়িকা মৃণালিনী। সেখানে মৃণালিনী শব্দের অর্থ যে পদ্ম এবং হেমচন্দ্র যে জীবনসূর্য, তার অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে। যেমন—

কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণালে অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে॥

হেমচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে গিরিজায়া মৃণালিনীর সম্বন্ধে বলেছেন যে, তিনি বিরহিণী

অবস্থায় কেবল অশ্রুসলিলে ভাসছেন। "বর্ষাকালে পদ্মের মত—মুখখানি কেবল জলে ভাসিতেছে।" মৃণালিনী ও হেমচন্দ্র যে পদ্মিনী ও সূর্য সদৃশ তা নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয় হতে স্পষ্ট হবে।

"মৃণালিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল—প্রাতঃসূর্যকরস্পর্শে যেন পদ্ম ফুটিয়া উঠিল।" অন্যত্র—

"মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায় হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল।"

বঙ্কিম চন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের পূর্বে 'মৃণালিনী'তে প্রথমবার নায়িকাকে পুষ্পের নামে পরিচিহ্নিত ও পুষ্পের প্রকৃতিতে বিশিষ্ট করেছেন। পরবর্তীকালে সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী নামকরণ আরও গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাসের মধ্যে যেমন পরবর্তী উপন্যাসের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায় তেমনি পূর্ববর্তী উপন্যাসেরও ছায়া লক্ষ্য করা যায়। হেমচন্দ্রের নিকট মনোরমার প্রথম আবির্ভাব নবকুমারের নিকট কপালকুণ্ডলার প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনীয়। তবে 'কপালকুণ্ডলা' অপেক্ষা 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মৃণালিনী'র মধ্যে সাদৃশ্য অনেক বেশী। জগৎসিংহ যেমন তিলোত্তমার চরিত্রে মিথ্যা সন্দেহ করেছিলেন এবং কতলু খাঁর স্বীকারোক্তিতে তিলোত্তমার সম্বন্ধে সন্দেহ-মুক্ত হন এক্ষেত্রেও হেমচন্দ্র সেইরূপ করেছেন এবং ব্যোমকেশ মৃত্যুকালে মৃণালিনী-চরিত্র সম্বন্ধে দোষস্খালন করে হেমচন্দ্রকে সন্দেহমুক্ত করেছে। মৃণালিনীর মাধবাচার্য ও 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিরাম স্বামী উভয়েই জ্যোতিষী এবং উভয়েই আপন আপন গণনার দ্বারা শিষ্যকে ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। অভিরাম-স্বামী ভুল গণনায় বীরেন্দ্রসিংহকে মোগলের পক্ষাবলম্বনে প্ররোচিত ক'রে তাঁর সর্বনাশ ঘটিয়েছেন। এখানে মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে বক্তিয়ার খিলজির বিরুদ্ধে গৌড় হতে দাঁড় করিয়ে যে যুদ্ধ জয়ের আশা দেখিয়েছিলেন তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে মতিবিবি এবং নবকুমারের মধ্যে দাম্পত্য প্রেম পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্বামীস্ত্রীর অপরিচয়, ষড়যন্ত্র ও হত্যার বিভীষিকা এসেছে। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে পশুপতি মনোরমার দাম্পত্য সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর অপরিচয়, রাজ্যজয়ের ষড়যন্ত্র, যবনের দ্বারা হত্যার তাণ্ডবলীলা প্রেমের কাহিনীতে বিভীষিকা এনেছে। 'কপালকুণ্ডলা'র পরবর্তী 'মৃণালিনী'র গল্প ও চরিত্র পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ম্লানরূপে দেখা দিয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা'র সঙ্গে মৃণালিনীর কোন তুলনা করা চলে না। কারণ 'কপালকুণ্ডলা' শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের

কেন বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, আর 'মৃণালিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের একটি নিকৃষ্ট রচনা। 'দুর্গেশনন্দিনী'র সঙ্গে তুলনা করলেও 'মৃণালিনী'র কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণ অনেক দুর্বল বলে মনে হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনীতে Unity of Impression ব্যাহত হয় নি। গড়মান্দারণের পথে নিদাঘতপ্তদিবসে যে রাজপুত্র চলেছিলেন তিনি তিলোত্তমার কোমল হৃদয়ের অনভিব্যক্ত প্রেম ও আয়েষার উচ্চকণ্ঠে অভিব্যক্ত প্রেম লাভ করেছিলেন আপন বীর্যে, ধৈর্যে ও চরিত্রমাহাত্ম্যে। হেমচন্দ্র অপেক্ষা জগৎসিংহ অনেক শ্রদ্ধা এবং সম্মানের পাত্র।

॥ ৪ ॥ পরিকল্পনাগত ত্রুটি

'মৃণালিনী' উপন্যাসের কাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে—হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর কাহিনী, পশুপতি ও মনোরমার কাহিনী। একটি কাহিনীর সহিত অপর কাহিনীর কোন যোগসূত্র নেই, কেবল আকস্মিক ভাবে একই ঘটনা-স্থল (গৌড়) এবং একই ঘটনা-কাল (যবনবিজয়ের কাল) উভয় কাহিনীর মধ্যে একটি সাধারণ পটভূমিকা রচনা করেছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে জগৎসিংহ, তিলোত্তমা ও আয়েষার কাহিনী প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। নায়ক-নায়িকা ও প্রতিনায়িকার কাহিনী অপেক্ষা আর কোন ঘটনা অধিক জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। এখানে হেমচন্দ্র-মৃণালিনী অপেক্ষা পশুপতি-মনোরমার কাহিনী অনেক জীবন্ত, অনেক আবেগস্পন্দিত ও আবর্তসঙ্কুল।

নায়ক হিসাবে **হেমচন্দ্র** জগৎ সিংহের মত ধীরললিত নন। তিনি অধীর এবং উদ্ধত। তিনি প্রথম পরিচ্ছেদেই গুরু মাধবাচার্যকে স্বহস্তে বধ করার জন্য চঞ্চল। ভিখারিণী গিরিজায়া তাঁর দৌত্য কার্যে সফল হয়ে ফিরে এলে তিনি অধৈর্যবশতঃ গিরিজায়ার কেশাকর্ষণ করেন। নায়িকা মৃণালিনীর চরিত্রে সন্দিগ্ধ হয়ে তিনি অনেক সময় শূল ব্যবহারের কথা চিন্তা করেন। এবং নায়িকা মৃণালিনী যখন আপন সতীত্বের কাহিনী নিবেদন করার জন্য হেমচন্দ্রের পদপ্রান্তে নিপতিত তখন তিনি কাহিনী শেষের পূর্বেই লম্ফ দিয়ে স্থান ত্যাগ করেন। কোন সময়েই মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্রকে যবনের প্রতিশোধ স্পৃহায় চঞ্চল দেখতে পাওয়া যায় না। যখন তিনি যবনের পশ্চাদ্ধাবন করেন তখনও বালসুলভ চপলতা ব্যতীত আর কোন প্রকার শৌর্যবীর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। পশুপতির আশ্রয়ে গৌড়ে থাকাকালে তিনি যবন বিনাশের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু কোন দিন আচরণে বা চিন্তায় তাঁকে এ বিষয়ে বিব্রত হতে দেখা যায় না। তিনি হয় মনোরমার

সঙ্গে সতীত্ব নারীত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, নয় মৃণালিনীর সন্ধানে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। যে শৌর্য, বীর্য, ক্ষাত্রশক্তি, অনমনীয় দৃঢ়তা বাংলা দেশ হতে যবন বিতাড়নের জন্য প্রয়োজন ছিল তার বিন্দুমাত্র আভাসও আমরা হেমচন্দ্রের মধ্যে পাই না।

এই প্রসঙ্গে আমরা মগধের আর এক রাজ্যচ্যুত রাজপুত্র ও তাঁর মন্ত্রণাদাতা কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণের কথা স্মরণ করতে পারি। চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য যে বীর্য ও কূটবুদ্ধির অধিকারী, যে অমিত ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রাহ্মণের অনমনীয় দৃঢ়তা উভয়কে একতাসূত্রে গ্রথিত করেছিল তার ক্ষীণতম আভাসও মাধবাচার্য এবং হেমচন্দ্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। পরাধীনতার বেদনা এবং যবনপরাজয়ের দৃঢ় সঙ্কল্প মাধবাচার্যের মধ্যে যেমন ভাবে বিকশিত হয়েছে তার শতাংশের একাংশও হেমচন্দ্রের মধ্যে দেখা যায় না। হেমচন্দ্রের বীরত্ব শুধু নারীর কেশাকর্ষণ ক্ষেত্রে, নারীকে পদাঘাত ক্ষেত্রে। তাই গিরিজায়া ঠিকই বলেছে—

> "বীরপুরুষ বটে! এইরকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে! মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরীব ভিখারীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।"

গিরিজায়া ঠিকই বলেছে, "তুমি মৃণালিনীকে বিবাহ করিবে? মৃণালিনী দূরে থাক, তুমি আমারও যোগ্য নও।" সত্যই 'মৃণালিনী' উপন্যাসে ভিখারিণী গিরিজায়ার যে আত্মসুখবিহীন পরসেবানিষ্ঠা, দেশ-দেশান্তর ভ্রমণে যে ভয়হীনতা, মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের দৌত্য কার্যে পুনঃ পুনঃ অপমান সত্ত্বেও যে নিরভিমান ঐকান্তিকতা, যে বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যই বিস্ময়কর।

বঙ্কিমচন্দ্রের **গিরিজায়া** চরিত্র একটি উজ্জ্বল ও অস্বাভাবিক চরিত্র। মনে রাখতে হবে গিরিজায়া ভিখারিণী। তার শিক্ষা দীক্ষা বিদ্যা জ্ঞান বা ভাষার উপর অধিকার এমন কিছু হওয়া স্বাভাবিক নয় যা সাধারণের কোঠায় পড়ে না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গিরিজায়া যে বিদুষী, শ্রুতিধর, কাব্যকুশল ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে অসাধারণ তার প্রমাণ অনেক জায়গায় আছে। গিরিজায়া যথেষ্ট বিদুষী। সে প্রসঙ্গের সঙ্গে খাপ খাইয়ে হিন্দী গান রচনা করে। সে ব্রজবুলি ভাষায় বিশেষ দক্ষ এবং মৃণালিনী কর্তৃক গীত একটি দীর্ঘ কবিতা "কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে"— একবার শুনেই শিখে ফেলে। যখন বাংলায় কবিতা রচনার সুযোগ আসে তখনই সে মুখে মুখে সুন্দর কবিতা রচনা ক'রে বলে—

"মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয় রে॥
মেঘেতে বিজলী হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে॥"

তার ভাষা-ব্যবহারও যথেষ্ট বৈদগ্ধ্যপূর্ণ। নমুনা স্বরূপ নীচের অংশ উদ্ধৃত হল।

হেমচন্দ্র মৃণালিনী সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন—"সে পরগৃহে কি ভাবে আছে?"

গিরি—"এই অশোকফুলেব স্তবকেব মত। আপনার গৌরবে আপনি নম্র।"

অন্যত্র ব্যোমকেশ যখন মৃণালিনীর পদাঘাত খেয়ে প্রত্যুত্তরে বলেছে—"সুন্দরী! তুমি আমার দ্রৌপদী—আমি তোমার জয়দ্রথ।"

পশ্চাৎ হতে গিরিজায়া বলেছে, "আব আমি তোমার অর্জুন।"

গিরিজায়ার যে মহাভারত ভাল করে পড়া ছিল এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে সে মতিবিবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে ব'লে আমাদের মনে হয়। অন্যত্র মৃণালিনী যখন গিরিজায়াকে প্রশ্ন করেছেন—"তুমি কি ব্রাহ্মণকে দংশন কবিযাছিলে?"

তার উত্তরে গিরিজায়া বলেছে—

"তা ক্ষতি কি? বামুন বৈ ত গরু নয়?"

গিরিজায়াকে যথেষ্ট বিদুষী করে তোলায় তার মধ্যে একদিকে যেমন মাধুর্য সংক্রামিত হয়েছে অপরদিকে তেমনি তার মধ্যে অস্বাভাবিকত্বও সন্নিবেশিত হয়েছে। ভিক্ষা যার উপজীবিকা, শিক্ষা যার জীবনে আসেনি সে কোন অলৌকিক মন্ত্রে মৃণালিনীর জন্য সঙ্গিনী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল তা বোঝা যায় না। এবং কেমন করে সে গান রচনা করেছে, অর্জুন-দ্রৌপদী-জয়দ্রথ বিষয়ে প্রসঙ্গগঠিত বাক্যবিন্যাস করেছে, অপূর্ব উপমামণ্ডিত করে বর্ষাস্নাত পদ্মিনীর সঙ্গে বিরহসলিলসিক্ত মৃণালিনীর মুখের তুলনা করেছে তাও বলা যায় না।

গিরিজায়ার চরিত্র যেমন অস্বাভাবিক তেমনি গিরিজায়ার হিন্দীও। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কেবল চরিত্র-চিত্রণে অমনোযোগ প্রদর্শন করেন নি কবিতায় ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধেও যথেষ্ট উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তৃতীয় খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে গিরিজায়ার গানে "ব্রজ কি কিশোর সই", কি ধরণের হিন্দী

বোঝা যায় না। প্রথমতঃ হিন্দীতে "কি" বানান "কী"। এবং এই "কী" স্ত্রী লিঙ্গের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে 'ব্রজের কিশোর' শব্দের মধ্যে 'কিশোর' শব্দ নিশ্চয়ই স্ত্রীলিঙ্গ নহে। "রূপ কি ভিখারী" যে কি ধরণের হিন্দী তা বোঝা যায় না। প্রথমতঃ ঐ "কি" বানান। তারপর "রূপ কি ভিখারী" শব্দের প্রয়োগ। ('রাজসিংহ' গ্রন্থের ভিতরও এই ধরণের ভাষাগত ভুলের নিদর্শন আছে, যেমন—"বিহারত রাহ তুমারি"। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকের সম্পাদনা সত্ত্বেও শব্দটি "বিহারত"ই আছে, এটি যে "নিহারত" হবে তা বালকেও বোঝে। এই অংশটি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ"-এর "পশ্যতি তব পন্থানম্" অংশের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। এই অংশে ভাষার ভুল ও ছাপার ভুলের মণিকাঞ্চন সংযোগে সম্পাদকীয় অমনোযোগের ঘটকালী ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র আগ্রা অঞ্চলের তসবীরওয়ালীর মুখে, "মেয় নে কিয়া বোলী থী…শুননে কা মাফিক্ বাত নেহিন্ বাপজান" প্রভৃতি শব্দ সন্নিবেশ করেছেন 'রাজসিংহ' গ্রন্থে। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দী সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। নির্মলকুমারী যেখানে বলেন, "মেয় নে হজরত ইমলি বেগম। তস্লিম দে" সেখানে হিন্দী ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই।) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট উদাসীনতা ও অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন এই গ্রন্থে। ব্যাকরণের সহজতম নিয়মেও তিনি আপনাকে নিয়মিত করেন নি। "সে" ও "তিনি" বঙ্কিমচন্দ্র একই পরিচ্ছেদে ঔদাসীন্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, যেমন—

(ক) "মনোরমা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন…মনোরমা তখন কহিলেন না… মনোরমা তখন হেমচন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া পালঙ্কোপরি লইয়া গেল…রুধির সকল ধৌত করিল…বস্ত্রদ্বারা বাঁধিল… তখন কহিল"—ইত্যাদি (৩২)

(খ) "গিরিজায়া উপবন গৃহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। যেখানে-যেখানে বাতায়নপথ মুক্ত দেখিলেন, সেইখানে সাবধানে মুখ উন্নত করিয়া গৃহমধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন।…গিরিজায়া আপনার সহিত মনে মনে কথোপকথন আরম্ভ করিল…গিরিজায়া গাত্রোত্থান করিল…গিরিজায়া অঙ্গুলিতে গণিতে লাগিল।" (৩৩)

'সে' ও 'তিনি'র যুগপৎ ব্যবহার একই অনুচ্ছেদগতও হয়েছে কোনও কোনও জায়গায়। যেমন—"এই ভাবিয়া গিরিজায়া ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় একটি গীত আরম্ভ করিয়া কহিলেন, 'ভিক্ষা দাও গো।'" (৩৩)

ব্যাকরণগত অন্যান্য ঔদাসীন্যও লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ—

"মনোরমা চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।" (৩।২)

"চিত্রার্পিত পুত্তলিকা" অর্থহীন। হয় 'চিত্রার্পিতের ন্যায়' নয় 'পুত্তলিকার ন্যায়' বললেই মনোরমার রূপটি যথাযথ ভাবে ফুটে উঠত। বঙ্কিমের জীবদ্দশায় প্রকাশিত দশম সংস্করণ হ'তে এই ভুলের উদাহরণগুলি তুলে দেওয়ায় মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটা অমনোযোগ ও শৈথিল্যের ভাব পোষণ করতেন।

অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনা পরিকল্পনাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' বহুবিধ দোষদুষ্ট। **মাধবাচার্য** আদর্শনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তিনি মৃণালিনীকে যে ভাবে বাড়ী থেকে ভুলিয়ে এনে অন্যত্র লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন তার মধ্যে আদর্শনিষ্ঠার অভাব লক্ষ্য করা যায়। মাধবাচার্যের ন্যায় চরিত্রের পক্ষে এই ধরণের আচরণ কতদূর চরিত্রানুগ তার সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। পরে মিথ্যা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মৃণালিনীর আশ্রয়দাতা যে ভাবে নিঃসহায় নারীকে রাত্রিবেলা বাড়ী থেকে বিতাড়িত করে দিলেন তা কোন ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্ভবপর কার্য কিনা বিচার্য বিষয়। মাধবাচার্য, যিনি মৃণালিনীকে ঘর থেকে ভুলিয়ে এনেছিলেন এবং যিনি হেমচন্দ্রের উদ্দেশে স্বগত উক্তিতে জানিয়েছিলেন, "মৃণালিনী পাখী আমি তোমারি জন্য পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখিয়াছি", তিনি নিরুদ্দিষ্টা মৃণালিনী সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করা একেবারেই প্রয়োজন বোধ করলেন না এবং হেমচন্দ্রের মত শিষ্যের প্রতি কর্তব্য ভুলে গেলেন। পিতৃগৃহ হ'তে মৃণালিনীকে অপহরণ করে আনার পর তার রক্ষণাবেক্ষণ ও ভালোমন্দর সমস্ত দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাই কেন তিনি নিরুদ্দিষ্টা বিষয়ে অবহেলা করলেন তা বুঝে উঠা যায় না।

গিরিজায়া ভিখারী বালিকা। তার পক্ষে মৃণালিনীর সঙ্গিনী হবার কোন বিশেষ প্রেরণা না থাকলেও তা নারীর স্বাভাবিক হিতৈষণা হিসাবে হয়ত গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ গিরিজায়ার পক্ষে কথায় কথায় গান রচনা করা এবং ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলা-প্রকাশক পদাবলীর সাহায্যে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে দৌত্য করা একেবারেই সম্ভব নয়। কারণ দ্বাদশ শতাব্দীতে, বক্তিয়ার খিলজির আক্রমণকালে, ব্রজবুলি ভাষায় কাব্যরচনার সূত্রপাত হয় নি। এমতাবস্থায় যখন আমরা গিরিজায়াকে ব্রজবুলিতে পদ রচনা করতে দেখি তখন বিস্মিত না হয়ে পারি না। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের কবিতা সেন

রাজাদের রাজত্বকালে প্রচলিত ছিল একথা মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু তখনও ব্রজবুলিতে বৈষ্ণব কবিতা রচনার সূত্রপাত হয় নি।

মৃণালিনী বৌদ্ধ কন্যা, কিন্তু তিনি হিন্দু রমণীর ন্যায় মণিমালিনীকে বলেন, "তোমার চুলে দেবতার ফুল আছে তাহা ছুঁয়ে শপথ কর।" অন্যত্র গিরিজায়াকে মৃণালিনী বলেন, "হেমচন্দ্রকে দেবতার ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। তিনি যাহা বলিলেন, তাহা পুরাণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।" বৌদ্ধমতাবলম্বী শ্রেষ্ঠীকন্যার পক্ষে ব্রাহ্মণকন্যার (মণিমালিনীর) নিকট দেবতার ফুল ছুঁয়ে শপথ করার আবেদন কিছুটা স্বাভাবিক হ'লেও বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীকন্যার পক্ষে হেমচন্দ্রকে "দেবতাব ন্যায় শ্রদ্ধা করা" এবং "হেমচন্দ্রের উক্তিকে পুরাণের ন্যায়" মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারটি নিতান্ত অস্বাভাবিক মনে হয়। কারণ হিন্দুকন্যার পক্ষে প্রেমিককে দেবতা জ্ঞান ও প্রেমিকের উক্তিকে পুরাণ জ্ঞান হয়ত সম্ভব, কিন্তু বৌদ্ধ কন্যার দেবতা এবং পুরাণ সম্বন্ধে এতাদৃশ শ্রদ্ধার কাবণ কি? মৃণালিনী চবিত্রের মধ্যে আমরা পিতৃগৃহের প্রতি কোন পিছুটান লক্ষ্য করি না। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করে আসেন নি। তাই যে স্নেহ, আদর ও ঐশ্বর্যের মধ্যে তিনি আজন্ম লালিত অপহৃত অবস্থায় সে সব ভুলে গিয়ে কেবল রাজপুত্রের জন্য অভিসাবে বেরুনো স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। রাজপুত্রের প্রতি অনুরাগ যতই তীব্র হোক পিতৃগৃহের প্রতি আকর্ষণহীনতা মৃণালিনীব পক্ষে, বিশেষ ক'রে অসহায় অবস্থায়, স্বাভাবিক মনে হয় না। মৃণালিনী যে ধর...র শান্তস্বভাব, সারাজীবন হেমচন্দ্র কর্তৃক উদ্ধত ও বর্বর আচরণেও তিনি যে ধরণের ক্ষমাসুন্দর প্রেমশান্ত ব্যবহার করেছেন, তাতে মনে হয় না যে আশ্রয়দাতাব সামান্য ভর্ৎসনাতে নিঃসহায় অবস্থায় রাত্রিবেলা নাবী হয়ে তিনি গৃহত্যাগ করতে পারেন। গিরিজায়ার ন্যায় এক অল্প-পরিচিত ভিখারিণীকে আশ্রয় ক'রে রূপ-চঞ্চল শত সহস্র পুরুষের লুব্ধ চিত্তের অনিবায অপমান-আশঙ্কাকে দূরীভূত ক'রে, নিঃস্ব এক ভিখারিণী বালিকার উপার্জন ক্ষমতার উপর নির্ভর ক'রে তিনি দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত অভিসারে কাটিয়ে দেবার যে সঙ্কল্প করলেন তাও মৃণালিনীর ন্যায় শান্ত নারীর পক্ষে স্বাভাবিক ও চরিত্রানুগ মনে হয় না। মৃণালিনী এবং মনোরমা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রেমিক (হেমচন্দ্র ও পশুপতি) বিবাহিত স্বামী। মৃণালিনী বৌদ্ধ রমণী হলেও মণিমালিনীর কাছে স্বামীর নাম করা সম্ভব কিনা চিন্তার বিষয়। তিনি মণিমালিনীকে বলেন, "হেমচন্দ্রকে না দেখিয়া কেন মরিব।"

মনোরমা হিন্দু রমণী, শুধু হিন্দু রমণী নন গুণবতী, সতীশিরোমণি। তিনি স্বামীর চিতায় আরোহণ ক'রে হাসতে হাসতে সহমরণে যান। এমন সতী হিন্দু রমণীর পক্ষে স্বামীকে বারে বারে "পশুপতি" বলে সম্বোধন করা কিভাবে সম্ভব তা বুঝে ওঠা যায় না।

কোন কোন স্থলে অর্থহীন শব্দ প্রয়োগও আছে যেমন, গিরিজায়ার গানে, "সা নিসা সমরি"। কোথাও **দৃশ্যপরিকল্পনায় অসম্ভব ও আজগুবি ঘটনার আতিশয্য** আছে। হেমচন্দ্র শিশুসুলভ বীরত্বের অভিমান নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একাকী মহাবনের দিকে যাত্রা করেছিলেন। বীর হেমচন্দ্রের জানা ছিল যে 'মহাবনে পঁচিশ হাজার যবন সৈন্য রহিয়াছে'। অথচ তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিশীথে যবন সৈন্য দেখতে গেলেন একাকী। হেমচন্দ্রের এই ধরণের কৌতূহল কোন শিশুর পক্ষে সম্ভব হ'লেও যুদ্ধে অভিজ্ঞ বীরের পক্ষে তা অস্বাভাবিক। নিঝুম রাত্রিতে একাকী হেমচন্দ্র অশ্বারোহণে যখন নগর-পারবর্তী প্রান্তরের মধ্য দিয়ে অন্ধকারে চলেছিলেন তখন তিনজন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হন। সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই তিনজন অশ্বারোহী যখন তাঁকে লক্ষ্য করে শর নিক্ষেপ করেন তখন "হেমচন্দ্র বিচিত্র শিক্ষাকৌশলে করস্থ শূলান্দোলন দ্বারা তীরত্রয়ের আঘাত এককালে নিবারণ করিলেন। অশ্বারোহীগণ পুনর্বার একেবারে শর সংযোগ করিল এবং তাহা নিবারিত হইতে না হইতেই পুনর্বার শরত্রয় ত্যাগ করিল। এইরূপে অবিরত হস্তে হেমচন্দ্রের উপব বাণক্ষেপ কবিতে লাগিল। হেমচন্দ্র তখন বিচিত্ররত্নাদিমণ্ডিত চর্ম হস্তে লইলেন এবং তৎসঞ্চালনে অবলীলাক্রমে সেই শরজাল বর্ষণ নিরাকরণ করিতে লাগিলেন।" নিক্ষিপ্ত তীর দিনের বেলাতেই স্পষ্ট দেখা যায় না। অন্ধকারেও হেমচন্দ্র সেই তীরের গতি স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারলেন, আর শুধু তাই না একসঙ্গে তিনটি তীরের লক্ষ্যই তিনি অনুধাবন ক'রে সেই দ্রুতবেগসম্পন্ন শরত্রয়কে নিবারিত করলেন হাতের শূলের দ্বারা। লাঠি ঘুরিয়ে যে ভাবে কাজ করা সম্ভব হেমচন্দ্র নিশ্চয়ই সেই ভারী শূলকে সেই ভাবে আন্দোলিত করেছিলেন···কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত তীর, তার গতি, তার লক্ষ্য সমস্ত কিছুকেই স্পষ্ট দেখে হেমচন্দ্র সেই ভারী শূল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিভাবে নিজেকে অক্ষত রাখলেন তা বুঝে ওঠা কঠিন। হেমচন্দ্রের যবন-বিনাশকালের বীরত্ব শুধু অসম্ভব নয় একেবারে আজগুবি। বক্তিয়ার খিলজি

কর্তৃক পুরী অধিকারের পর যখন নগরে যবন সৈনিকেরা শত সহস্রে বিভক্ত হয়ে লুণ্ঠন হত্যা অত্যাচার করছিল তখন একাকী হেমচন্দ্র "ভীষণ শূল হস্তে নির্ঝরিণী প্রেরিত জলবিন্দুবৎ সেই অসীম যবন সেনাসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন...যবনেরা দলবদ্ধ হইয়া হেমচন্দ্রকে নষ্ট করিবার কোন উদ্যোগ করিল না। যে কোন যবন তৎকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সহিত একা যুদ্ধোদ্যম করিল সে তৎক্ষণাৎ মরিল।"

হেমচন্দ্রের এবম্বিধ বীরত্ব নিশ্চয়ই উচ্চপ্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অসংখ্য শত্রুসৈন্য মধ্যে একাকী এভাবে যুদ্ধে জয়লাভ করা এবং একের পর এক শত্রু সৈন্যকে বিনষ্ট ক'রে অক্ষত দেহে সেখান থেকে সরে আসা একান্তভাবে অবিশ্বাস্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাস কি চরিত্র-চিত্রণ, কি ঘটনা-বিন্যাস, কি ভাষা-প্রয়োগ কোন দিক থেকেই 'কপালকুণ্ডলা'র পরবর্তী রচনা বলে মনে হয় না। মনে হয়, লেখক এখানে সাহিত্যক্ষেত্রে শিক্ষানবীশী করছেন। 'কপালকুণ্ডলা' দূরে থাক, 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যেও যে ধরণের কাহিনীগত আবেদন ছিল 'মৃণালিনী'র মধ্যে তা একান্ত ভাবে অনুপস্থিত। 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনী রোমান্টিক প্রেমের আশা-আশঙ্কাস্পন্দিত মিলনমূলক কাহিনী। সে মিলনের পাশে আয়েষার ব্যর্থতাজনিত বেদনা আমাদের মনকে অনির্বচনীয় করুণ রসের আনন্দে পরিপূর্ণ করে। 'মৃণালিনী'র ক্ষেত্রে কাহিনী দ্বিধাবিভক্ত—একদিকে হেমচন্দ্র-মৃণালিনী অন্যদিকে মনোরমা-পশুপতি অবলম্বনে সে কাহিনী বিকশিত। এখানে উভয় ক্ষেত্রেই দাম্পত্য প্রেম পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপার আছে মাত্র। মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের মধ্যে বিবাহিত নর-নারীর পরিণতিহীন প্রণয়ের দূর হতে কাছে আসার কাহিনী। মনোরমা-পশুপতির ক্ষেত্রে দাম্পত্য প্রেম অবৈধ প্রেমের ছদ্মবেশের অন্তরাল হতে আপন স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছে। মনোরমা ও পশুপতির প্রেম কিছুটা আবেগচঞ্চল। মনোরমার চরিত্ররহস্যের দ্বারা ঘনীভূত ও রাজনৈতিক ঘটনার দ্বারা আবর্তসঙ্কুল হলেও এই প্রেমকাহিনী উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য নয়। এ দুটি প্রেমকাহিনী 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনীর মত (মুগ্ধা তিলোত্তমা ও প্রগল্‌ভা আয়েষার ন্যায় চরিত্র অবলম্বনে) সুখ-পাঠ্যরূপে পরিবেশিত হয় নি। এখানে পশুপতি ও মনোরমার সহমরণ মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের মিলনকে তীব্র হাহাকারে অবলুপ্ত করে দিয়েছে। অপদার্থ রাজপুত্র নায়কের ব্যক্তিগত মিলনানন্দের চারিপাশে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত বাঙলাদেশের বেদনার্ত পরিবেশ এ মিলনকে কখনই সুখাবহ পরিণতি রূপে

আমাদের কাছে উপস্থাপিত করে নি। এক দিকে রাজনৈতিক হাহাকার ও অপর দিকে এক দৈববিড়ম্বিত দম্পতীর বিপর্যস্ত ভাগ্যের পাশে নায়ক-নায়িকার আনন্দ-উচ্ছ্বাস একটা হৃদয়হীন আত্মকেন্দ্রিক বিলাস মাত্র। এই শ্মশানভূমি-সদৃশ পরিবেশের মধ্যে নায়ক ও নায়িকা 'উভয়ের মুখ প্রতি চাহিয়া অনর্থক মধুর হাসি হাসিলেন—সে হাসির অর্থ "আমি এখন কত সুখী" !...আর সেই নগর মধ্যে যবন বিপ্লবের যে কোলাহল উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের বীচিরববৎ উঠিতেছিল আজ হৃদয় সাগরের তরংগরবে সে রব ডুবিয়া গেল।' বীর নায়কের কি অপূর্ব কর্তব্যজ্ঞান এখানে ফুটে উঠেছে! বস্তুতঃ হেমচন্দ্রকে গ্রন্থের নায়ক ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বচনায় পাত্রানৌচিত্য দোষের অনেক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিয়েছেন। ডক্টর সুবোধ-চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়, হেমচন্দ্র সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন, "তাঁহার চরিত্র নায়কের প্রতিকৃতি, না তাহার 'ভেঙ্গান' বুঝা যায় না।" হেমচন্দ্র চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অকারণ অধৈর্য, অভিমান, ক্রোধ ও প্রণয়োন্মত্ততা। হেমচন্দ্রেব বীরত্ব বালসুলভ। হেমচন্দ্রে চাতুয ও মাধুযের বালাই নেই। তিনি যে ভাবে শান্ত-শীল কর্তৃক বন্দী হয়েছিলেন, এবং যে ভাবে তিনি একা পঁচিশ হাজার যবন সৈনিকের আশ্রয়স্থল মহাবনের দিকে নিঃসহায় অবস্থায় যাত্রা করেছিলেন তাতেই তাঁর বুদ্ধির পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায। আর তাঁব মাধুয? যেভাবে তিনি গুরুহত্যায় উন্মত্ত হযেছিলেন, যেভাবে গিরিজায়ার সঙ্গে ব্যবহার কবেছেন এবং যেভাবে নায়িকা মৃণালিনীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন তাতেই তাঁর চরিত্রের মাধুর্য সম্যক পরিস্ফুট। বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের ভৃত্যের নাম দিগ্‌বিজয় রেখে ঠিকই করেছেন। কারণ হেমচন্দ্রের বীরত্ব যে ধরণের তাতে কাযক্ষেত্রে দিগ্‌বিজয়ের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এ অবস্থায় 'দিগ্বিজয়' নামক ভৃত্যের প্রভু হয়ে হেমচন্দ্র যে বীরত্ব প্রকাশ করেছেন তাতে সহজেই তিনি দিগ্বিজয়ী বীর হয়েছেন। এই দিগ্বিজয়ী বীরের চরম বীরত্ব 'বাপীতীরে'। নিস্তব্ধ নিশীথে 'হেমচন্দ্র তুরকের অন্বেষণে' 'অকাল জলদোদয়স্বরূপ ভীমমূর্তি' হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। রাজপথের কাছেই যে গ্রাম্য পথ ছিল সেখানে 'বাপীকূলে' তিনি শ্বেতবসনা মনোরমাকে দেখে 'প্রেত বিবেচনা করিয়া'......'সহসা চমকিত হইলেন'। তিনি অবশ্য নির্ভয়ে বাপীকূলে অবরোহণ করেছিলেন। কিন্তু এই অসীম সাহসী রাজপুত্রের ভূতযোনিতে বিশ্বাস অস্বাভাবিক না হলেও মনোরমাকে প্রেত বিবেচনায় চমকিত ভাব উল্লেখের কি প্রয়োজন ছিল? বস্তুতঃ **বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' একটি নিকৃষ্ট রচনা।**

'মৃণালিনী' উপন্যাস মধ্যে **মনোরমা** একটি বিস্ময়কর চরিত্র। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনি আয়েষা।" মনোরমা সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা যেতে পারে। মনোরমার চতুর্দিকে একটি বিস্ময়ের আবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর আচরণ, তাঁর অভ্যাস, তাঁর জীবনযাত্রা, বয়ঃক্রম সমস্ত কিছুর উপরেই একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার জাল বিস্তৃত রয়েছে। কপালকুণ্ডলা জনহীন সমুদ্রতীরে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় যে অসামাজিক ভাব-ভাবনার পরিমণ্ডল পরিবর্ধিত হয়েছিলেন তার সঙ্গে তাঁর সমগ্র আচরণের কাযকাবণ সম্বন্ধ অত্যন্ত স্পষ্ট। মনোরমার বয়স সম্বন্ধে আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হতে পারলেও তাঁর বয়স বিষয়ে "উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম" গ্রন্থে শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় যে সুন্দর আলোচনা করেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "বঙ্কিম যে সকল উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন তা হইতে মনোরমাব বয়স মোটামুটি অনুমান কবা চলে। পশুপতির যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি যুবক এবং হৈমবতী (মনোরমা) অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা। আখ্যায়িকা বর্ণিত ঘটনাকালে পশুপতির বয়স পঞ্চত্রিংশ বৎসর। যৌবনকাল ব্যাপক সময়। ইহা দ্বাবা বিংশ হইতে ত্রিংশ পযন্ত যে কোন বয়স বুঝাইতে পারে। কিন্তু আমাদিগকে স্মবণ রাখিতে হইবে যে, বিবাহকালে পশুপতি ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্র এবং পঞ্চত্রিংশবৎসব বয়সে তিনি গৌড়েব ধর্মাধিকার। তিনি যতই প্রতিভাশালী হউন না কেন, কপদকহীন ভাগ্যান্বেষীর পক্ষে সাত আট বৎসরের পূর্বে এরূপ সম্মান লাভ করা সম্ভব নহে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় এই সম্মান লাভ করিতে পশুপতির সাত হইতে দশ বৎসর লাগিয়া থাকিবে (এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে) তাহা হইলে বিবাহকালে বয়স দাঁড়ায় পঞ্চবিংশতি হইতে অষ্টাবিংশতির মধ্যে। এবং এই হিসাব অনুসারে উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাকালে মনোরমার বয়স দাঁড়ায় আনুমানিক পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশের মধ্যে। অর্থাৎ বয়সে মনোরমা বাল্য ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে এবং তাহার চরিত্রে এই উভয়কালের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। এই সময়ে বিবাহিতা নারীকে যুবতী এবং কুমারীকে বালিকা বলিয়া অভিহিত করা চলে।" মনোরমার বয়স এই ধরণেরই বোধ হয়। দেখতে পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনাকালে নায়ক নায়িকার বয়ঃক্রমের সঙ্গে আপনার বা স্ত্রীর বয়সের একটি যোগসূত্র রক্ষা করে এসেছেন। যেমন "দুর্গেশনন্দিনী"— বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স সাতাশ, জগৎ সিংহের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়া

পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবীর বয়স সতের। তিলোত্তমার বয়স অনুমানের দ্বারা রাজলক্ষ্মী দেবীর বয়সের কাছে আনা যায়। 'কপালকুণ্ডলা' রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স আটাশ, নবকুমারের বয়স তিরিশের নিকটবর্তী বলে মনে হয়। কেননা মতিবিবির বয়স সাতাশ বৎসর। 'মৃণালিনী' রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র একত্রিশ বৎসরের এবং গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট চরিত্র পশুপতি পঁয়ত্রিশ। 'মৃণালিনী' রচনা কালে পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবীর বয়স একুশের কাছাকাছি। যে বাঙলাদেশের নারী "কুড়িতেই বুড়ী" হয়, যে বাংলাদেশে দ্বাদশ বৎসরে বিবাহ হওয়ার পর রাজলক্ষ্মী দেবী দীর্ঘ দশ বৎসরের পর সংসারের কর্ত্রী, সেখানে তাঁর আচরণে একটি গাম্ভীয, একটি কর্ত্রীত্ব, একটি পরিপক্কতা বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন। অথচ কুড়ি একুশের নারীর মধ্যে যুবতী ও বালিকার সমন্বয় অলক্ষ্য নয়। এই বয়সেই নারীর আচরণ কৈশোরের সুরের রেশ ও পরিণত বয়সের পূর্বাভাস প্রকাশ করে। এই বয়সেই কিশোর চপলতার শেষ প্রতিধ্বনি তার আচরণে, এবং গাম্ভীয ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ স্থিরতা, পরবর্তী বয়োধর্মের পূর্বাভাস রূপে তার চরিত্রের মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র মনোরমার পরিকল্পনায় তাকে যৌবনমধ্যবর্তী এবং কুড়ির নিকটবর্তী বয়সের বলেই গ্রহণ করেছিলেন একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। পরবর্তী উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স পঁয়ত্রিশ—নগেন্দ্রনাথের বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। তখন রাজলক্ষ্মী দেবী পঁচিশের কাছাকাছি। সূর্যমুখীকেও তাঁর নিকটবর্ত্তী দেখা যায়। 'ইন্দিরা'য় বঙ্কিমের বয়স পঁয়ত্রিশ, উপেন্দ্র তিরিশ ইন্দিরা কুড়ি। 'চন্দ্রশেখর' রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র সাঁইত্রিশ; অর্থাৎ তিনি তিনের কোঠা হ'তে চারের কোঠার দিকে যাত্রী—এই গ্রন্থে চন্দ্রশেখর চল্লিশ ও প্রতাপ তিরিশ-বত্রিশ। 'রজনী' রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র উনচল্লিশ—অমরনাথ মধ্যবয়স্ক, অনুরূপ বয়োমধ্যগত। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স চুয়াল্লিশ—রাজসিংহের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। আমাব অনুমান বঙ্কিমচন্দ্র আপন উপলব্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে জীবনের নানা সঞ্চয়কে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। আপন পরিচিত নানা চরিত্র ও নানা ঘটনার মধ্য হতে তিনি কখনও কখনও সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে মনোরমাকে আমরা যৌবন-মধ্যগত অবস্থায়, বালিকা জীবনের মাধুর্যমণ্ডিত ও পরবর্তী বয়োধর্মের পূর্বাভাসে পরিচিহ্নিত দেখি। এ ছাড়া মনোরমার দ্বৈত সত্তা, নারীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয় তাঁরই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবনের বিচিত্র পরিবেশ

থেকেও তিনি ধীরে ধীরে এই ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছেন বলে মনে করা যেতে পারে। অল্প বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল বটে, কিন্তু সে বিবাহ তাঁর মনের মধ্যে কোন দিন শান্তি আনতে পারে নি। ছোট বয়সের সেই ভুলে যাওয়া কাহিনী তিনি পরবর্তী কালে শুনেছেন মাত্র। পূর্ববর্তী ঘটনার স্মৃতি তাঁর মনকে আবিষ্ট করে নি। বিবাহের রাত্রেই তাঁর ভবিষ্যৎ চিরবিরহের ব্রত নির্ধারিত। জ্যোতিষের গণনায় তাঁর বিবাহ বৈধব্য ও সহমরণের অমোঘ ইঙ্গিত এনেছিল। তাই মনোরমার পিতা কন্যার বিবাহ দিয়েই তাঁকে স্বামীর কাছ থেকে চিরকালের জন্য সরিয়ে রাখার জন্য দূরে নিয়ে গিয়েছিলেন। গুপ্ত রাখা হয়েছিল তাঁর কাছে তাঁর পরিচয়। পিতার মৃত্যুর পর একটি অনাথিনী বালিকার মত তিনি যখন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠছিলেন তখন তাঁকে বিধবার ভাবনায় বিভাবিত ক'রে রাখা হয়েছে; যে-বয়সে মানুষ পৃথিবীকে সুন্দর দেখে, ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে, সেই মুকুলিত জীবনের প্রথম অধ্যায়েই তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তিনি বিধবা। বালিকা চিত্তের মধ্যে যখন স্বপ্নসঞ্চয়ের কাল, মনে আর দেহে যখন রঙ ধরার সম্ভাবনা, তখন সমগ্র জীবনব্যাপী নিঃসঙ্গ একাকিত্বের ভবিতব্য তিনি শুনেছেন। এই বিক্ষুব্ধ জীবনে কোন সমবয়সীর সঙ্গে বয়সোচিত খেলাধূলোর মধ্যে তাঁর দিন কেটেছে কে জানে? যে পরিবারের মধ্যে তিনি থাকেন সেখানে এক বৃদ্ধ বধির ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর সাহচর্যেই তাঁর দিন কাটে। কোন ছোট ছেলে মেয়ের সঙ্গে খেলা করার সুযোগ সেখানে নেই। যে-পরিবেশ শিশুর মনের মধ্যেও বার্ধক্য আনে, যে-ভবিষ্যৎ সমস্ত জীবনকে হতাশায় পরিপূর্ণ করে, সেই পরিবেশ ও ভবিষ্যতের ভাবনা তাঁর চিত্তকে বোধহয় স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হতে দেয়নি। একদিকে বৈধব্যের অভ্যন্তর হতে অবৈধ প্রেমের পদধ্বনি তিনি চিত্তের মধ্যে শুনেছেন, আর একদিকে সংস্কার তাঁকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করেছে। একদিকে অপরূপ রূপবান পঞ্চত্রিংশ বৎসরের পশুপতির অকুণ্ঠিত প্রেম, দেশের বিশিষ্টতম পুরুষের সঙ্গে মিলিত জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, হৃদয়ের গভীর আগ্রহ, পিপাসিত প্রাণের কাছে প্রেমের সুধা। অপর দিকে পর পুরুষের প্রতি আকর্ষণের রূপ নিয়ে এই প্রেম তাঁর চিত্তে তীব্র ক্ষোভ এনেছে, এনেছে তীব্র অনুশোচনা। এক দরিদ্র পর-আশ্রয়-পালিতা বিধবা তার সঙ্গে শাসনযন্ত্রের প্রধানতম পরিচালকের মিলনের সামাজিক বা শাস্ত্রসম্মত সম্ভাবনা কোথায়? বিধবাবিবাহ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে অচিন্তনীয় ঘটনা। তাই সিন্ধুনিকটে তাঁকে কণ্ঠ শুকুতে

হয়েছে। যখন তাঁর চিত্ত পিপাসিত প্রেমসুধার তরে, যখন রূপবান যুবকের প্রণয়-নিবেদন তাঁর চিত্তে স্বাভাবিক ভাবেই বিভ্রম উৎপাদন করে, যখন এক বধির বৃদ্ধ এবং বধিরা বৃদ্ধা তাঁর সে প্রেমে বার্ধক্যবশতঃ বাধা দিতে পারে না; যখন পশুপতির আশ্রয়পুষ্ট অনুগ্রহলালিত এই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী পশুপতির সঙ্গে মনোরমার আলাপ-আলোচনায় সম্পূর্ণ উদাসীন, যখন উদ্দাম জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা, তখন বালবিধবার সংকোচ ত্রাস তাঁর সমস্ত আনন্দকে বিষাক্ত করেছে। তাঁর ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে তুলেছে বৈধব্য, তাঁর প্রেমকে কদয করে তুলেছে বৈধব্য। তাই নিজের চিত্তকে নিযন্ত্রিত করতে গিয়ে তিনি সংগ্রামে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। একদিকে দেহের মধ্য হতে যৌবনের আহ্বান, অপর দিকে চিত্তের মধ্য হতে চরম নিগ্রহ। এই দুয়ের টানা পোড়েনে তাঁর জীবন গঠিত হয়েছে। তারপরে যখন তিনি জেনেছেন যে পশুপতি কেবল তাঁর প্রেমিক নন পতি, তখন মিলনানন্দের সমস্ত সম্ভারনায় তাঁর মন আকুল হল বটে কিন্তু সেখানেও জ্যোতিষের ভবিষ্যৎবাণী তাঁর সমস্ত আনন্দকে ব্যথা-পাণ্ডুর ক'রে তুলেছে। বিধবা-জীবনে প্রেমে যেমন অনুশোচনা এসেছিল সধবারূপে তেমনি আতঙ্ক তিনি লাভ করেছেন। তিনি যখন আপনাকে মনে করতেন বিধবা, তখন পশুপতি শাস্ত্রমতে, ধর্মমতে, অপ্রাপ্য ছিলেন। যখন তিনি আপনাকে সধবা বলে জানলেন তখন শাস্ত্রমতে ও ধর্মমতে পশুপতি তাঁর প্রার্থনীয় হলেও জ্যোতিষমতে বর্জনীয়। একদিকে চলেছে তাঁর দেহ অপরদিকে চলেছে তাঁর মন—"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ"—এরই মধ্যে তাঁর দ্বৈতসত্তা-বিকাশের বিচিত্র উপাদান রয়েছে। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় মনোরমা চরিত্রের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। মনোরমার দুটি মূর্তি। তাঁর মতে মনোরমার সরলা মূর্তির কারণ বয়স ও অবস্থা বিশেষের সম্মেলন, আর একটি কারণ কার্যবিশেষে আত্যন্তিকী একাগ্রতা—এই একাগ্রতা চিন্তার। দুঃখিনী মনোরমার দিবারাত্র চিন্তার মধ্য দিয়ে সরলতা ও তেজ জেগে উঠেছে। এই চিন্তা যে কত রকমের তার অন্ত নেই। বালবিধবার চিন্তা, পরে পশুপতিকে স্বামী জেনে সধবার চিন্তা, জ্যোতির্বিদের ভবিষ্যৎগণনার চিন্তা। এইখানেই শেষ নয়, স্বামীর সঙ্গে মিলনের পরে স্বামীর বিশ্বাস লাভের চিন্তা। সমাজের অনাদর লজ্জা প্রভৃতি প্রেম সম্বন্ধীয় গভীর চিন্তার সমুদ্রে কেবল তিনি ভেসে চলেছেন। তাঁর পরিবেশ চিন্তার কারণ। তিনি বিস্তৃত রাজপুরীর এক কোণে অনাদরে, পরের আশ্রয়ে পরের

রক্ষণাবেক্ষণে নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে বেদনার্ত অবস্থায় দিন কাটান। আর রাত্রিবেলা নিঃশঙ্ক অবস্থায় অন্তরের জ্বালায় বাপীতে অবগাহন করেন। তাঁর অদ্ভুত সারল্য এবং অদ্ভুত বেদনা তাঁকে প্রকৃতিতে বালিকা, আকৃতিতে যুবতী এবং চিন্তায় বয়োবৃদ্ধা করে তুলেছে। সধবা মনোরমার পশুপতির প্রতি প্রেমও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'তে বাধা পেয়েছে। পূর্বে সে বাধা ছিল সংস্কার— বিধবার সংস্কার। কিন্তু যখন তিনি জেনেছেন যে তিনি পশুপতির স্ত্রী তখন মিলনে কেবল জ্যোতিষ গণনাই বাধা সৃষ্টি করেনি বিবেক-বোধও বাধা সৃষ্টি করেছে। পশুপতির অপরূপ রূপ ও অসীম ক্ষমতার অন্তরালে যে রাজ্যলোলুপ হীন মানুষটি যবনের সঙ্গে মিলিত হয়ে আপন প্রভুর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সেই মানুষটিকে পতিরূপে শ্রদ্ধার কুসুমাঞ্জলি দিয়ে পূজা করতে তিনি পারছিলেন না।

মনোরমার দ্বৈতসত্তা বিষয়ে আলোচনা ক'রে ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় বলেছেন, "মনোরমা সরলা বালিকা, মনোরমা তেজস্বিনী, প্রতিভাময়ী, মনোরমা উন্মাদিনী আবার গম্ভীর স্থিরবুদ্ধিসম্পন্না। অথচ মনোরমা চরিত্রে কোথাও বৈষম্য নাই, অসামঞ্জস্য নাই। মনোরমা সকল সময়েই মনোরমা; তাহার ভাবান্তরের মধ্যেও অসঙ্গতি নাই। তাহার চরিত্রের বিভিন্নতা ও বৈষম্যের মধ্যে সুসঙ্গতির সূত্র কোথায়? মনোরমা হইতেছে নারীর সেই মূর্তি যাহা পুরুষের চোখে প্রতিভাত হয়। পুরুষের কাছে নারী গৃহিণী, সচিব ও সখী, বৈচিত্র্যময়ী ও রহস্যময়ী। পুরুষ রমণীকে নানা অবস্থায় দেখে, নানা অবস্থার মধ্যে তাহাকে আপনার করিয়া পায়, তবু মনে হয় তাহার মধ্যে এমন একটি বৈচিত্র্য ও রহস্য আছে যাহা কিছুতেই সরল ও সহজ হয় না।"—(বঙ্কিমচন্দ্র : ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : পৃ. ৯৪-৯৫)। ডক্টর সেনগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' একটি চমৎকার গ্রন্থ হ'লেও আমরা মনোরমা বিষয়ে শ্রদ্ধেয় সমালোচকের সঙ্গে নানা কারণে একমত হ'তে পারি না। প্রথমতঃ পুরুষের চোখে নারীর যে মূর্তি রহস্যের উৎস, কল্পনার প্রেরণা, তার দর্শক রোমান্টিক প্রেমিক মন। মনোরমার প্রতি পশুপতির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনুরূপ ভাবকল্পনায় এই ধরণের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু মনোরমার এই মূর্তি পশুপতির 'পুরুষ-চোখের' ভাবকল্পনা কেবল নয়। হেমচন্দ্রের দৃষ্টিতেও মনোরমা রহস্যের উৎস। হেমচন্দ্রের চোখে মনোরমার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনও মায়া রং লেগেছিল মনে করার কারণ নেই। কারণ মনোরমা ও হেমচন্দ্র এত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন এত মারাত্মক নৈকট্য লাভ করেছেন, যে

হেমচন্দ্রের মধ্যে মনোরমার প্রতি পুরুষসুলভ সামান্যতম মায়ামোহ থাকলে তা উদ্দাম ভাবে আত্মপ্রকাশ করত। মনোরমা ও হেমচন্দ্রের আলাপমুখর কয়েকটি দৃশ্যের দিকে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি।

(ক) 'হেমচন্দ্রের উত্তরীয় ধরিয়া মনোরমা টানিল।'

(খ) মনোরমা রাত্রে স্নান ক'রে অন্ধকারে বাতাসে চুল শুকোবার জন্যে বাপীতীরের সোপানে শুয়ে ছিলেন। সেই অন্ধকার রাত্রে নির্জন বাপীতীরে যুবক হেমচন্দ্রের নিকট "আর্দ্রবসনে 'এই দেখ, চুল এখনও ভিজা রহিয়াছে।'—এই বলিয়া মনোরমা আর্দ্র কেশ হেমচন্দ্রের হস্তে স্পর্শ করাইলেন।" এরূপ অবস্থায়, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, উড়িয়া মালীকে উত্তপ্ত অবস্থায় ভদ্রক পর্যন্ত ছুটতে হয়, আর গোবিন্দলালকে কামনার পাঁকে ডুবতে হয়। হেমচন্দ্রের মধ্যে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই।

(গ) অন্য একটি দৃশ্যে "মনোরমা তখন হেমচন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া গৃহমধ্যে পালঙ্কোপরি লইয়া গেল।" অন্যত্র গিরিজায়া "এক কক্ষে হেমচন্দ্রকে শয়নাবস্থায় দেখিতে পাইলেন, দেখিলেন, তাঁহার শয্যোপরি মনোরমা বসিয়া আছে।"

(ঘ) অন্যত্র আমরা হেমচন্দ্র ও মনোরমাকে নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে নিরুত্তপ্ত আলোচনা-নিরত দেখি।

এই ধরণের শারীর সামীপ্য ও আন্তর নৈকট্য সত্ত্বেও হেমচন্দ্রের মধ্যে 'পুরুষ চোখ' কখনই ফুটে ওঠেনি। সুতরাং মনোরমার আকৃতি-প্রকৃতিগত রহস্যের পিছনে পুরুষের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করেছে মনে করা বোধ হয় সঙ্গত হবে না। সাধারণ নারীকে সাধারণ পুরুষের যে মোহমুগ্ধ চক্ষু রহস্যের রামধনু রঙয়ে রঞ্জিত দেখে সেই ভাব এখানে নেই। এখানে মনোরমা সাধারণ নারী নয়, বিশেষ নারী, এবং পুরুষ হেমচন্দ্র অসাধারণ চরিত্রবলসম্পন্ন। তাঁর বীরত্ব যেমনই হোক, মনোরমা বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে যে কখনই পুরুষসুলভ বিভ্রম আসে নি তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং মনোরমার রহস্যময় বর্তমান জীবন ও রহস্যময় অতীত জীবনের সঙ্গে তাঁর দ্বৈত সত্তার যোগ থাকা সম্ভব। সাধারণ নারীর চতুর্দিকে যে রহস্যের ইন্দ্রজাল পুরুষের বিমুগ্ধ চক্ষু আবিষ্কার করে তা নিছক subjective…এখানে মনোরমার রহস্যময়তা objective; অন্যত্র মনোরমাও আপনাকে উন্মাদিনী বলে উল্লেখ করেন। এ উল্লেখ অর্থহীন নয়। মনোরমা প্রকৃতিতে দ্বিধা বিভক্ত। যখন

তিনি আকাশমার্গে দৃষ্টি স্থাপন করেন তখন শোণিতসিক্ত হেমচন্দ্রের আহ্বান তাঁর কর্ণে প্রবেশ করে না (৩।২)···আবার যখন তিনি বাস্তব পৃথিবীতে নেমে আসেন তখন হেমচন্দ্রের সেবায় সব কিছু বিস্মৃত হন। যখন তিনি প্রেতাকীর্ণ বাপীতীরে নিশীথে আর্দ্রবসনে বসে থাকেন তখন তিনি অন্য জগতের প্রাণী, আবার যখন তিনি হেমচন্দ্রকে বাপীতীরে রণসাজে সজ্জিত দেখে হেমচন্দ্র বিবাহ করতে চলেছেন কিনা প্রশ্ন করেন তখন তিনি এই জগতের লীলাচঞ্চলা বালিকা। মনোরমার প্রকৃতিতে যে বিপরীতভাবের অদ্ভুত সমাবেশ ঘটেছে, তা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় মনোরমাও উপলব্ধি করেন। তখন তাঁর মনে হয়, 'আমি তো উন্মাদিনী'। মনোরমা-চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। এ মনোরমা ইহজগতের আবার সম্পূর্ণ ইহজগতের নয়, প্রকৃতিস্থ আবার সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয়।

মনোরমা একটি প্রহেলিকা; আকৃতি প্রকৃতি কোনও কিছুই তাঁর স্পষ্ট নয়। **পশুপতি** চরিত্র আকৃতি প্রকৃতি সকল দিক হ'তেই স্পষ্টতম চরিত্র। পঁয়ত্রিশ বছরের রূপবান যুবকের সাফল্যমণ্ডিত জীবনের নেপথ্যে যে কুরূপ লোভ ও বিবাহিত জীবনের অসাফল্য মনকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করে তার চমৎকার দৃষ্টান্ত পশুপতি। তিনি রাজা ন'ন কিন্তু রাজ্যশাসন যন্ত্রের সর্বপ্রধান পরিচালক। পশুপতি বিবাহিত, পত্নী নিরুদ্দিষ্টা। সঙ্গপরশহাবা পশুপতির জীবনে এসেছেন মনোরমা—তাঁরই আপন পত্নী বিধবারূপে। উভয়ের মধ্যে যে বিস্মৃতির নদী বয়ে গেছে তার এ পাশে রয়েছে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক ও পাশে রয়েছে এক অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা। বিবাহের লগ্ন ক্ষণকালের···তারপর এসেছে বিরহের যুগ। বালিকা বধূর পিতা জ্যোতিষের গণনায় জেনেছিলেন কন্যার বৈধব্য এবং স্বামীর সঙ্গে সহমরণ ঘটবে। তাই বিধাতার বিধানকে প্রতিরোধ করার জন্য কন্যাকে নিয়ে দূর দেশে চলে গিয়েছিলেন। তারপর সেই দরিদ্র যুবক আপন চেষ্টায় ও মহত্ত্বে ধর্মাধিকার পদের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন···কিন্তু আর বিবাহ করেন নি। মনোরমা শৈশবের সেই বিবাহের খেলা ভুলে গিয়েছেন, তিনি আপনাকে বিধবা রূপে জানেন। ভাগ্যের পরিহাসে সেই স্বামী-স্ত্রী আবার কাছাকাছি এসেছেন—কিন্তু কেউ কাউকে জানেন না। পশুপতি জানেন মনোরমা বিধবা, তাঁর প্রেমিকা। আর মনোরমার নিকট পশুপতি বিপত্নীক এবং তাঁর প্রেমিক। পশুপতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা গগনস্পর্শী। রাজ্যের শাসনভার যাঁর উপর সমর্পিত তিনি বার্ধক্যজর্জর। লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য শাসনের শক্তি নেই

…পশুপতির আসক্তি প্রবল। তাঁর আসক্তি সিংহাসন ক্ষেত্রে ও মনোরমায়। পঁয়ত্রিশ বছরের বঞ্চিত জীবনে প্রেমের পাত্র নিয়ে যিনি আবির্ভূত তিনি বিধবা। কৌলীন্য ধর্ম, সনাতন ধর্মের প্রবলতার যুগে বিধবাবিবাহ অচল…বিধবার প্রতি প্রেম পাপ। এক পাপ আরও গভীরতর পাপের ক্ষেত্রে তাঁকে টেনে নিয়ে চলে। আপন চেষ্টায় ও কর্মক্ষমতায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক আজ গৌড়ের প্রধান মন্ত্রী—আর সামান্য চেষ্টায় রাজ্য শাসনের ক্ষমতাটুকুও অধিগত করা যায়। সুযোগও উপস্থিত—বাংলার দ্বারপ্রান্তে মুসলমান। মগধ তাঁরা জয় করেছেন। এবার তাঁরা যাত্রা করবেন বাংলার দিকে। গৌড়ের রাজা পশুপতির প্রভু। তাঁর নিকট রাজ্যভার কেড়ে নেওয়া মহাপাপ। অথচ বৃদ্ধ স্থবির লক্ষ্মণ সেন মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত ক'রে গৌড়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবেন এ আশা নেই। এ অবস্থায় যদি তিনি মুসলমানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে গৌড়ের সিংহাসন হ'তে লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত ক'রে নিজে বসতে পারেন তাহ'লে রাজলক্ষ্মীও তাঁর অধিকৃত হয়, অঙ্কলক্ষ্মীও তাঁর অধিগত হয়। রাজা হিসেবে পশুপতি যদি বিধবা মনোরমাকে বিবাহ করেন তাহ'লে কোনও প্রতিবাদ প্রবল হয়ে উঠবে না। আর গোপন ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যদি তিনি সিংহাসন লাভ করেন তাহ'লে রাজ্যাপহারক কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ বলে তাঁর নিন্দা রটবে না। পশুপতি কিন্তু সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রবৃত্তির পথ গ্রহণ করতে পারেন না। প্রবৃত্তির পথ যে পাপের পথ এ বোধ তাঁকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করে। বিশ্বাস-ঘাতকতার দ্বারা তিনি রাজ্য চান না…আবার এ বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত মনোরমা ও সিংহাসন কোন কিছুই পাওয়া যায় না। অন্তর্দ্বন্দ্বকাতর দেবীমূর্তির নিকট প্রার্থনা করেন—বল দাও দেবী, জয় দাও দেবী। পশুপতি অন্তরে যতই দ্বিধাগ্রস্ত হন ততই বাহির হ'তে শক্তির জন্য শক্তি-উপাসনা করেন। পশুপতির শক্তি-উপাসনা একটি দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তের লোভ ও সংগ্রামের চমৎকার অভিব্যক্তি। পশুপতির অন্তর চায় প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণ, চায় মনোরমার প্রেম, চায় সিংহাসন। পশুপতির অভ্যস্ত জীবনাদর্শ তাঁকে নিরুদ্ধ করে। পশুপতি দেবীর নিকট বল প্রার্থনা করেন। মনোরমা তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। মনোরমা জেনেছেন পশুপতি কেবল তাঁর প্রেমিক নন, স্বামীও। মনোরমা জেনেছেন যে তাঁর স্বামী ধর্মক্ষেত্র হ'তে সরে গিয়ে অধর্মের মধ্য দিয়ে রাজসিংহাসন চাইছেন। যবনের সঙ্গে পশুপতির গুপ্ত মন্ত্রণা তাঁর কানে এসেছে। বৃদ্ধ প্রভুর রাজ্যচ্যুতির জন্য বিধর্মীর সঙ্গে পশুপতি যে গোপন ষড়যন্ত্রে নেমেছেন তা কদর্য ও

ভবিষ্যৎদৃষ্টিহীন কার্য। মনোরমা আত্মপরিচয় উদ্ঘাটিত ক'রে যখন পশুপতিকে তীব্র ভৎর্সনা করেন তখন পশুপতির চৈতন্য উদ্রিক্ত হয় বটে কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে এখন আর ফিরে আসার সময় নেই। তিনি বলেন, 'মনোরমা আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিরিবার উপায় থাকিলে ফিরিতাম—তোমাকে লইয়া সর্বত্যাগী হইয়া কাশী যাত্রা করিতাম। কিন্তু অনেক দূর গিয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই।" সত্যই যে তাঁর আর ফেরার উপায় নাই তা বোধ হয় তিনি তখনও বোঝেন নি। তিনি আপনাকে চতুর মনে করেছিলেন। যবনকে দেশে প্রবেশ করতে দেবার পর ষড়যন্ত্রের সর্ত অনুসারে তিনি দেবেন কর আর আপনি বসবেন সিংহাসনে। কিন্তু যেদিন তিনি বিক্ষুব্ধ চিত্তে লক্ষ্য করলেন যে যবন সৈন্য নিরীহ নগরবাসীর রক্তস্রোতে রাজপথ পিচ্ছিল ক'রে তুলেছে, যেদিন তিনি বখতিয়ার খিলজিকে পুরীতে স্বাগত জানাতে গেলেন আশঙ্কাস্পন্দিত বক্ষে সেদিন জানলেন, তিনি কত বড় মূর্খ। জানলেন, মুসলমান রাজ্য জয় করেছে তাকে সিংহাসনে বসাবার জন্য নয়। জানলেন, এই বিধর্মীর হাতে তাঁর ধনপ্রাণ মোটেই নিরাপদ নয়। জানলেন তিনি, শত্রুব্যূহে প্রবেশ পথ তাঁর জানা আছে, নির্গম পথ তাঁর জানা নেই। যেদিন শত্রুর কৌশলে পুরীর মধ্যে বন্দী হলেন এবং পুরীর বাইরে নিরীহ নগরবাসীর উপর অত্যাচারের দূরশ্রুত ধ্বনি তাঁর চিত্তকে বিকল ক'রে তুলল, সেদিন অনুশোচনার তীব্র কশাঘাতে তার বিবেকজর্জর চিত্ত কেবল মৃত্যু চেয়েছিল। সেদিন তিনি জেনেছিলেন এ স্রোতে কেবল মৃত্যুর দিকে ভেসে যাওয়া আছে, জীবনের কূলে প্রত্যাবর্তন নেই। জেনেছিলেন পাপে শান্তি নেই। শান্তির সম্ভাবনা যেখানে ছিল সেখান হ'তে তিনি চিরতরে নির্বাসিত। তারপর যখন সেনাপতির কৌশলে তিনি মুক্ত হ'য়ে আর্তনাদমুখর নগরের মধ্য দিয়ে প্রজাপীড়নের বীভৎসতাকে প্রত্যক্ষ ক'রে আপন গৃহের সমাধিস্তূপে ফিরে এলেন…সেখানে চরমতম আত্মধিক্কারের সঙ্গে গভীরতম একটি আশঙ্কা তাঁর মনকে বিহ্বল ক'রে তুলেছিল। যবন রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে তিনি গৃহে মনোরমাকে বন্দী ক'রে রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখন মনোরমা কোথায়? যুবতী-নির্যাতনপটু বিজয়ী সৈনিকের করাল গ্রাসে কি গ্রস্ত হয়েছে মনোরমা? একটা অবসন্নকরা আতঙ্ক, একটা শূন্যতাবোধবিস্তারী হাহাকার তাঁর চিত্ত মত্ত ক'রে দিল। যে দেবী অষ্টভুজাকে তিনি শক্তির উৎস বলে গ্রহণ করেছিলেন আজ সর্বরিক্ত পশুপতি সেই

দেবীমূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আপন ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চান। চারিদিকে জ্বলছে আগুন···বিজয়ী যবনের উন্মত্ত অবিচারের লেলিহান শিখা ঘিরে ধরেছে তাঁর অট্টালিকা। বাইরে জ্বলছে আগুন···অন্তরে জ্বলছে আগুন। সেই আগুনের সর্বগ্রাসী লেলিহান শিখায় পশুপতি জীবন্ত সমাধিস্থ হলেন। দেবী যেন তাঁর পাপের শাস্তি দিলেন···পাবন অগ্নি যেন তাঁকে পাপের বিধান দিলেন। অগ্নি-পরীক্ষায় যেন তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত বিচার হয়ে গেল। বস্তুতঃ ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, পশুপতির জীবন্ত সমাধির দৃশ্যটি বড়ই করুণ, বড়ই সুন্দর। এই একটি মাত্র দৃশ্যের মধ্যেই আমরা সেই বঙ্কিচন্দ্রকে পাই যিনি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। ডক্টর শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বঙ্কিমের কল্পনা শক্তির চরম বিকাশ, মানসিক বিপ্লব ও অগ্ন্যুৎক্ষেপ ফুটাইয়া তুলিবার অতুলনীয় ক্ষমতার পরিচয় স্থল—'ধাতুমূর্তির বিসর্জন' নামক অধ্যায়টি (চতুর্থ খণ্ড, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ)।" পশুপতির চিত্তের মধ্যে যে কামনার বহ্নিশিখা দেখা দিয়েছিল তা রাজা, রাজ্য এবং আপন গৃহকে বিপর্যস্ত করল। আপন জীবনের সঙ্গে গ্রথিত আর একটি জীবনও সেই আগুনে ভস্মীভূত হ'য়ে গেল। বিধাতার চরম নির্দেশ কেবল পশুপতির মৃত্যু নয় মনোরমার সহমরণও। জ্যোতিষের যে ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রতিরোধের ব্যর্থ সঙ্কল্পে মনোরমার পিতা কন্যা এবং জামাতাকে বিযুক্ত কবেছিলেন বিধাতার সেই নির্দেশ অলঙ্ঘনীয়। সহমরণের মধ্যে মনোরমা এবং পশুপতি মিলিত হলেন।

পশুপতি চবিত্রের পরিকল্পনা একদিক দিয়ে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের গভীব ইতিহাসবোধ ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির নির্দেশক অপরদিক হতে তেমনি নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় কৃতসঙ্কল্প চিন্তানায়ক বঙ্কিমের আদর্শবাদ ও ধর্মবিশ্বাসের পরিচায়ক। যদি নির্বাধে বঙ্গবিজয়ের আখ্যানকে ইতিহাস বলে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে একথা অবিসংবাদিত ভাবে সত্য যে গোপন ষড়যন্ত্রের রন্ধ্রপথেই বাংলার ভাগ্যে সেদিন শনি প্রবেশ করেছিল। আর পাপীর জীবনে যে দ্বিধা ও বিবেকের কশাঘাত অনিবার্য তার চমৎকার বিশ্লেষণ পশুপতির মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যজীবনের সাধনা আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাসী করা, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করা। নৈতিক পুনরুজ্জীবনের মহৎ দায়িত্ব নিয়ে তিনি যে সাহিত্য সাধনা করেছেন তার মুখবন্ধ স্বরূপ 'মৃণালিনী'র এই অংশটুকু। যে-ব্যক্তিগত সুখের ইচ্ছা মানুষকে সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্র হতে স্বার্থসাধনতৎপর করে তার চূড়ান্ত

পরিণাম কি বঙ্কিমচন্দ্র তা এখানে সুন্দররূপে দেখিয়েছেন। ধর্মবোধ সত্ত্বেও মানুষের মনে পাপের প্রলোভন কত প্রবল তার চমৎকার দৃষ্টান্ত পশুপতি। তিনি ধর্মকে অস্বীকার করেন নি, তাই বিধবাবিবাহে তিনি সংস্কারমুক্ত হতে পারছিলেন না। তিনি ধর্মকে পরিত্যাগ করেন নি, তাই দ্বিধাদীর্ণ হৃদয় নিয়ে দুষ্ট দেবীর কাছে আকুল প্রার্থনা করেছিলেন, "জননি! বিশ্বপালিনি! আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—দেখিও মা! আমায় উদ্ধার করিও। কেবল এই আমার পাপাভিসন্ধি যে, অক্ষম প্রাচীন রাজার স্থানে আমি রাজা হইব। যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া পরে উভয় কণ্টককে দূরে ফেলিয়া দেয় তেমনি যবন-সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্য-সহায়তায় যবনকে নিপাত করিব। ইহাতে পাপ কি মা? যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য যে হীন পন্থা পশুপতি অবলম্বন করেছিলেন তাকে বঙ্কিমচন্দ্র মনোরমার মুখ দিয়ে ভর্ৎসিত করেছেন এবং সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিচারকরূপে চূড়ান্ত রায় দিয়েছিলেন জীবন্তসমাধির ব্যবস্থায়। অথচ পশুপতির ধর্মবোধ কম ছিল না। তিনি বৃদ্ধ-রাজার কোন ক্ষতি করতে চান নি। তিনি জানতেন যে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। তিনি এক অক্ষম রাজ্যপরিচালকেব হাত থেকে রাজ্যের রশ্মিভার কেড়ে নিয়ে প্রজার এবং আপনার কল্যাণ বিধান করতে চেয়েছিলেন। তিনি যবন সেনাপতির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে প্রথমে অতিথি রাজপুত্র হেমচন্দ্রেব গুপ্তহত্যায় স্বীকৃত হন নি, কিন্তু পরে রাজ্যলাভের প্রবল বাসনায় তিনি বুঝেছিলেন যে বারেক যখন পাপের স্রোতে নেমেছেন তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে। পশুপতি চরিত্রের মধ্যে উৎকট রাজ্যলাভবাসনা কিভাবে অধর্ম ও অকল্যাণের পথ প্রস্তুত করেছিল পশুপতি কর্তৃক হেমচন্দ্রের গুপ্ত হত্যায় স্বীকৃতি তারই চমৎকার পূর্বাভাষ। পশুপতি ধর্ম এবং অধর্মকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন। যখন বক্তিয়ার খিলজি কর্তৃক রুদ্ধ হন তখন ইসলাম গ্রহণে তাঁর স্বাভাবিক চিত্তবিক্ষোভ চমৎকারভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পশুপতি উপলব্ধি করেছেন স্বধর্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ। তিনি আপন ধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন। এ ধর্ম কেবল হিন্দুর ধর্ম নহে—মানবধর্ম। তিনি আত্মসুখের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে অকল্যাণের পথ বেছে নিয়েছিলেন। সে অকল্যাণ সমগ্র রাজ্যের, তাঁর আত্মার, তাঁর দেহের, তাঁর আত্মীয়ের। পশুপতির শেষ পরিণাম তারই অনিবার্য পরিণতি।

'এককালে ধর্মাধর্ম দুই তরী 'পরে পা দিয়ে বাঁচেনা কেহ'—পশুপতির মৃত্যু তার চমৎকার উদাহরণ।

'মৃণালিনী' গ্রন্থের নায়িকা মৃণালিনীর চরিত্র বৈচিত্র্যহীন, দম দেওয়া কলের পুতুলের মত। তাঁর মধ্যে কেবল নির্জীব প্রণয় অভিসারের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।• তাঁর মধ্যে হিন্দুনারীর নিষ্ঠা খোঁজবার চেষ্টা করেছেন ডক্টর সেনগুপ্ত, কিন্তু মৃণালিনী বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীকন্যা। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত বলেন, "মৃণালিনী চরিত্রে যে চিরন্তন হিন্দুনারী চিত্তের প্রেরণা রহিয়াছে, শত বিপ্লব ও বিবর্তনের মধ্য দিয়াও হিন্দুর সংস্কার তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবে।"—মৃণালিনী প্রসঙ্গে এ ধারণাও অযৌক্তিক বলে মনে হয়। কারণ মৃণালিনী হিন্দুরমণী নহেন। গিরিজায়ার কাছে আত্মজীবন রহস্য উদ্ঘাটন কালে (গ্রন্থ পরিসমাপ্তির পূর্বে) তিনি আপনাকে বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীকন্যা বলেছেন। মৃণালিনীর মধ্যে হিন্দু নারীর চরিত্রমাহাত্ম্য অপেক্ষা, বিবেচনা-বোধহীন প্রণয়ীর সঙ্গে মিলনের বাস্তব-জ্ঞান-বিবর্হিত তীব্র আসক্তি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মধ্যে না আছে কোন ব্যক্তিত্ব, না আছে আপন গৃহের প্রতি কোন মমতা। ডক্টর সেনগুপ্ত ঠিকই বলেছেন, মৃণালিনীকে কলের দম দেওয়া পুতুল বলে মনে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিষবৃক্ষ

বঙ্কিমচন্দ্রের অতীতচারী মন রোমান্সের রাজপথে প্রথম পরিক্রমার পর আমাদের বর্তমান জীবন ও বাস্তব সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করল "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে। কোথায় গেল সেই গড়মান্দারণ, মোগল পাঠানের যুদ্ধবিগ্রহ, জগৎসিংহ ও ওসমানের দ্বৈরথ সংগ্রাম, রাজপুত্র বিষয়ে রাজকন্যার "বন্দী আমার প্রাণেশ্বর" বিঘোষণা। কোথায় গেল সেই জনহীন সমুদ্রতীরবর্তী অরণ্যপ্রদেশ, যেখানে ভীষণ সাধক কাপালিক ও অবেণীসম্বদ্ধা আলুলায়িতকুন্তলা অচিরোদ্ভিন্নযৌবনা কপালকুণ্ডলার অবস্থিতি? কোথায় গেল বক্তিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পটভূমিকায় এক বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীকন্যা ও মগধরাজপুত্রের প্রেমকাহিনী? কোথায় গেল মাতা কন্যা বধূ হ'তে স্বতন্ত্র নারীরূপিণী প্রহেলিকা মনোরমা? আমাদের এই কর্দমপঙ্কলিপ্ত সংসারের আবেগ-মন্থর জীবনযাত্রার অভ্যন্তরে যে মীনকেতনের পরিহাস-চাঞ্চল্যে চিত্তসংযমের ভিত্তিভূমি বারে বারে স্খলিত হ'য়ে যায়, সেই রিপু-অভিঘাতের চমৎকার রেখাচিত্র তুলে ধরার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এবার এগিয়ে এলেন। 'মৃণালিনী'র রচনার পর দীর্ঘ চারিবৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। বঙ্কিমের বয়স এখন পঁয়ত্রিশ (নগেন্দ্রের বয়স?), দ্বিতীয়া পত্নী রাজলক্ষ্মীর বয়স এখন পঁচিশ (সূর্যমুখীর বয়স?)। সাংসারিক অভিজ্ঞতার ধাপে ধাপে তিনি এগিয়ে চলেছেন এবং আমাদের ক্লান্ত দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে যে রস-রহস্যের সন্ধান করা যায় সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন। রাজপুত্র-রাজকন্যার কাহিনীর জন্য তাঁকে জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষা বা হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর সন্ধানে বহির্গত হতে হবে না। বাস্তব জীবনে যেখানে বাহিরের সংঘাত কম, যেখানে সিংহাসনের জন্য ষড়যন্ত্র বা দুর্গজয়ের জন্য অসিঝঞ্ঝন শ্রুত হয় না সেইখানে, আমাদের আপাতশান্ত জীবনের নেপথ্যে, প্রবৃত্তিগত চঞ্চলতার আবেগ জীবনকে বিক্ষুব্ধ বা আনন্দিত করে এইবার তাঁর দৃষ্টি সেইখানে গিয়ে পড়ল। 'কপালকুণ্ডলা'র মধ্যে তিনি একটি চমৎকার মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী রচনার পরিবেশ পেয়েছিলেন দ্বিতীয়ার্ধে। এবার সরাসরি আমাদের পরিচিত জীবনের মধ্যে পঙ্কস্নান করে তিনি অপূর্ব কাহিনীপদ্ম আমাদের সামনে উপস্থাপিত করলেন।

পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিতে কাহিনীর সূত্রপাতেই পরিচয় ঘটেছে আমাদের নায়কের সঙ্গে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে এক নিদাঘতপ্ত দিবসে গড়মান্দারণসমীপবর্তী স্থানে জগৎসিংহের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা'তে কুয়াসাচ্ছন্ন সাগর-সঙ্গমে নবকুমারের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। 'মৃণালিনী'তে অধীর, উদ্ধত, মগধরাজ-পুত্রের সঙ্গে কাহিনীর সূত্রপাতেই আমাদের পরিচিতি ঘটেছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, স্থানে এবং কালে এই নায়কত্রয় এই তিনটি ক্ষেত্রেই আমাদের নিকট হতে বহু দূরবর্তী। নায়কের প্রথম পদার্পণের ক্ষেত্রটি 'দুর্গেশনন্দিনী', কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'তে যথাক্রমে গড়মান্দারণ, নিভৃত বনপ্রদেশ ও কল্পনা-মিশ্রিত অতীতের বঙ্গভূমি। এই সকল স্থানের চতুর্দিকে একটি অনতিপ্রাত্যহিকতার রহস্য-মন্ত্র যেন নিত্য উদ্গীত। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথও প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখা দিয়েছেন পূর্ববর্তী নায়কত্রয়ের মত এবং তাঁর সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর প্রথম সাক্ষাৎ যে গ্রামে হল সেই গ্রামের নাম 'ঝুমঝুমপুর'। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ যে-নদীপথে এই 'ঝুমঝুমপুবে' উপস্থিত হলেন তার চারিপাশে "জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান কবিতেছে, কেহ বা তামুক খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষেব অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলেব পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিবাজ কবিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘসিতেছেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা অব্যক্তনাম্নী প্রতিবাসিনীর উদ্দেশ্যে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন।"

কাহিনীর পূর্বাহ্ণে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়ে দিলেন যে যে-রসস্রোতের উপরে নগেন্দ্রনাথের জীবন-তরণীটি প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার চতুর্দিকে প্রাত্যহিক সংসারের একরঙা তুচ্ছতা, কিন্তু তারই মধ্যে কি নিবিড় পুলকস্পর্শ! এবারের নায়ক জগৎসিংহের মত পঁচিশ বছরের অবিবাহিত যুবক রাজপুত্র নহেন, নবকুমারের মত বিপত্নীকবৎ নহেন, হেমচন্দ্রের মত গান্ধর্ব বিবাহে উন্মত্ত প্রিয়মিলনলিপ্সু যুবক রাজপুত্র নহেন। ইনি নগেন্দ্রনাথ দত্ত···বাংলা দেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত জমিদার সম্প্রদায়ের হীনবীর্য প্রতিনিধি। বয়সে তিরিশ এবং ঘরে পতিগতপ্রাণ ছাব্বিশ বছরের

দাম্পত্য জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর জীবনকে পরিচিহ্নিত করেছে।

আখ্যায়িকা আরম্ভের প্রথম দৃশ্যে নগেন্দ্রনাথ চলেছেন নৌকারোহণে, আমাদের বাংলাদেশের পরিচিত পল্লীর মধ্যভাগ দিয়ে যে জলধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার উপর দিয়ে। দুপাশে গ্রামের বিচিত্র মধুর জীবনযাত্রা দেখে দেখে নগেন্দ্রনাথের নৌকা বয়ে চলেছে। হঠাৎ একদিন আকাশ কালো করে মেঘ এলো, মেঘ মন্দ্রিত অন্ধকারের মধ্যে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল জলধারা, তীরপ্রান্তে এলো তরী, আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তরী থেকে নেমে পাশের গ্রামের মধ্যে এগিয়ে চললেন নগেন্দ্রনাথ। সামনে একটি জীর্ণ কুটীর দেখা দিল। আশ্রয়প্রার্থী নগেন্দ্রনাথ তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। জীর্ণ কুটীরের মধ্যে একটি কক্ষে তখন জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব চলেছে। রোগশয্যায় শুয়ে রয়েছেন এক বৃদ্ধ, শিয়রদেশে কন্যা কুন্দনন্দিনী। মৃৎপ্রদীপের ক্ষীণ আলোয় সেই মৃত্যুশঙ্কিল কক্ষে আলোছায়ার লীলাচঞ্চল নৃত্য। দমকা হাওয়ায় প্রদীপের আলো নীল হ'য়ে নিবু নিবু হ'য়ে নিবে গেল। নিবে গেল কুন্দনন্দিনীর পিতার জীবনদীপ। তেরো বছরের কুন্দনন্দিনী সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। তাঁর মা নেই, বাবা নেই, ভাইও নেই। সে-অন্ধকারের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মাতা স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিলেন। স্বপ্নে আবির্ভূত কুন্দনন্দিনীর মাতা একটি পুরুষ ও একটি নারী হতে কুন্দনন্দিনীর বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। সেই পুরুষ নগেন্দ্রনাথ ও সেই নারী নগেন্দ্র দত্তের পরিচারিকা হীরাদাসী। স্বপ্নের মধ্যে যা অস্পষ্ট ছিল তা পরদিন পরিস্ফুট হয়ে উঠল। কুন্দনন্দিনীর পিতার শেষকৃত্যাদি করে নগেন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে চললেন আশ্রয় দেবার জন্যে। কুন্দনন্দিনীর কাছে স্বপ্নদৃষ্ট সেই মূর্তি নগেন্দ্রনাথ। নগেন্দ্র-নাথ কলিকাতায় কুন্দনন্দিনীর আত্মীয়ের অনুসন্ধান করলেন। কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। কলিকাতায় নগেন্দ্রনাথের ভগিনী ও ভগিনীপতির বাড়ী। সেইখানে নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে গেলেন। ভগিনী কমলমণি কুন্দনন্দিনীর আদর আপ্যায়নে প্রবৃত্ত হলেন। কিছুদিন বাদে স্ত্রী সূর্যমুখীর নিকট হতে পত্র পেলেন নগেন্দ্রনাথ। তিনি ঐ নিরাশ্রয়া বালিকাটিকে কাছে পেতে চান। সমবয়সী খেলার সাথী তারাচরণের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে চান। নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে এলেন সূর্যমুখীর কাছে। কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তারাচরণের বিবাহ হল।

বিবাহের তিন বৎসর বাদে কুন্দনন্দিনী বিধবা হলে সূর্যমুখী তাঁর দুঃখে কাতর

হয়ে তাঁকে আপন গৃহে নিয়ে এলেম। একে কুন্দনন্দিনী সুন্দরী, ষোড়শী, তার উপর সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। নগেন্দ্রনাথের সুখোচ্ছল দাম্পত্য জীবনের মধ্যে করুণা ও সহানুভূতির সঙ্গে প্রবৃত্তির বীজ অঙ্কুরিত হল। নগেন্দ্রনাথ নিজেকে সংযত করার জন্য নিজের প্রতি কঠোর হয়ে উঠলেন। কিন্তু সেই আত্মনিগ্রহের কঠোরতার মধ্যে কুন্দনন্দিনীর প্রতি দুর্বলতা তাঁর বাড়তে লাগল। তিনি যতই সবলে নিজেকে আঘাত করতে লাগলেন ততই কুন্দনন্দিনীর চিন্তা তাঁকে দুর্বল করে তুলল। সূর্যমুখী পতিগতপ্রাণা। উপলব্ধি করলেন তিনি নগেন্দ্রনাথের চিত্তবিক্ষোভ। সূর্যমুখী কমলমণির কাছে তাঁর আশঙ্কা জানিয়ে চিঠি লিখলেন। কমলমণি পরিহাস করে তার প্রত্যুত্তর পাঠিয়ে দিলেন। ক্রমে ক্রমে সূর্যমুখীর আশঙ্কা সত্য হয়ে আসতে লাগল। একদিন নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে বিবাহের প্রস্তাব করলেন।

এদিকে কুন্দনন্দিনীর স্বামী তারাচরণের বন্ধুস্থানীয় জমিদার দেবেন্দ্রও কুন্দনন্দিনীর রূপে মুগ্ধ। সুন্দরী নারী তাঁর কাছে ভোগের সামগ্রী। বিধবা কুন্দনন্দিনীকে পাবার জন্য তিনি আকুল। অথচ দত্তবাড়ীব অন্তঃপুরে তাঁর প্রবেশাধিকার নেই। এবার তিনি বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশে দত্তবাড়ীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন এবং কুন্দনন্দিনীর কাছে গিয়ে তাঁকে গান শুনিয়ে দিয়ে এলেন। বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশের মধ্য হতে পুরুষালি ভাব কিছু দেখা যাচ্ছিল। তাই সূর্যমুখী হীরাদাসীকে সেই বৈষ্ণবীর পেছনে তার গতিবিধি নিরীক্ষণের জন্য পাঠালেন। হীরাদাসী জানতে পারল যে বৈষ্ণবী আর কেউই নয়, স্বয়ং দেবেন্দ্রবাবু। তিনি যে কুন্দনন্দিনীর জন্য বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশে অভিসারে গিয়েছিলেন তাও হীরা তাঁর কাছ থেকে জানতে পারল যখন দেবেন্দ্র সেই কথা তাঁর আত্মীয়ের নিকট বলছিলেন। দেবেন্দ্র অন্তরালবর্তী হীরাকে ধরে ফেললেন এবং হীরা দেবেন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হয়ে কুন্দনন্দিনীর প্রতি ঈর্ষা এবং আক্রোশ নিয়ে আপন বাড়ীতে ফিরে এল।

পরদিন হীরার নিকট হতে সূর্যমুখী জানলেন যে দেবেন্দ্রই বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশে কুন্দনন্দিনীর কাছে আনাগোনা করছেন। কুন্দনন্দিনীকে তিনি ভর্ৎসনা করলেন এবং সেই ভর্ৎসনায় সপত্নী-বিদ্বেষের তীব্রতা একটু বেশী হোল। সেই রাত্রে-সপ্তদশবর্ষীয়া কুন্দনন্দিনী মর্মপীড়িতা হয়ে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করলেন। রাত্রি তখন অন্ধকার…অল্প অল্প বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কুন্দনন্দিনী দত্তবাড়ীর বাইরে কোনদিন যাননি। অন্ধকারের মধ্যে নগেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষের বাতায়ন পথে আলো দেখা

গেল। কুন্দনন্দিনী প্রত্যাশাস্পন্দিত হৃদয়ে সেইদিকে তাকালেন। নগেন্দ্রের মুখ দেখে কুন্দ গভীরতর অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। বাইরে তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে প্রবলবেগে, বিদ্যুতের আলোয় পথপার্শ্বে একটি গৃহ দেখতে পেলেন। তারই চালার তলায় আশ্রয় নিলেন কুন্দনন্দিনী বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য। মানুষের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল ঘরের ভিতরকার লোক। ঘরের ভিতর থেকে বেরুল হীরাদাসী—এটি তার গৃহ। পলাতকা কুন্দনন্দিনীকে নিজগৃহে আশ্রয় দিল হীরাদাসী। এইবার দেবেন্দ্র হীরাকে ডাকিয়ে পাঠালেন, অর্থের বিনিময়ে কুন্দনন্দিনীকে হাতে তুলে দেবার জন্য। হীরা স্বয়ং দেবেন্দ্রের প্রতি আসক্ত। হীরা এ প্রস্তাবে কেবল যে বিরক্ত হল তাই নয়, কুন্দনন্দিনীর প্রতি আরও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। সূর্যমুখীর প্রতিও তার অকারণ ক্রোধ দেখা দিল। হীরা কৌশল করে নগেন্দ্রের কাছে জানাল, সূযমুখী কটূক্তি ক'রে কুন্দনন্দিনীকে এমন মর্মপীড়িতা করেছেন যে তিনি আঘাতে গৃহত্যাগ করেছেন। সূর্যমুখী নগেন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হ'য়ে স্বীকার করলেন যে তিনি হরিদাসী বৈষ্ণবীর ব্যাপারে কুন্দনন্দিনীকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। নগেন্দ্র বুঝতে পারলেন কুন্দের প্রতি সূর্যমুখীর এই কঠোরতার কারণ কেবল হরিদাসী বৈষ্ণবী নয়—তিনি নিজেই। নগেন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করলেন যে তিনি কুন্দ বিরহে উন্মাদ। সূর্যমুখীর বেদনা তিনি বুঝতে পারেন···কিন্তু তিনি আপন চিত্তকে কিছুতেই স্ববশে আনতে পারেন নি। এখন কুন্দের সন্ধানে তিনি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়বেন। আর এ জীবন তাঁর ভাল লাগছে না। সমস্ত শুনে সূযমুখী প্রতিশ্রুতি দিলেন যে একমাসের মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে ফিরিয়ে এনে স্বামীর মুখে হাসি ফোটাবেন। কিছুদিন বাদে কুন্দ নগেন্দ্রের দর্শনাভিলাষে আবার দত্তগৃহে চুপি চুপি প্রবেশ করলেন এবং সূর্যমুখী তাঁকে সস্নেহে অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে নিলেন। পতিগতপ্রাণা সূর্যমুখীর জীবনের আদর্শ পতির আনন্দ। সে আনন্দের জন্য নিজের প্রাণকে তিনি বলি দিতে প্রস্তুত। সূর্যমুখী স্বামীর অন্তঃকরণ বুঝেছেন—এবার নিজেই উদ্যোগী হয়ে কুন্দনন্দিনীর পরিণয় সংসাধিত করলেন। খবর পেয়ে কমলমণি ছুটে এলেন··· দেখেন সূর্যমুখী হতশ্রী। সেই রাত্রেই সূর্যমুখী কমলমণিকে আশীর্বাদপত্র দিয়ে গৃহত্যাগ ক'রে চলে গেলেন।

এইবার দত্তবাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠল। নগেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন কুন্দ সূর্যমুখী ন'ন। উপলব্ধি করলেন সূর্যমুখী তাঁর জীবনে কতখানি।

কুন্দনন্দিনীকে তিনি ভালবেসেছেন···সে ভালবাসা রূপলালসাসম্ভূত। সূর্যমুখীকে তিনি ভালবেসেছেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে। সে ভালবাসা জীবনের মর্মমূলে বাসা নিয়েছে। ক্রমে সূর্যমুখীর বিরহ ও কুন্দের সঙ্গ অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। এইবার তাঁর চিত্তে প্রবল বিক্ষোভ সুরু হয়েছে। চতুর্দিকে অন্বেষণ চলল সূর্যমুখীর, কিন্তু কোথাও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। নগেন্দ্রনাথের কাছে খবর এল যে নিদারুণ কষ্টে পথশ্রমে রোগে সূযমুখীর মৃত্যু ঘটেছে। নগেন্দ্রনাথ তখন পাগলের মত সূর্যমুখীর সন্ধানে দেশে দেশে ছুটোছুটি করছেন। এইবার সমস্ত সম্পত্তির দানপত্র শেষ ক'রে দত্তগৃহ হ'তে তিনি চিরবিদায় নিতে চান। শেষবারের মত বাড়ী ফিরে এলেন তিনি, সূযমুখীর স্মৃতিঘেরা পুরাতন শয়নগৃহে কাঁদবার জন্য ·· কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করলেন না।

ওদিকে দেবেন্দ্রের কথায় হীরাদাসী সম্মত হয়ে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা ত করেই নি উপরন্তু একবার যখন সূযমুখীব নিরুদ্দেশযাত্রার পর নগেন্দ্রনাথও বিদেশে অনুসন্ধানরত তখন দেবেন্দ্রনাথ দত্তবাড়ীতে গোপনে প্রবেশ ক'রে হীরার সহায়তায় কুন্দের সঙ্গে মিলিত হ'তে চাইলে হীরা তাঁকে দরওয়ানদের হাতে নিগৃহীত করেছে। দেবেন্দ্র তাব সাংঘাতিক প্রতিশোধ নিলেন। হীরা তাকে দেহমনপ্রাণ সমর্পণ করল। প্রেমের ছলনায় রূপবান দেবেন্দ্র তাকে ভোগ করে বিদূরিত করলেন এই বলে যে কুন্দনন্দিনীব সঙ্গে মিলনে সহায়তা করলেই এইবার তিনি হীবাকে কিছুটা করুণা করতে পারেন নচেৎ হীরার কোন মূল্যই নেই তাঁব কাছে। অভিমানিনী হীরা পবম আক্রোশে এক চণ্ডালগৃহ হ'তে তীব্র বিষ সংগ্রহ ক'রে আনল—এ বিষ আত্মহত্যার জন্য নয়, প্রতিশোধের জন্য।

যে-রাত্রে নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর শয়নগৃহে শয়ন না ক'রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না ক'রে সম্পূর্ণ উপেক্ষায় সূর্যমুখীর স্মৃতিবিজড়িত শয়নগৃহে কাঁদতে গেলেন, কুন্দনন্দিনীর আত্মধিক্কৃতি কানায় কানায় পূর্ণ হল। প্রভাত কালে দুঃখভারাক্রান্ত কুন্দনন্দিনীর নিকট তীব্র বিষের মোড়ক নিয়ে সান্ত্বনাচ্ছলে আবির্ভূত হল হীরাদাসী। —এবম্বিধ ব্যর্থজীবনে আত্মহত্যাই একমাত্র সমাধান এবং সে সমাধানের উপকরণ এই বিষ—মনে মনে কুন্দনন্দিনী এই বিচার করছেন, এমন সময় দত্তপুরীতে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি শোনা গেল। বিষের কৌটা কুন্দের নিকট রেখে এই শঙ্খধ্বনির কারণ অনুসন্ধানে হীরা চলে গেল।

হীরাপ্রদত্ত সে বিষ অমৃত জ্ঞানে কুন্দনন্দিনী গ্রহণ করলেন।

ওদিকে বিগত রাত্রে নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর শয়নগৃহে অবিশ্রাম রোদন কালে এক নারীমূর্তির সান্ত্বনাদায়ক আলিঙ্গন লাভ করেছেন—সে নারী সূর্যমুখী। সূর্যমুখী মারা যান নি। তিনি স্বামীর কাছে ফিরে এসেছেন। নগেন্দ্রের আনন্দ আর ধরে না। এই পুনর্মিলনের সংবাদ কমলমণি ও সকলের হুলুধ্বনি ও শঙ্খে ঘোষিত হল। সেই শঙ্খধ্বনি শুনে হীরা ছুটে এসেছে কুন্দের কাছে বিষের কৌটা রেখে। আজ সূর্যমুখীরও আনন্দের সীমা নেই···তাঁর কারও প্রতি বিদ্বেষভাব নেই। কুন্দনন্দিনীকে তিনি ছোট বোনের মত সানন্দচিত্তে গ্রহণ করবেন—দুই নদী এক সাগরে গিয়ে মিশবে। কুন্দনন্দিনীর সন্ধানে চললেন সূর্যমুখী ও কমলমণি···কিন্তু কুন্দনন্দিনী এখন মরণোন্মুখ। নগেন্দ্রনাথকে সংবাদ দেওয়া হল। তিনি দ্রুতপদে কুন্দের নিকট হাজির হলেন। গদগদ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?" কুন্দ প্রতিপ্রশ্ন করলেন, "তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?" আজ মূক কুন্দ মুখরা··· স্বামীর পদযুগমধ্যে মাথা রেখে হতভাগিনী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলনক্ষণে কুন্দনন্দিনী চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। পাপিষ্ঠা হীরা উন্মাদদশা প্রাপ্ত হয়ে দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হ'য়ে, কুন্দের উপর কি ভাবে অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে জানাল। দেবেন্দ্রের ভয়াবহ মৃত্যু হ'ল। হীরা উন্মাদিনী হ'য়ে সেই বাড়ীর চারপাশে গান গেয়ে বেড়াতে লাগল।

ঘটনাকাল

কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নদর্শন ও দ্বিতীয় স্বপ্নদর্শনের মধ্যে কালগত ব্যবধান চারি বৎসর। দ্বিতীয় স্বপ্নদর্শনের অব্যবহিত পরেই কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু। সমগ্র কাহিনীতে এই চারিবৎসরব্যাপী ঘটনাকালের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর প্রথম তিনবৎসরের বিবাহিত জীবন তারাচরণের সঙ্গে স্থায়ী হয়। এই তিন বৎসরের কোন বিবরণ উল্লেখ নেই। কুন্দনন্দিনীর বৈধব্য এবং নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ হ'তে মূল আখ্যায়িকার সূত্রপাত। সুতরাং নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনী-কেন্দ্রিক মূল আখ্যায়িকাটির ঘটনাকাল শেষের এক বছর।

এই ঘটনাকালে কোনও কোনও দিক থেকে পরিকল্পনাগত সামান্য ত্রুটি ও অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

পরিকল্পনাগত ত্রুটি ও অসঙ্গতি

ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে বলেছেন, "এই উপন্যাসে সময়ের

গতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র খুব সজাগ।" ডক্টর সেনগুপ্ত যে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন তাতে যদিও মনে হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র সময়ের গতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণে এই ঘটনাকালগত পরিকল্পনার মধ্যে কিছু ত্রুটি ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। নগেন্দ্রনাথ যখন কুন্দনন্দিনীকে প্রথম দেখেন তখন নগেন্দ্রনাথের বয়স তিরিশ (প্রথম পরিচ্ছেদ) কুন্দনন্দিনীর বয়স তেরো (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। সেই সময় সূর্যমুখীর বয়স ছাব্বিশের কাছাকাছি (সপ্তম পরিচ্ছেদ) এবং তারাচরণ সূর্যমুখীর সমবয়স্ক। এই সময়ে কমলমণির বয়স আঠারো (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) এবং দেবেন্দ্রের বয়স পঁচিশ (দশম পরিচ্ছেদ)। প্রথমতঃ সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রের বয়সের ব্যবধান মাত্র চারি বৎসর। এই ব্যবধান আর একটু বাড়ালে বোধহয় ভালো হয়। দ্বিতীয়তঃ নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীব বয়সের পার্থক্য সতের বৎসর। কুন্দের বৈধব্যের পর সূর্যমুখীর পত্রে (একাদশ পরিচ্ছেদ) কুন্দনন্দিনীর বয়স সতের-আঠারো বলে যখন উল্লিখিত তখন নগেন্দ্রনাথের বয়স নিঃসন্দেহে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হওয়ার কথা। পরে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে যখন তাঁর বিবাহ ঘটেছে তখন নিশ্চয়ই আরো কয়েকমাস সেই বয়সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অথচ সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর দীর্ঘ অনুসন্ধান শেষে (আটত্রিশ পরিচ্ছেদ) আত্মধিক্কৃতি প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বলেছেন, "নগেন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, সব তাঁরই দোষ। তাঁহাব তেত্রিশ বৎসরমাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছে।" নগেন্দ্রনাথের বয়শ তেত্রিশ কোন হিসাবেই হতে পারে না। কুন্দনন্দিনীর বয়সের উল্লেখ সূর্যমুখীর পত্রে সতের-আঠারো থাকলেও কুন্দনন্দিনীর বয়স যে তখন আঠারো নয় সতের মাত্র তার পরিচয় আমরা পরেও জানতে পারি। (আঠারো পরিচ্ছেদে) কুন্দনন্দিনী যখন গৃহত্যাগ করেন তখন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "সপ্তদশবর্ষীয়া, অনাথিনী সংসার সমুদ্রে একাকিনী।" সূযমুখীর পত্রে কুন্দনন্দিনীর সতের-আঠারো বয়সের উল্লেখ স্বাভাবিক এবং সঙ্গত হয়েছে। এতে কোন ত্রুটি দেখা দেয় নাই। কারণ সতের বছরের মেয়ে সম্বন্ধে বয়সের উল্লেখে সাধারণ ক্ষেত্রে সতের আঠারো লেখাই স্বাভাবিক। যেখানে সেই মেয়ে সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ের স্নেহ অত্যন্ত প্রবল সেখানে ষোল সতের বলা হয়। আর যেখানে তার সম্বন্ধে অন্তরের তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে তার বয়স একটু বেশী করে দেখা স্বাভাবিক। সূর্যমুখীর এই পত্রে কুন্দনন্দিনীর প্রতি একটি সপত্নী বিদ্বেষের পূর্বাভাষ অস্পষ্ট ভাবে আছে। কুন্দনন্দিনীর বয়স যে এখন সতের তা আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের লেখনী হতেই জানতে পারি (আঠারো পরিচ্ছেদ)।

এর পরে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রের বিবাহ হয়েছে, বিবাহের পর সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করেছেন, তারপর সূর্যমুখীর অনুসন্ধানে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর নগেন্দ্রনাথ কি করে ভাবতে পারেন যে তাঁর তেত্রিশ বৎসর বয়সে সবকিছু ফুরাইয়া গেল (আটত্রিশ পরিচ্ছেদ)। এই অবস্থায় নগেন্দ্রনাথের বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসরের কম ধরা চলে না।

কুন্দনন্দিনীর মাতা যখন কুন্দের স্বপ্নে প্রথম আবির্ভূত হন তখন তিনি হীরা দাসীর যে প্রতিরূপ কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়েছিলেন তাতে জানা যায় যে হীরার বয়স কুড়ির কাছাকাছি হবে (সপ্তম পরিচ্ছেদ)। কুন্দনন্দিনী যখন প্রথম বাস্তব জীবনে সূর্যমুখীকে দেখেন তখন চিন্তা করেন (সপ্তম পরিচ্ছেদ): "স্বপ্নদৃষ্টা স্ত্রী মূর্তি সুন্দরী কিন্তু সূর্যমুখী তাহার অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী। আর স্বপ্নদৃষ্টার বয়স বিংশতির অধিক বোধ হয় নাই—সূর্যমুখীর বয়স প্রায় ষড়বিংশতি। সূর্যমুখীর সঙ্গে সেই মূর্তির কোন সাদৃশ্য নাই দেখিয়া, কুন্দ স্বচ্ছন্দচিত্ত হইল।" কিছুক্ষণ পরেই এই পরিচ্ছেদেই হীরার সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। 'পদ্মপলাশ লোচনা শ্যামাঙ্গী' হীরার সঙ্গে স্বপ্নদৃষ্টার সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে কুন্দ ভীতিবিহ্বলা হন। সুতরাং হীরার বয়স কুন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎলগ্নে কুড়ির কাছাকাছি। এরপর তারাচরণের সঙ্গে তিন বৎসরের বিবাহিত জীবন অতিক্রান্ত ক'রে বিধবা কুন্দনন্দিনী দত্ত-পরিবারে আশ্রয় নেন। তখন তাঁর বয়স সতের আঠারো বছর বলে সূর্যমুখী কমলমণির নিকট পত্রে উল্লেখ করেন (একাদশ পরিচ্ছেদ)। এর পর যখন দত্ত পরিবারের মধ্যে হরিদাসী বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশে দেবেন্দ্রনাথ গান গাইতে আসেন তখন সূর্যমুখী সেই বৈষ্ণবী সম্বন্ধে সন্দেহপরায়ণ হয়ে হীরাদাসীকে সেই বৈষ্ণবীর অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। এই সময় হীরার বয়স চব্বিশ হওয়া উচিত। কারণ কুন্দনন্দিনী প্রথম যখন তাকে দেখেন তখন কুন্দের বয়স তেরো এবং এখন কুন্দের বয়স সতেরো। অথচ হীরার বয়ঃক্রম উল্লেখ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে বলেন (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ), "এক্ষণে হীরার বয়স বিংশতি বৎসর।" হীরার বয়স এই সময় বিংশতি বৎসর হতে পারে কি?

ঘটনাকালগত পরিকল্পনায় এই রকম দু'একটি ত্রুটি ব্যতীত চরিত্র চিত্রণেও কিছু কিছু অস্বাভাবিকত্ব লক্ষিত হয়। তারাচরণের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিবাহ হয় তেরো বৎসর বয়সে। তখন তারাচরণ ছাব্বিশ বৎসরের যুবক এবং গ্রামে মাষ্টারি করেন। তারাচরণের যৌবন এবং অবসর সময়ের প্রাচুর্যের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর তিন

বৎসরের বিবাহিত জীবন কেটেছে। সহস্র দিন ও রাত্রির মিলন রজনীর পর যুবতী কুন্দনন্দিনী মাত্র কয়েক মাসের বৈধব্যের মধ্যে তারাচরণকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন কি করে? (ষোড়শ পরিচ্ছেদে) বৈধব্যের অব্যবহিত পরে দত্তপরিবারে আশ্রয় গ্রহণকারী অবস্থায় কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্র-প্রেমমুগ্ধ। এই প্রেমমোহ যত স্বাভাবিকই হোক না কেন, মনে রাখতে হবে যে কুন্দনন্দিনীর মাত্র কয়েকমাস পূর্বে বৈধব্যদশা ঘটেছে এবং তেরো থেকে ষোল বৎসর পর্যন্ত উদ্ভিন্নযৌবনা কুন্দনন্দিনী যে যুবকের প্রেমবাহুবন্ধনের মধ্যে রতিস্বাদ আস্বাদন ক'রেছিলেন তাঁর স্মৃতি জলের আলপনার মত কোন ছাপ না রেখে মুছে গেছে! তা নইলে ষোড়শ পরিচ্ছেদে কুন্দনন্দিনী বৈধব্যের বৎসরেই যখন নগেন্দ্র-প্রেমমুগ্ধ তখন "কুন্দনন্দিনী মনের দুঃখে ভাবিতেছেন। কি ভাবনা ভাবিতেছেন? এইরূপ,—"ভালো, সবাই আগে মলো—মা মলো, দাদা মলো, বাবা মলো, আমি মলেম না কেন? যদি না মলেম ত এখানে এলাম কেন?" তারাচরণের সঙ্গে সহস্ররজনীর (তিন বৎসর) মিলন-বিরহের দীর্ঘ পালা কি ষোডশী কুন্দনন্দিনীর মনে ক্ষণকালের জন্যও তাঁর উদ্দেশ্যে আনমনা ভাবের সৃষ্টি করবে না? এই পরিচ্ছেদে কুন্দনন্দিনী আপনার বিড়ম্বিত ভাগ্যের জন্য সকলকেই স্মরণ করেছেন—মা, দাদা, বাবা। কিন্তু যে মানুষটির সঙ্গে দীর্ঘ তিন বৎসরের উদ্ভিন্ন-যৌবনের নিবিড়তম সংযোগ তার কোনও স্মৃতিই কি তাঁর মগ্নচৈতন্যের মধ্যেও থাকবে না? এখানে এবং পরেও তারাচরণ নামধেয় কোনও ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও কুন্দনন্দিনীর মনে কোনও ছায়াপাত করেনি। এ পরিকল্পনা কি স্বাভাবিক?

বিধবাবিবাহ ব্যাপারে কোন সংস্কারও যেন কুন্দনন্দিনীর মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করেনি। এটিকেও খুব স্বাভাবিক বলে মনে করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ যে বিধবাবিবাহ গ্রহণে তীব্র প্রতিবাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে কমলমণি বা শ্রীশচন্দ্রের মনে কোন ঘৃণার ভাব জাগ্রত হয়নি, এটিও আশ্চর্যের কথা। বরঞ্চ এই বিধবাবিবাহ চারিদিকে একটা 'ছি ছি' ও একটি নিন্দার প্রতিক্রিয়া তুলবে, আত্মীয়স্বজন ও দাস-দাসী মহলে একটা ঘোঁট পাকানো হবে, বন্ধুপত্নীর পুনর্বিবাহে রূপমুগ্ধ দেবেন্দ্রনাথ ফোড়ন কাটবেন—এইটিই স্বাভাবিক ছিল। অথচ কুন্দনন্দিনীর বিধবাবিবাহ না কুন্দনন্দিনীর জীবনে না চতুর্দিকে প্রসারিত বাঙালির অভ্যস্ত আদর্শের মধ্যে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

দেবেন্দ্রনাথ হরিদাসী বৈষ্ণবী রূপে কুন্দনন্দিনীর অভিসারে আসায় সূর্যমুখীর

মনে সন্দেহের ছায়াপাত হয়েছিল এবং তিনি তাঁর সন্ধানে হীরা দাসীকে পাঠিয়েছিলেন। হীরা যখন দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হয় তখন তিনি মদের ঝোঁকে 'হীরামালিনী, রাধা, কুব্জা,' ইত্যাদির গান গাচ্ছিলেন। সেই সময় হীরার নাটকীয় প্রবেশ। ঘটনাটি নাটকীয় চমৎকারপূর্ণ হলেও আমাদের বিশ্বাসবোধকে পীড়িত করে। দেবেন্দ্রবাবু কুন্দনন্দিনীকে 'রাধা' বলে উল্লেখ করে (নবম পরিচ্ছেদে) কীর্তন গান গেয়েছিলেন :—

'শ্রীমুখ পঙ্কজ—দেখব বলে হে ;
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে ॥'

রাধার কুঞ্জ অর্থাৎ নগেন্দ্র দত্তের বাড়ী। সেখানে হীরাদাসী থাকে। সেই হীরা দাসীর আবির্ভাবের মুহূর্ত পূর্বেই (সপ্তদশ পরিচ্ছেদে) দেবেন্দ্রের গান—

'আমার নাম হীরামালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে ;
কুব্জা আমার ননদিনী।'

একটু অস্বাভাবিক ঠেকে। পরমুহূর্তে হীরার প্রবেশ……হীরাকর্তৃক আত্মপরিচয় দান এবং সঙ্গে সঙ্গে হীরাকে প্রণাম ক'রে মত্ত অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের গ্লাস হস্তে সংস্কৃতে স্তব সুন্দর হলেও স্বাভাবিক কি? যে-পরিমাণ সংস্কৃত জ্ঞান থাকলে দেবেন্দ্রের পক্ষে, "যা দেবী দত্তগৃহেষু হীরারূপেণ সংস্থিতা" বলে স্তব রচনা করা যেতে পারে এবং মদ্যপানের আকস্মিক প্রেরণায় হীরা-স্তব হ'তে পারে তা কতখানি স্বাভাবিক, বিচার্য। 'সধবার একাদশী'তে যে নিমচাঁদকে আমরা লক্ষ্য করি তার পিছনে মার্জিত রুচি ও বৈদগ্ধ্যের পটভূমিকা ছিল। তাই নিমচাঁদের পক্ষে যে ধরণের সংলাপ বা সঙ্গীত স্বাভাবিক ও সংগত দেবেন্দ্রবাবুর পক্ষে তা কতখানি স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠতে পারে।

দেবেন্দ্রবাবুর সংস্কৃত জ্ঞানের সঙ্গে আমরা হীরার সংস্কৃত জ্ঞানেও বিস্মিত হই। শেষদৃশ্যে আমরা উন্মাদিনী হীরাকে বলতে শুনি, "একদিন এই ঘরে বসিয়া আমার এই পা ধরিয়া গাহিয়াছিলে—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

হীরার পক্ষে এই ঘটনা মনে থাকা খুবই স্বাভাবিক, কেননা দেবেন্দ্রবাবুর মত রূপবান

জমিদার-তনয় যখন একটি দাসীর চরণ ধরে গান সুরু করেন তখন কোন দাসীর পক্ষে সেটা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যে অসামান্য সংস্কৃত জ্ঞান ও নির্ভুল ব্যাকরণবোধ থাকলে একবার শ্রুত 'গীতগোবিন্দম্'-এর ঐ অংশটি নির্ভুল ভাবে উদ্ধার করে উন্মাদিনী অবস্থায় গান গাওয়া সম্ভব হীরার ন্যায় সামান্য দাসীর পক্ষে তা স্বাভাবিক কি ?

এই গ্রন্থের দুর্বলতম অংশ কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নদর্শন। নিয়তির অপ্রতিরোধনীয় শক্তি প্রদর্শন করবার জন্য এবং ভাবী ঘটনার পূর্বাভাষ প্রদানের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বপ্নের অবতারণা করেছেন তা সামাজিক উপন্যাসের পক্ষে কতখানি স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় তা বিচার্য। স্বাভাবিকতার প্রশ্ন ওঠে এইজন্য যে, কুন্দনন্দিনীর মাতা, নগেন্দ্র ও হীরার যে দুটি চরিত্রের প্রতিকৃতি কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নে উন্মোচন করেন কুন্দ স্বপ্নের পূর্বে তাদের কখনও দেখেন নি। স্বপ্নকে নিছক একটি অলৌকিক বস্তু হিসাবে সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে সন্নিবেশিত করা বাস্তব বোধের উপর পীড়ন মাত্র। কপালকুণ্ডলার স্বপ্নের সঙ্গে কপালকুণ্ডলা চরিত্রের যোগ ছিল। এখানে কুন্দের চরিত্রের কোন অবদমিত ইচ্ছার সঙ্গে স্বপ্নের বিন্দুমাত্র যোগ নেই। এই স্বপ্নদৃশ্যটি নিছক বাহ্য বৈচিত্র্য বৃদ্ধির উপায় রূপে গৃহীত হয়েছে—যা সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে খুব সঙ্গত নয়। এই স্বপ্নদর্শনটি উপন্যাস ক্ষেত্রে কতখানি প্রয়োজনীয় তা'ও বিচার্য। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে নিয়তিব অমোঘ বিধান প্রদর্শনই যদি লেখকের উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে তাহলে মানতেই হবে যে কুন্দনন্দিনী, নগেন্দ্র ও হীরার পরিণতি পূর্ব হ'তেই সুনির্দিষ্ট। এক্ষেত্রে সকলেই নিয়তির হস্তের ক্রীড়নক মাত্র। এই নিয়তিবাদ প্রচার ক'রতে গিয়ে বঙ্কিমের নীতিবাদ প্রচার কিছুটা গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। কেননা নিয়তিকৃত বিধান বশতঃই কুন্দনন্দিনীর রূপতৃষ্ণায় নগেন্দ্রনাথের চিত্তবিকার যদি অবশ্যম্ভাবী হয় তাহলে তার জন্য কুন্দ বা নগেন্দ্রকে দোষী বলা যায় না। সে ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অসংযম-জনিত বিষবৃক্ষের উদ্ভব ও পরিণতির বিষয়ে যদি কারুর প্রতি দোষ দেবার থাকে তো দোষ দিতে হয় স্বয়ং বিধাতাপুরুষকে। কেননা এ সকল ঘটনা নগেন্দ্রনাথের অসংযত চিত্তের অনিবার্য পরিণতি নয়, নিয়তিকৃত পূর্বপরিকল্পনার প্রত্যক্ষগোচর ফলশ্রুতি মাত্র। সুতরাং কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শন সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে স্বাভাবিকত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কোন দিক থেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যায় না।

'বিষবৃক্ষ কি' এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা (ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ) প্রবন্ধের

বিষয়বস্তু হ'তে পারে কিন্তু কোন উপন্যাসের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদব্যাপী হিতোপদেশমূলক বিচার-বিশ্লেষণ সুন্দর নয়। 'উপন্যাস' যে-শ্রেণীর আখ্যায়িকা তা সংলাপ ও বর্ণনামুখর গতিচিহ্নিত চরিত্র ও ঘটনার প্রতিক্রিয়া মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের ভূমিকারূপে 'বিষবৃক্ষ কি' এ-বিষয়ে যদি আলোচনা করতেন তাহ'লে অগ্রগতি ও চরিত্রবিকাশ কিছুক্ষণের জন্য হিতোপদেশের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হত না।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল বিরোধী সমালোচনার দ্বারা এটি মনে করা উচিত হবে না, যে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের অসামান্য গুরুত্ব সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধার অভাব আছে। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যে একটি বিস্ময়জনক উপন্যাস বলে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর সঙ্গে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে গ্রহণ করেছি বলেই এতক্ষণ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাগত ত্রুটি ও অসঙ্গতির আলোচনা করা হল। এইবার আমার বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস কি অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক তার আলোচনা করা যাক।

প্রতিভার ক্রমবিকাশে স্থান কাল-পাত্র-রচনারীতি

পূর্ববর্তী সকল উপন্যাস অপেক্ষা 'বিষবৃক্ষ' স্বতন্ত্র শ্রেণীর। এই উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমপ্রতিভা কিভাবে বিকশিত হয়ে চলেছে তা স্পষ্টরূপে বুঝতে প্রথমে আমরা আখ্যায়িকার **ঘটনাকালগত বিচার** করি। কালগত পরিকল্পনায় বিভিন্নতা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ঘটনাকাল মানসিংহের কাল অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী। 'কপালকুণ্ডলা'র ঘটনাকাল জাহাঙ্গীরের কাল অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে এবং পূর্ববর্তী কাহিনীর ('দুর্গেশনন্দিনী'র) পরবর্তী কাল। 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র যবন-আগমন কাল অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফিরে গেছেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কাহিনীর ঘটনাকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। এখানে আমরা দেখতে পাই যে সূর্যমুখী ১৯১০ সম্বৎসরে অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ('ইষ্টদেবতা স্বামী স্থাপনার জন্য এই মন্দির") শয়নমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সূর্যমুখী কর্তৃক বিদ্যাসাগরের উল্লেখও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। ঘটনার কালগত বিচারে বঙ্কিমচিত্ত অতীত বাংলা দেশের কাল্পনিক পটভূমিকা থেকে একেবারে সমস্যা-সমাকীর্ণ বর্তমান পটভূমিতে প্রাগ্রসরণ করেছে।

চরিত্রের নামকরণে বঙ্কিমচন্দ্র এস্থলে বিশিষ্ট পরিকল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে ফুলের দ্বারা অধিকাংশ নারী চরিত্রগুলির নাম এবং শব্দান্তে 'ইন্দ্র' পদ যোগে পুরুষের নাম গঠিত করেছেন। 'বিষবৃক্ষ'-গ্রন্থে পুষ্পনামযুক্ত নারী-চরিত্রগুলি

হল সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, চাঁপা (কুন্দের সঙ্গিনী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), কমলমণি, কুমুদ (এই নামে যে একটি নতুন দাসী রাখা হয়েছে তা সূর্যমুখীর পত্রে একাদশ পরিচ্ছেদে জানা যায়) ও মালতী (বিংশ পরিচ্ছেদ)। পুরুষ-চরিত্রগুলির নাম নগেন্দ্র, দেবেন্দ্র, সুরেন্দ্র প্রভৃতি। পুষ্পনামধারী প্রধান চরিত্রের মধ্যে সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী নাম দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এই উপন্যাসে ঘটনাস্থলই কেবল বাস্তব সূর্যালোকে প্রদীপ্ত বর্তমান পৃথিবী নয়, ঘটনাকালও স্পষ্ট। প্রত্যেকটি **চরিত্রের বয়ঃক্রম** স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত। প্রথম আবির্ভাব মুহূর্তে নগেন্দ্র তিরিশ, কুন্দ তেরো, সূর্যমুখী ছাব্বিশ, হীরা কুড়ি, কমলমণি আঠারো। চারি বৎসর বাদে যখন কুন্দনন্দিনীকে আবার দেখা যায় তখন কুন্দের বয়স সতের, দেবেন্দ্রের বয়স পঁচিশ (দশম পরিচ্ছেদ), সুরেন্দ্র সমবয়স্ক অর্থাৎ পঁচিশ, মালতী গোয়ালিনীর বয়স তিরিশ-বত্রিশ ও সতীশের এক বৎসর বয়স। কুন্দনন্দিনীর দ্বিতীয় স্বপ্নদর্শন যে প্রথম স্বপ্নদর্শন হতে চার বছর বাদে ঘটেছিল তা বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। কালপরিকল্পনার স্পষ্টতা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

কালগত স্পষ্টতার সঙ্গে **স্থানগত স্পষ্টতাও** 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। 'দুর্গেশনন্দিনী'র গড়মান্দারণ কিছুটা অচিনপুরের প্রান্তবর্তী দেশ। তার চারিপাশের বর্ণনা আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট বাস্তব পৃথিবীর চিত্র আঁকে না। 'কপালকুণ্ডলা'র অরণ্যপ্রদেশ আমাদের অপরিচিত দেশ। কপালকুণ্ডলার স্বামীগৃহ যে বাস্তব পৃথিবীর কোণে সমাজের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত, সে সমাজ বা নগরের চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র দেন নি। বরঞ্চ সেই সমাজ বা নগরের সামনে কপালকুণ্ডলা, কাপালিক এবং মতিবিবি প্রভৃতি এমন কয়েকটি চরিত্র উপস্থাপিত করেছেন যারা সংসারের বাস্তব রূপকে প্রায় সবটুকু আড়াল করে রেখেছে। 'মৃণালিনী'র স্থান পরিকল্পনা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' গ্রন্থে আমাদের পরিচিত সংসারের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ ও সাধারণ জীবনযাত্রা বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিম্লান কিরণসম্পাতে শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত হয়ে উঠেছে। নগেন্দ্রনাথ নদীপথে যে নৌকারোহণে চলেছিলেন তার চারিপাশের গ্রাম প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দত্ত বাড়ীর যে বৃহৎ প্রাসাদ মহলের পর মহলে বিভক্ত তার স্পষ্ট চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন (সপ্তম পরিচ্ছেদ)। সাধারণ মানুষ যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত তাদের আলাপ আলোচনা জীবনধারণ ও দৃষ্টিভঙ্গীর

দেখাচ্ছেন, জানকীও কত প্রেমভবে দেখছেন। একদিন সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথের জীবনে এই ধবণেব গভীব প্রেম ছিল। সীতাব পতিসর্বস্বতা সূর্যমুখীব ভিতরেও ফুটেছে। তিনি পতিব সুখেব জন্য পতিকে কুন্দনন্দিনীব হাতে তুলে বিদায় নিয়েছেন। এই চিত্রদর্শনে নগেন্দ্রনাথেব চিত্ত আত্মধিক্কাবে হয়ত পূর্ণ হয়েছিল।

'সাগবিকা' ও 'শকুন্তলা' চিত্রদ্বয় প্রাগবিবাহ প্রেম প্রকাশিত করেছে। উমা-মহাদেবেব চিত্রও এই প্রসঙ্গে স্মবণযোগ্য। কিন্তু এই সকল চিত্রকে ঠিক অবৈধ বলা যায না। এই তিনটি নাবীই ঐ সকল প্রেমাস্পদেব সহিত মিলিত হয়েছেন। সুতবাং এই সকল চিত্র প্রাগবিবাহ প্রেমেব হলেও এই সকল পূর্ববাগ-চিত্রেব ভিতব প্রকাশ পেয়েছে ভাবী পতিব প্রতি পত্নীব বিবিধ ভাব। উমা-মহাদেবেব চিত্রে পত্নীব পতিবন্দনা ও ভক্তি, 'সাগবিকা বেশে বত্নাবলী' চিত্রে বিপ্রলব্ধা নাবীর অন্তবেব গভীব ক্ষোভ ও দুঃখ, 'শকুন্তলা' চিত্রে প্রিয়দর্শনলালসা কাল্পনিক কুশাঙ্কুব মুক্তি হতে প্রকাশিত হয়েছে। সূর্যমুখীব পতিবন্দনা ও ভক্তি নগেন্দ্রনাথেব অন্তরে গভীব ভাবে মুদ্রিত। প্রিয়দর্শন ও মিলনাকাঙ্ক্ষাতে সূর্যমুখীব অন্তব যে নগেন্দ্রনাথেব জন্য কত ব্যাকুল হত তা নগেন্দ্রনাথেব অজ্ঞাত নয। 'সাগবিকা'ব আত্মহত্যাব সঙ্গে সূর্যমুখীব আত্মত্যাগেব কিছুটা সাদৃশ্য আছে। বিশেষতঃ 'সাগবিকা' বাণী 'বাসবদত্তা'ব সঙ্গে প্রেমেব প্রতিযোগিতায নেমেছিলেন বাজাকে নিয়ে এবং বাণীব নিকট অপমানিত হবাব লজ্জায আত্মহত্যা কবতে যাচ্ছেন। সূর্যমুখীও কুন্দনন্দিনীব সঙ্গে প্রেমেব প্রতিযোগিতায হেবে নগেন্দ্রনাথকে কুন্দেব হাতে তুলে দিয়ে আপন প্রাণ বলি দিয়েছেন। আবাব নগেন্দ্রনাথ জেনেছেন যে সূর্যমুখী দুঃখ বেদনাতে নিরুদ্দিষ্টা হয়ে আগুনে (দবপুড়ে) মাব গেছেন। নগেন্দ্রনাথ এই সকল চিত্র দেখে ভাববিহ্বল হয়ে পড়লেন। সূর্যমুখীব প্রেম ও ভক্তিব ব্যঞ্জনা কেবল চিত্রগুলিব মধ্যেই ফুটে উঠেনি। 'সত্যভামাব তুলাব্রত' চিত্রেব নিচে সূর্যমুখীব স্বহস্তলিপি "স্বামীব সঙ্গে সোনা রূপাব তুলা?" এবং ১৯১০ সম্বৎসবে প্রতিষ্ঠিত এই শযনগৃহে সূর্যমুখীব হস্তাক্ষব "১৯১০ সম্বৎসবে ইষ্টদেবতা স্বামীব স্থাপনা জন্য তাঁহাব দাসী সূর্যমুখী কর্তৃক এই মন্দিব প্রতিষ্ঠিত হইল"—সূর্যমুখীব আদর্শ প্রেম ও ভক্তিব চিব-অম্লান প্রকাশ হয়ে ফুটে আছে। নগেন্দ্রনাথ যেদিকে চান সূর্যমুখীর চিহ্ন চতুর্দিকে দেখতে পান। তাঁর মনে এল সুভদ্রাব অনুকবণে সারথ্যকার্যে সূর্যমুখীর লজ্জাবিড়ম্বিত মধুব ঘটনাটিব কথা। একবার দোলে নগেন্দ্রনাথের

দিকে সূর্যমুখী কুঙ্কুম নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত কুঙ্কুম দেওয়ালকে সূর্যমুখীর অনুরক্তিতে আজও রক্তাভ করে রেখেছে।

চিত্রদর্শনে উজ্জীবিত অনুরাগ নগেন্দ্রনাথ আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি "ভূয়োভূয়ঃ অচেতন আসনকে চুম্বনালিঙ্গন করিতে লাগিলেন" সূর্যমুখী বোধে। "চক্ষের জলে দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ লোপ পাইতে লাগিল"। বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের প্রেমব্যাকুল হৃদয়ের চিত্র ফোটাতে গেয়ে কালিদাসের বিরহী যক্ষের বর্ণনাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছেন। কালিদাসের যক্ষও বিরহে ব্যাকুল হয়ে মেঘকে দূত পাঠাবার কালে চেতন অচেতনের বিচার করে নি। তাই কালিদাস বলেছেন যে, 'কামার্ত লোকেরা চেতন অচেতনের বিচার করে না' ("কামার্তাঃ হি প্রকৃতি-কৃপণাঃ চেতনাচেতনেষু"), আর কালিদাসের যক্ষ বিরহ-ব্যাকুল হয়ে প্রিয়ার চিত্র যতবার দেখতে গেছে ততবারই অশ্রুসজল দৃষ্টি তার প্রিয়ামুখদর্শনকার্যে বারংবার ব্যাঘাত করেছে ('ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্ আত্মানং তে চরণপতিতং যাবৎ ইচ্ছামি কর্তুম্। অস্রৈঃ তাবৎ মুহুঃ উপচিতৈঃ দৃষ্টিঃ আলুপ্যতে মে'—ইত্যাদি)। বঙ্কিমচন্দ্রের 'স্তিমিত প্রদীপে' রচনাতে প্রাচীন সাহিত্যপ্রীতি এইপ্রকার সুন্দবভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার পুরাতন সাহিত্যপ্রীতিই কেবল নহে তিনি নূতন সাহিত্যসৃষ্টিও করেছেন। এ অংশে নগেন্দ্রনাথের চিত্তবিশ্লেষণ, সূর্যমুখীর চিত্তবিশ্লেষণ সুন্দরভাবে করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর রচিত 'আলেখ্যদর্শনে'র সঙ্গে এই বিষয়ে 'স্তিমিত প্রদীপে'র আলোচনা করা যায়। মনে হয়, যে চিত্ত-বিশ্লেষণ ও পুরাতন সাহিত্যপ্রীতি বিদ্যাসাগরের আলেখ্যদর্শনে অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল তা বঙ্কিমচন্দ্রে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে।

'স্তিমিত প্রদীপে' ও 'দীপনির্বাণ' পরিচ্ছেদ দুটির মধ্যে আরও সাঙ্কেতিকতা আছে। 'দীপনির্বাণ' পরিচ্ছেদে কুন্দনন্দিনীর ভাঙাঘরে কেবল মাটির প্রদীপটি নিবে যায় নি। তাঁর পিতার জীবনদীপও নির্বাপিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের 'ওথেলো' নাটকের "put out the light and put out the light"-এর কথা মনে পড়ে যায়। 'স্তিমিত প্রদীপে' পরিচ্ছেদে বাইরে যে ঝড় ঝঞ্ঝা তা কেবল প্রকৃতির ঝঞ্ঝা নয়, নগেন্দ্রনাথের চিত্তাকাশেও সেদিন বাত্যাবিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। সেদিন ঝড় ঝঞ্ঝার অবসানে প্রকৃতিতে হয়েছে অরুণোদয়, অপরদিকে সমস্ত কুহেলিকার অপসারণ করে জ্যোতির্ময়ী সুন্দরী সূর্যমুখীর আবির্ভাব ঘটেছে।

কুন্দনন্দিনীর গৃহত্যাগের রাত্রেও আকাশ ভেঙে যে বৃষ্টি এসেছিল সে তার চিত্ত-আকাশের প্রতিরূপ মাত্র। এই সকল বর্ণনা আমাদের King Lear নাটকের কথা স্মরণে আনে।

পূর্ববর্তী উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের **রচনারীতিতে** যে সংস্কৃতের ঘনঘটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতিভাত হত তা বিষবৃক্ষের মধ্যে সহজ সরল সরস বাংলাকে পথ ছেড়ে দিয়েছে। অল্প দুএকটি স্থলে সংস্কৃতের শব্দাড়ম্বর আছে। যেমন—

"আকাশে মেঘাড়ম্বর কারণ রাত্রি প্রদোষ কালেই ঘনান্ধতমোময়ী হইল······ গর্জন বিরত শ্বেতকৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী······কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষে জলমোচনার্থ পক্ষবিধূনন শব্দ"।

অন্যত্র চমৎকার আধুনিকধর্মী বাংলায় প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা, যেমন :—

"পরে একদিন আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘে আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কালো হইল, গাছের মাথা কটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল।"

সপ্তম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথ দত্তের গৃহের বর্ণনা স্বাভাবিক, সুন্দর, সরল ও বিশ্লেষণধর্মী। বাহিরের বর্ণনার সঙ্গে হৃদয়ের বর্ণনার চমৎকার চিত্ররূপে আমরা নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি ;—

(ক) তবে কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন ?' স্বচ্ছ বারি—শীতল জল—নীচে নক্ষত্র নাচিতেছে—কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন ?

(খ) এ স্বর্গ প্রেম ও বাসনার সৃষ্টি। "সূর্যমুখী কোথাও নাই" একথা সহ্য হয় না—"সূর্যমুখী স্বর্গে আছেন"—এ চিন্তায় অনেক সুখ।

(গ) কেহ কোন কথা বলিলেন না—কত রোদন করিলেন। রোদনে কি সুখ !

বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে গদ্যরীতিতে ফার্সী, ইংরাজী ও সংস্কৃত এই তিন ধরণের ভাষাই সংমিশ্রিত করেছেন। যেমন ফার্সী-মিশ্রিত বাংলা গদ্য—

সূর্যমুখী নালিশী আর্‌জি মোলাহেজা করিয়া, বিহিত বিচার করিলেন।

ইংরাজী-মিশ্রিত বাংলা গদ্যের নমুনা—

তখন ভৃত্যহস্তে, তৃণপটাবৃতা বোতলবাহিনীর আবির্ভাব হইল।···দ্রবময়ী মহাদেবী ডেকাণ্টর নামে আসুরিক ঘটে সংস্থাপিতা হইলেন। কট্‌ গ্লাসের কোষা পড়িল ; প্লেটেড্ জগ্ তাম্রকুণ্ড হইল ; এবং পাকশালা হইতে এক কৃষ্ণকূর্চ পুরোহিত হট্‌ওয়াটার-প্লেট নামক দিব্য পুষ্পপাত্রে রোষ্ট্‌মটন্‌ এবং

কট্‌লেট্‌ নামক সুগন্ধ কুসুমরাশি রাখিয়া গেল। তখন দেবেন্দ্র দত্ত, যথাশাস্ত্র ভক্তিভাবে, দেবীর পূজা করিতে বসিলেন।

পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত হতে শব্দ গ্রহণ করেছেন ভাষা গাম্ভীর্যের জন্য। এখানে কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃত হতে শব্দ গ্রহণ করে বা সংস্কৃতের আদর্শে আরবী ফার্সীকে পুনর্গঠিত ক'রে ('হুঁক্কা' 'আলবোলা' প্রভৃতি শব্দকে আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 'লতা'র ন্যায় রূপান্তরিত ক'রে) হাস্যরস সৃষ্টি ক'রেছেন। যেমন—

হে হুঁক্কে! হে আলবলে! হে কুণ্ডলাকৃতধূমরাশিসমুদ্গারিণি! হে ফণিনীনিন্দিতদীর্ঘনলস'সর্পিণি! হে রজতকিরীটমণ্ডিতশিরোদেশসুশোভিনি! কিবা তোমার কিরীটবিস্রস্ত ঝালর ঝলঝলায়মান! কিবা শৃঙ্খলাঙ্গুরীয় সম্ভূষিত বক্রাগ্রভাগমুখনলের শোভা! কিবা তোমার গর্ভস্থ শীতলাম্বুরাশির গভীর নিনাদ! হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী, অলসজনপ্রতিপালিনী, ভার্যাভর্ৎসিতজনচিত্তবিকারবিনাশিনী, প্রভুভীতজনসাহসপ্রদায়িনী! মূঢ়ে তোমার মহিমা কি জানিবে?

হাল্কা পরিহাসের বিশিষ্ট নমুনারূপে আমরা নীচের অংশ উদ্ধৃত করছি:—

এক্ষণে গ্রাণ্ট-ইন-এডের প্রভাবে, গ্রামে গ্রামে তেড়িকাটা, টপ্পাবাজ নিরীহ ভালমানুষ মাষ্টারবাবুরা বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু তৎকালে সচরাচর "মাষ্টারবাবু" দেখা যাইত না। সুতরাং তারাচরণ একজন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়া উঠিলেন।......মুখে সর্বদা বলিতেন, "তোমার ইটপাটকেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জ্যেঠাইয়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখা-পড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।" স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবরালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশূন্য।

বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও ব্রাহ্ম ধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির আমরা প্রশংসা করতে না পারলেও তাঁর তীক্ষ্ণ পরিহাস রসবিচারে বিশেষ উপভোগ্য। আমরা উপরের উদ্ধৃতিটির সঙ্গে নীচের উদ্ধৃতিটি উপস্থাপিত করলাম:—

কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রিফরমর্ বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন। তারাচরণ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম জুটিল; বক্তৃতার আর সীমা রহিল না। একটা ফিমেল স্কুলের জন্যও

> মধ্যে মধ্যে আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশী করিতে পারিলেন না। বিধবা বিবাহে বড় উৎসাহ। এমন কি, দুই চারিটা কাওরা তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু সে বরকন্যার গুণে। জেনানারূপ কারাগারের শিকলভাঙ্গার বিষয় তারাচরণের সঙ্গে তাঁহার এক মত—উভয়েই বলিতেন, মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রবাবু বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছিলেন—কিন্তু সে বাহির করার অর্থ বিশেষ।

বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থে কিভাবে একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ ক'রে কবিতার ন্যায় শ্রুতিমনোহর হয়ে উঠেছে তার পরিচয় আমরা পূর্বেই দিয়েছি। এখানেও দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে অনুরূপ ধ্বনিমাধুর্য। নিম্নোদ্ধৃত অংশটির রচনারীতিতে গদ্যের অভ্যন্তরে একটি বিশিষ্ট ধরণের মিল দেখুন:—

> তাহার হাতে শিকল নড়িলে বলে, "কট্ কট্ কটাং, তোর মাথামুণ্ড উঠা! কড়্ কড়্ কড়াং! খিল খোল নয় ভাঙ্গি ঠ্যাং।" তা ত শিকল বলিল না। এ শিকল বলিতেছে, "কিট্ কিট্ কিটি! দেখি' আমার কেমন হীরেটি। খিট্ খাট্ ছন! উঠ্‌লো আমার হীরা মন! ঠিট্ ঠিট্ ঠিঠি ঠিনিক—আয়রে আমার হীরা মাণিক।"

বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য অন্যত্র এক ধরণের ক্রিয়াপদ বা শব্দসমষ্টির পুনরাবৃত্তির দ্বারা আভ্যন্তরীণ অনুপ্রাসযুক্ত। এ অনুপ্রাস গানের ধূয়ার মত ঘুরে ঘুরে আসে··· কবিতার মত মিলের আভাস এনে গদ্যের মধ্যে ছন্দোমাধুর্য সৃষ্টি করে। গদ্যের পংক্তিগুলি কবিতার আকৃতিতে সন্নিবেশিত করা হ'ল—

> কুন্দ চলিল, চলিল—কেবল চলিল।
> আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল—
> মেঘ সকল একত্র হইয়া আকাশেও রাত্রি করিল—
> বিদ্যুৎ হাসিল—
> আবার হাসিল—
> আবার! বায়ু গর্জিল,
> মেঘ গর্জিল—
> বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গর্জিল।
> আকাশ আর রাত্রি একত্র হইয়া গর্জিল।

অন্যত্র দেখুন—

বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে আছে। তাহার জন্য নয়।

তবে কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন?

স্বচ্ছ বারি—শীতল জল—নীচে নক্ষত্র নাচিতেছে—

কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন?

প্রতিভার ক্রমবিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রশেখর

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি হাল্কা ধরণের গল্প রচনা করেন। সে গল্পগুলি হ'ল 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) এবং 'রাধারাণী' (১৮৭৩)। এই তিনটি রচনাই ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'উপকথা'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেন। আবার ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এইগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস রূপে রাজসিংহের সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' গ্রন্থ বর্তমানে যেভাবে প্রচলিত তা প্রথম সংস্করণ হ'তে ভিন্ন না হলেও অনেকাংশে বর্ধিত ও নূতন রচনা। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস আলোচনার পূর্বে কালানুক্রমিক বিচারে আমাদের এই আখ্যায়িকাগুলি নিয়ে আলোচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু

(ক) বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনাগুলি ঠিক উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সেকথা বুঝেছিলেন, তাই 'উপকথা'-মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ক'রে পরবর্তী কালে প্রকাশ ক'রেছিলেন। এইগুলি ঠিক উপকথা না হলেও উপন্যাসের বাস্তবতা ও রূপকথার মধ্যবর্তী রচনা।

(খ) 'ইন্দিরা'র পরিবর্ধিত সংস্করণ উপন্যাস হওয়ার দাবী রাখে বটে কিন্তু সেই সংস্করণ অনেক পরবর্তী কালের। তাই আমরা 'বিষবৃক্ষ' গ্রন্থের পরেই বর্তমান পরিচ্ছেদে 'চন্দ্রশেখর' বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

বঙ্কিমের মন স্বভাবতঃ অতীতচারী। পূর্ববর্তী রচনাসমূহে একমাত্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে তিনি বর্তমান জীবন ও সমস্যার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ছিলেন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমের সেই অতীতচারী মন আবার ফেলে আসা যুগের মধ্যে কাহিনীর বিন্যাস করেছে। গৃহপ্রান্তে সংসার-সীমার মধ্যে যে অবৈধ প্রেম আমাদের শান্ত জীবনাদর্শকে বারে বারে বিপর্যস্ত করে, অতীতের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সেই চিরন্তন কালের সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। বাল্যপ্রণয়ের , পারস্পরিক নিবিড় আকর্ষণ বিবাহোত্তর জীবনের মধ্যেও কিরূপ অসামাজিক সঙ্গলোলুপতাকে জাগ্রত করে এবং কি ভাবে নারী তার গৃহধর্ম ও বিবাহিত জীবনের সমস্ত বন্ধনকে অস্বীকার ক'রে

সেই দুর্নিবার প্রেমের টানে সমাজ-সংসারের সমস্ত আহ্বান ও নিষেধকে অস্বীকার করে—'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তারই একটা চিত্র দিয়েছেন।

কাহিনী—শৈবলিনী ও প্রতাপ শৈশব কৈশোরের ক্রীড়া-চঞ্চলতার মধ্য হ'তে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সে আকর্ষণ একদিন এমন তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং সেখানে পারস্পরিক মিলনের ক্ষেত্রে সামাজিক বিধিনিষেধ এত দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছিল যে বারো বছরের শৈবলিনী এবং বিশ বছরের প্রতাপ গঙ্গায় আত্মবিসর্জনের দ্বারা নবজন্মে চিরমিলনের ব্যবস্থা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। সেদিন প্রতাপের বীর হৃদয় আত্মবিসর্জনে কুণ্ঠিত হয় নি। প্রেমিকা শৈবলিনীর মধ্যে যে দুর্বল দ্বিধাগ্রস্ত শঙ্কিত বালিকাটি ছিল সে জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে পারেনি। চন্দ্রশেখর উদ্ধার করেছিলেন জলমগ্ন প্রতাপকে এবং বত্রিশ বছরের চন্দ্রশেখর বারো বছরের শৈবলিনীকে সেদিন বিবাহ ক'রেছিলেন। চন্দ্রশেখর জ্ঞানী পণ্ডিত, কিন্তু প্রেমিক নন। তাঁর নিরুত্তপ্ত শান্ত জীবনের মধ্যে ব্রহ্মচর্য ও ঐকান্তিক অধ্যয়ন শৈবলিনীর প্রতি তাঁর মনকে যৌবনচঞ্চলতায় পরিপূর্ণ হতে দেয়নি। আখ্যায়িকা আরম্ভের মুহূর্তে দেখি শৈবলিনীর বিবাহিত জীবন আট বৎসর অতিক্রান্ত। এদিকে তাঁর বিশ বছরের যৌবন, ওদিকে চল্লিশ বছরের পরিণত স্বামী চন্দ্রশেখর। একদিকে প্রেম-পিপাসায় পরিপূর্ণ নারীচিত্ত, অন্যদিকে স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, বিষয়-বিরক্ত, জ্ঞান-চর্চানিরত চন্দ্রশেখর। শৈবলিনীর চিত্ত পিপাসায় পরিপূর্ণ। চন্দ্রশেখরের মনে কোন আবেগ নেই, বাহিরে প্রেমের প্রকাশ নেই। তিনি কেবল আপন অভ্যস্ত জীবনাদর্শের মধ্যে সার্থকতার সন্ধান করে চলেছেন। শৈবলিনীর সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলও নেই, প্রেমের উদ্দীপনাও নেই। শৈবলিনী তাঁর সংসার-যন্ত্রের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তাঁর একমাত্র কাজ রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, অধ্যয়নীয় গ্রন্থগুলিকে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করা। শৈবলিনীর অনাদৃত যৌবনের অন্তরালে যে বুভুক্ষিত মনটি ছিল তা বর্তমান জীবনের ব্যর্থতায় ও অতীত ব্যর্থপ্রণয়ের বেদনায় পরিপূর্ণ। এই কঠোর কর্তব্যে ভরা সংসার থেকে তাঁর যৌবন মুক্তি চায় এবং তাঁর মন অনিবার্য ভাবেই প্রতাপের সঙ্গে বাল্যক্রীড়াচঞ্চল আনন্দের মুহূর্তগুলি, প্রতাপের অতুলনীয় রূপরাশি ও যৌবনসমৃদ্ধ জীবনের কথা স্মরণ করে। চন্দ্রশেখরের নির্বিকার ঔদাসীন্য ও নির্বিচার উপেক্ষা এই আট বছরের বিবাহিত জীবনকে শৈবলিনীর কাছে বিষাদ ও বেদনার্ত করে তুলেছে। এই হ'ল কাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা।

চন্দ্রশেখরের যে গ্রামে বাস সেই গ্রামেরই এক সম্পর্কিত ভগিনীর সঙ্গে চন্দ্রশেখর,

প্রতাপের বিবাহ দিয়েছেন। প্রতাপের স্ত্রীর নাম রূপসী ও শ্যালিকার নাম সুন্দরী। চন্দ্রশেখরের ভগিনীস্থানীয়া সুন্দরীর সঙ্গে শৈবলিনীর সখীত্ব। একদিন তিনি পুকুর-ঘাটে স্নান করতে গেছেন, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, এমন সময় তীরে লরেন্স ফষ্টরের আবির্ভাব ঘটল। জুজুর নামে যেমন ছেলেরা ভয় পায় তেমনি ভয় পেয়ে সুন্দরী ঠাকুরঝি চলে গেলেন। আর শৈবলিনী জলের মধ্যে আরও একটু নেমে দাঁড়ালেন। লরেন্স ফষ্টরের সঙ্গে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পরে তিনি যখন রাত্রি করে বাড়ী ফিরলেন তখনও চন্দ্রশেখর পাঠনিরত। শৈবলিনী শঙ্কিত ছিলেন, চন্দ্রশেখর তাঁকে কিছু বলবেন। কিন্তু শৈবলিনীর বিলম্ব চন্দ্রশেখরকে বিন্দুমাত্র চিন্তিত করে নি। তিনি শৈবলিনীর সমস্ত কথা কানেই তুললেন না। আপন গ্রন্থের মধ্যে তিনি অনুপ্রবিষ্ট। শৈবলিনীর কথার তিনি উল্টোপাল্টা জবাব দিলেন। এই চিত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য চমৎকারভাবে ব্যঞ্জিত করেছেন। একজন স্ত্রী সম্বন্ধে, সংসার সম্বন্ধে, যৌবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। অপরজন প্রেম চান, রঙ্গ চান, যৌবনের পরিতৃপ্তি চান। চন্দ্রশেখরের কাছে সংসার মিথ্যা, গ্রন্থই সত্য। শৈবলিনীর কাছেও এই সংসার মিথ্যা। সংসার—সেখানে বন্ধনের নামান্তর মাত্র। শৈবলিনীর সঙ্গে রঙ্গে ব্যঙ্গে প্রলুব্ধ ফষ্টার একদিন চন্দ্রশেখরের অনুপস্থিতিতে শৈবলিনীকে অপহরণ করলেন। সেই অপহরণে শৈবলিনীর আন্তরিক সম্মতি ছিল। মনে মনে তিনি ধারণা করেছিলেন যে সংসারের বন্ধন কাটাতে পারলেই তিনি প্রতাপের দেখা পাবেন, হয়ত প্রতাপ তাঁকে উদ্ধার করবেন, আবার তিনি প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হবেন। শৈবলিনীর এই যুক্তির কোন অর্থ হয় না। সংসারের বাইরে গেলেই প্রতাপের সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা কোথায়। এদিকে চন্দ্রশেখর বিদেশ থেকে ফিরে এসে যেদিন দেখলেন যে গৃহ শূন্য, যেদিন জানলেন শৈবলিনী অপহৃত হয়েছেন, সেদিন তাঁর মধ্যে নূতন মানুষের বিকাশ ঘটল। তাঁর মধ্যে যে প্রেম ছিল সে প্রেমের উপলব্ধি তাঁর ছিল না। এবার সেই প্রেম তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এক মুহূর্তে অর্থহীন হয়ে উঠল তাঁর জীবন, মিথ্যা হয়ে গেল তার অধ্যয়নীয় গ্রন্থগুলি। মনের মধ্যে যে আগুন তাঁর জ্বলে উঠেছে সেই আগুনের সঙ্গে বাহিরের আগুনের সংযোগ হল। গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ ভস্ম করে তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বের হয়ে পড়লেন। এদিকে শৈবলিনীর সন্ধানে বেরুলেন সুন্দরী ঠাকুরঝি। লরেন্স ফষ্টারের নৌকা হতে নাপিতানীর ছদ্মবেশে তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু শৈবলিনী

তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন সংসারে ফেরার তাঁর ইচ্ছে নেই। এই সংবাদ ভগিনীপতি প্রতাপের নিকট পৌঁছে দিলেন সুন্দরী ঠাকুরঝি। এইবার প্রতাপ নিজে শৈবলিনীকে উদ্ধার করার ভার নিলেন। প্রতাপ জমিদার এবং দস্যু—তখনকার দিনে অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন। প্রতাপ লরেন্স ফষ্টারের নৌকা হতে উদ্ধার করলেন শৈবলিনীকে রামচরণের সহায়তায়। রামচরণ শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহে নিয়ে এলেন। সেই রাত্রে শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের আবার সাক্ষাৎ হ'ল। শৈবলিনী জানালেন যে প্রতাপকে তিনি এখনও ভালবাসেন এবং কেবল প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই তিনি লরেন্স ফষ্টারকে অবলম্বন ক'রে সংসার সীমার বাহিরে আসবার চেষ্টা করছিলেন। এখন তিনি প্রতাপেব মিলনভিক্ষু। প্রতাপ তাঁর এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তিনি রূঢ় ভাবে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগ করার জন্য ভর্ৎসনা করলেন। এমন সময় বহির্দ্বারে একটা বড় গোল উপস্থিত হ'ল।

প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাগুলি ঘটে যাচ্ছিল তার সঙ্গে তদানীন্তন রাজনৈতিক জীবনের গভীর সংযোগ ছিল। বাংলার নবাব তখন মীরকাসিম। নবাবপত্নী দলনী বেগম। বেগমের ভ্রাতা যে গুরগন খাঁ—এ কথা মীরকাসিমের জানা ছিল না। বাংলার ভাগ্যাকাশে সেদিন পশ্চিম কোণ থেকে আগত এক খণ্ড মেঘ দেখা দিয়েছে। পশ্চিমের সেই মেঘ—ইংরাজ। মীবকাসিম বুঝতে পেরেছিলেন ইংরাজের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবায। তাই তিনি আপন সৈন্যদলকে শিক্ষিত করার ভার সেনাপতি গুরগন খাঁর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। গুরগন খাঁ জেনেছিলেন যে ইংরাজ শক্তিশালী। তিনি বুঝেছিলেন আপন সৈন্যদল নিয়ে ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করলে হয়ত মীরকাসিম রক্ষা পেতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি বিশ্বাসঘাতকতাব দ্বারা ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে সহযোগ রক্ষা করেন তাহলে মীরকাসিমের পরবর্তী কালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করতে পারেন। দলনী বেগম তাঁর সহোদরা হ'লেও মীরকাসিমের পত্নী—সাধ্বী স্ত্রী। তিনি গুরগন খাঁকে স্বামীর কল্যাণের জন্য অনুরোধ করতে এসেছিলেন। গুরগন খাঁ আপন স্বার্থের জন্য আপন সহোদরাকে নবাবের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অসহায় অবস্থায় নিক্ষেপ করলেন। দলনী বেগম এবং তাঁর পরিচারিকা নিরাশ্রয় অবস্থায় ঘুরছিলেন। তাঁদের উদ্ধার করলেন চন্দ্রশেখর। ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখর তাঁদের নিয়ে উপস্থিত হলেন প্রতাপের সেই গৃহে যেখানে অন্য কক্ষে রামচরণ শৈবলিনীকে রক্ষা করেছে। প্রতাপ কর্তৃক লরেন্স ফষ্টারের উপর আক্রমণ ইংরাজকে সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং এই দোষীকে সাজা দিবার

জন্য গলষ্টন ও জনসন নামক দুইজন ইংরাজ আমিয়টের আদেশে প্রতাপের গৃহের বহির্দ্বার সবুট পদাঘাতে ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করল। তারা লরেন্স ফষ্টারের বিবি শৈবলিনী ভ্রমে দলনী বেগমকে ধরে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা দলনী বেগমের পরিচারিকা প্রতাপ ও রামচরণকেও নিয়ে গেল। এইবার শৈবলিনী প্রতাপের কার্যের প্রত্যুত্তর দেবেন বলে স্থির করলেন। প্রভাতে নবাব দলনী বেগমকে শিবিকারোহণে আনবার জন্য প্রতাপের গৃহে লোক প্রেরণ করলেন। শৈবলিনী সেই শিবিকারোহণে নবাবের অন্তঃপুরে এলেন। নবাবের শিবিকা-বাহীরা শৈবলিনীকে দলনী বেগম ভ্রমে অন্তঃপুরে এনেছিল। নবাব শৈবলিনীকে দেখে বিস্মিত হলেন। শৈবলিনী আপনাকে প্রতাপের স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেন এবং নবাবের সাহায্যে প্রতাপের উদ্ধারকার্যে অগ্রসর হলেন। বাঘের উপযুক্ত বাঘিনী। প্রতাপকে যে নৌকার উপর রাখা হয়েছিল ইংরাজদের সেই নৌকা গঙ্গার উপর বাঁধা ছিল। হঠাৎ সেই গঙ্গাতীরে সেই রাত্রে নারীর কাতর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। স্ত্রীলোকের ক্রন্দনে সচকিত হয়ে উঠলেন আমিয়ট। তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে বজরার ভিতর নিয়ে গেলেন। স্ত্রীলোকটি শৈবলিনী, তিনি হিন্দী না বোঝার ভান করলেন। তাঁর আচরণে সবাই তাঁকে পাগল বলে ভুল করল। সুন্দরী পাগলিনীকে ক্ষুধার্ত দেখে তাঁকে খাওয়াবার জন্য সকলে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। পাগলিনী ব্রাহ্মণকন্যা। সুতরাং ব্রাহ্মণের জন্য যে ভাত রাঁধা হয়েছিল তাছাড়া কিছু গ্রহণ করবেন না। নৌকায় যে ব্রাহ্মণ পাহারাদার ছিল তাদের খাওয়া হয়ে গেছে। একমাত্র ব্রাহ্মণ কয়েদী প্রতাপ রায়ের হাঁড়িতে তখনও ভাত ছিল। পাগলিনী শৈবলিনী অবগুণ্ঠনবতী হয়ে প্রতাপের কাছে দাঁড়ালেন। হাঁড়ি থেকে ভাত বাড়বার জন্য প্রতাপের হাতকড়ি খোলা হল। অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে শৈবলিনী প্রতাপের উদ্ধারের জন্য একটা কৌশল করলেন। উচ্চ চিৎকার করে পাগলামির ভানে নৌকা থেকে লাফ দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে স্ত্রীলোককে রক্ষা করার জন্য প্রতাপ জলে লাফিয়ে পড়লেন। গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ এবং শৈবলিনীর আবার সন্তরণ। মাথার উপর অনন্ত আকাশ। শুভ্র জ্যোৎস্নাবর্ষী চন্দ্র। শৈবলিনী ও প্রতাপের মনে পড়ে যায় সেই দিনের কথা। কিন্তু প্রতাপ—চরিত্রের প্রতাপে অতুলনীয়। তিনি শৈবলিনীকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলবেন। এইবার শৈবলিনী একাকী তীরে উঠে নির্জন বনপ্রদেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন। প্রতাপের নিকট হতে তিনি পলায়ন করেছেন সংসারে।

ফেরবার আর তাঁর বাসনা নেই। অন্ধকার গিরি-উপত্যকায় লতাগুল্মাদি ঘর্ষণে রুধিরাক্ত শরীর নিয়ে তিনি পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। অন্ধকারের মধ্যে ঝড় বৃষ্টি সুরু হল। সেই নিঃসঙ্গ উপত্যকায় ভয়াবহ পরিবেশে শৈবলিনী স্বপ্নে নরকযন্ত্রণা ভোগ করলেন। তাঁর সমগ্র জীবনের ব্যথাবেদনার পুঞ্জীভূত ইতিহাস, বিবেক-দংশন। প্রতাপের অস্বীকৃতি-জনিত ভবিষ্যতের হতাশা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাঁর চিত্তকে এমনই ভয়ক্লিষ্ট করে তুলেছিল যে তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা প্রায় শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। সেই অসীম বর্ষণের মধ্যে, অসীম অন্ধকারের মধ্যে দুটি বিশাল বাহু এসে শৈবলিনীকে একটি গুহার অন্ধকারের মধ্যে রেখে গেল। এইবার তিনি মনে মনে প্রায়শ্চিত্ত সুরু করলেন। দিনের পর দিন উপবাস ও প্রায়শ্চিত্তের পর সপ্তাহকাল বাদে শৈবলিনীর সম্মুখে চন্দ্রশেখর উপস্থিত হলেন। চন্দ্রশেখরের গুরুদেব রমানন্দ স্বামী সেই রাত্রে শৈবলিনীকে গুহার মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরই নির্দেশে তাঁর শিষ্য চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর চিত্তচিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। শৈবলিনী তখন সম্পূর্ণ উন্মাদিনী। চন্দ্রশেখর উন্মাদিনীকে নিয়ে বেদগ্রামে ফিরে এলেন। যোগবলে শৈবলিনীর পাপের পরিসীমা জানবার জন্য শৈবলিনীকে ঔষধ সেবন করানো হল। ঔষধ সেবন করে শৈবলিনী অভিভূত অবস্থায় নিজের সমস্ত দোষের কথা অকপটে স্বীকার করলেন এবং আচ্ছন্ন ভাবে জানালেন যে নবাব এক অশ্বারোহীকে প্রেরণ করছেন শৈবলিনীকে নিয়ে যাবার জন্য। তার আদেশে অপর একজন ফষ্টারকে নবাবের কাছে নিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ বাদেই নবাবের দূত এসে হাজির এবং সত্যসত্যই জানাল যে চন্দ্রশেখর ও রমানন্দ স্বামীর সঙ্গে শৈবলিনীকে নবাব দরবারে যেতে হবে। ওদিকে নবাবপত্নী দলনী বেগম সম্বন্ধে নবাবের মনে খারাপ সন্দেহ জাগ্রত হয়েছিল। সন্দেহের বশবর্তী অবস্থায় তিনি নির্বাসিত দলনীর জন্য বিষ প্রেরণ করেছিলেন। এক্ষণে বেগমের পরিচারিকার নিকটে নবাব জেনেছেন যে দলনী নির্দোষ এবং তকি খাঁ মিথ্যা সংবাদের মূলে। এই বিষয়ে বিচারের জন্য তিনি ফষ্টর ও শৈবলিনীর সাক্ষ্য চান। যথাসময়ে দরবারে ফষ্টরের সাক্ষ্যে নবাব দলনী সম্বন্ধে সকল কথা জানতে পারলেন। রমানন্দ স্বামীর ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে লরেন্স ফষ্টর সমস্ত কথা অকপটে স্বীকার করলেন। শৈবলিনী যে দেহে ও মনে ফষ্টরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন নি তা চন্দ্রশেখর জানতে পারলেন। এমন সময় সহসা নবাব মীরকাসিমের উপরে ইংরাজগণ আক্রমণ করলেন। মোগল সৈন্যের সঙ্গে প্রতাপের হিন্দু সেনা যুক্ত হল। প্রতাপ ইংরাজের বিরুদ্ধে ধাবমান হবার পূর্বে

শৈবলিনী, চন্দ্রশেখর ও রমানন্দ স্বামীকে সেই যুদ্ধ হ'তে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে শৈবলিনী প্রতাপকে বললেন যে যোগবলে এবং ঔষধ সেবনে তিনি পরিবর্তিত বটে, কিন্তু প্রতাপ যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তিনি তাঁকে ভুলতে পারবেন না। একথা শুনে প্রতাপ দ্রুত অশ্বারোহণে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে অগ্রসর হলেন। গমনকালে চন্দ্রশেখর বললেন, "কোথা যাও?" প্রতাপ জানালেন যে তিনি পাপী লরেন্স ফষ্টরের বধের জন্য যুদ্ধে চলেছেন। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে প্রতাপ অগ্রসর হলেন, কারণ তিনি জানেন যে তাঁর জীবদ্দশায় চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী সুখী হতে পারবেন না। যুদ্ধে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তিনি চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর পুনর্মিলনের ব্যবস্থা ক'রলেন।

ঐতিহাসিকতা

কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে প্রধান কাহিনীর পটভূমি রূপে যে স্থান কাল পাত্র বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন তার অনেক কিছু ঐতিহাসিক। মীরকাসিমের বৈশিষ্ট্য, গুরগন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা, আমিয়টের নেতৃত্ব এবং ইংরাজ চরিত্রের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। মীরকাসিম জ্যোতিষে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে Seir Mutaqherin গ্রন্থে আমরা জানতে পারি যে মীরকাসিম খাঁ "was conversant in Astrology", বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা জ্যোতিষে বিশ্বাসী ও জ্যোতিষিক গণনায় পারদর্শী মীরকাসিমের যে চিত্র দেখি তা বাস্তব-বিরোধী নহে। গুরগন খাঁ চরিত্রটিও ঐতিহাসিক। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে বর্ণনা করেছেন অনেকটা সেইরূপ ভাবেই আমরা Seir Mutaqherin গ্রন্থে বর্ণিত দেখতে পাই। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন বস্ত্রব্যবসায়ী (···a cloth-seller by the yard, as was Gurghin-Qhan.)। পরবর্তী কালে তিনি প্রধান সেনাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন এবং নবাবের আদেশে ইউরোপীয় ধাঁচে সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করেন ("was put at the head of the artillery with orders to new model it after the European fashion ; and likewise to discipline the musqueteers in his [Mir-Cassen-Qhan's] service after the English manner). গুরগন খাঁর যে মীরকাসিমের দরবারে অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল এবং গুরগন খাঁর উপদেশে মুঙ্গেরে ইংরাজের অস্ত্রের নৌকা যে আটক হয়েছিল এবং পরবর্তী কালে মুর্শিদাবাদের

নবাবের সৈন্যদলের আক্রমণে আমিয়ট ও তাঁহার সহচরবর্গের যে মৃত্যু ঘটে এই সকলই ঐতিহাসিক ঘটনা। (Mr. Amyatt himself, with all those of his retinue arrived at Moorshoodabad. This much is certain that he was surrounded by Mahmed Taky Qhan's peoples, who hacked him to pieces, with all the other English on boat.) ইংরাজের সঙ্গে গুরগন খাঁর গোপন ষড়যন্ত্রের কথাও ঐ গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। (The causes [of the murder of Gurghin-Qhan] which no one dared to mention are a conspiracy, said to be brewn by Gurghin-Qhan, incited underhand by the English.) তকি খাঁ চরিত্রটি কাহিনীর অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্র পরিবর্তিত করেন। তকি খাঁ 'সয়ের মুতক্ষেরিণ' গ্রন্থে বিশ্বাসঘাতক বা বেগমের প্রতি প্রণয়াসক্ত নহেন। তিনি মীরকাসিমের সৈন্যরূপে ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। উপকাহিনীর দিক থেকে বিচার করলে ইংরাজের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, কয়েকজন ব্রিটিশ ও মুসলমান পুরুষ চরিত্রের যথাযথ বর্ণনা, দেশে বিশ্বাসঘাতকতার আবহাওয়া ইত্যাদি ঐতিহাসিক বলে সমগ্র গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসের প্রধান বর্ণিতব্য ঘটনা সম্পূর্ণভাবে মৌলিক পরিকল্পনা এবং উপকাহিনীর সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত অংশ দলনী বেগমের ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাহিনী সম্পূর্ণভাবে অনৈতিহাসিক। সুতরাং 'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

গ্রন্থের নামকরণ

সকল গ্রন্থের নামকরণ কোন একটি বাঁধাধরা নিয়মে হয় না। কোথাও গ্রন্থের প্রধান পুরুষ-চরিত্র বা নায়ক, কোথাও গ্রন্থের প্রধান স্ত্রী-চরিত্র বা নায়িকা গ্রন্থের নামকরণে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। আবার কোথাও অপ্রধান চরিত্র গ্রন্থের নামকরণে স্বতন্ত্র মহিমায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোথাও গ্রন্থের প্রধান ঘটনাকে আবার কোথাও অপ্রধান ঘটনাকে লেখক নামকরণ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। কোথাও একটি সাঙ্কেতিক বা প্রতীকরূপে গ্রন্থের নামকরণ হয়ে থাকে। প্রধান পুরুষ-চরিত্রের নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আমাদের রামায়ণের কথা মনে আসে. রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। নায়িকা-চরিত্র অবলম্বনে গ্রন্থের নামকরণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত আমাদের মনে

আসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে প্রফুল্ল একটি অপ্রধান চরিত্র তবু বিশেষ উদ্দেশ্যে গিরিশচন্দ্র ঐ নাটকের নাম 'প্রফুল্ল' রেখেছেন। প্রধান ঘটনা অনুসারে গ্রন্থের নামকরণের উদাহরণ হিসেবে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' 'Paradise Lost' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর নাম করা যায়। অপ্রধান ঘটনা গ্রন্থের নামকরণে কি ভাবে প্রাধান্য পেয়ে থাকে তার বিশিষ্ট উদাহরণ 'মৃচ্ছকটিক'। একটি মাটির গোরুর গাড়ীর (মৃৎ-শকটিক) বাসনা অবলম্বনে রাজনটী বসন্তসেনার ঔদার্য ও মহত্ত্বের একটি অপূর্ব দৃশ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে চারু দত্তের কন্যার এই মাটির গোরুর গাড়ির খেলনা সম্বন্ধে আর কোন বিশেষ প্রসঙ্গ নেই তবুও গ্রন্থের নামকরণে এই অপ্রধান বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রন্থের নামকরণ রূপকধর্মী বা সাংকেতিক হতে পাবে যেমন 'বিষবৃক্ষ', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি। বর্তমান গ্রন্থের নামকরণে চন্দ্রশেখর, প্রতাপ এবং শৈবলিনী—তিনটি চরিত্রেরই দাবী সর্বাপেক্ষা বেশী। শৈবলিনী শব্দের অর্থ নির্ঝরিণী বা পার্বত্য নদী। সে যেন মহাসাগরের গান শুনে সংসারের পাষাণ কারাগৃহ হতে মুক্তিপথযাত্রায় উদ্দাম আবেগচঞ্চল। শৈবলিনী চরিত্র গ্রন্থের নিয়ামিকা শক্তি। তার অপরূপ সৌন্দর্য, ব্যর্থ প্রণয়ের বেদনা, প্রেমের উদ্দাম আবেগ সকল কিছু নিয়ে শৈবলিনী সকল ঘটনার কেন্দ্রস্থলে। মুনিগণ ধ্যান ভেঙে যে রূপসীর চরণপ্রান্তে তপস্যার ফল অর্পণ করেন শৈবলিনী সেই শ্রেণীর নারী। তাঁর জন্য চন্দ্রশেখরের ব্রহ্মচারী জীবনের মধ্যে বিবাহ-বাসনার উদ্রেক হয়েছিল এবং তাঁরই জন্য সেই স্বামী চন্দ্রশেখরের উদাসী জীবনের মধ্যে বিরহ-বেদনায় প্রেমেব উদ্ভব হয়েছিল। তাঁরই জন্যে বিবাহের পূর্বে প্রতাপ গঙ্গাবক্ষে আত্মহত্যা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তাঁরই দাম্পত্য সুখের কল্যাণকামনায় শেষপযন্ত সংগ্রাম ক্ষেত্রে আত্মবিসর্জন করেছেন। শৈবলিনীর অপরূপ রূপলাবণ্য প্রণয়মুগ্ধ করেছে লরেন্স ফষ্টরকে, আমিয়টকে হিতৈষণায় প্রবৃত্ত করেছে এবং সামান্য মুসলমান অনুচর পর্যন্ত শৈবলিনীর সঙ্গলালসায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। দলনীর জন্য বিরহক্লিষ্ট বাংলার নবাব মীরকাসিম পযন্ত শৈবলিনীর রূপে বিস্মিত ও শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েছেন এবং প্রতাপের মুক্তির জন্য শৈবলিনীর প্রার্থনামত সৈনিক প্রেরণ করেছেন। নারী যে পুরুষের বিচিত্র রসপ্রবর্তনা তা শৈবলিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন। কিন্তু শৈবলিনীর মধ্যে রূপের আকর্ষণ যত, ঔদার্য ও ত্যাগের পবিত্রতা তেমনই অল্প। অর্থাৎ শৈবলিনীর প্রেরণা চিত্তচাঞ্চল্যের প্রেরণা। শৈবলিনী কোন উদারতার দ্বারা,

কোন পবিত্রতার দ্বারা আমাদের বিস্মিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন না। বাঙ্কমচন্দ্র নীতি-বাদী হয়েও সহানুভূতির সঙ্গে শৈবলিনীকে চিত্রিত করেছেন, কিন্তু শ্রদ্ধাভরে তাঁর নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ করেন নি। শৈবলিনীর হতভাগ্যের জন্য তাঁর করুণা আছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই বলেছেন যে "শৈবলিনী কলুষিতা আমার এই লেখনী।" তিনি আরও স্পষ্ট করে অন্যত্র বলেছেন যে শৈবলিনীর চরিত্র পরিবর্তন যদি না ঘটত তাহলে তিনি এই পাপের চিত্র আঁকতেন না। ("পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর একথা মনে পড়িল না যে পাপের অসার্থকতা ও সার্থকতা কি? .... কিন্তু একদিন সে একথা বুঝিবে, একদিন প্রায়শ্চিত্ত জন্য সে অস্থি পর্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে সে আশা না থাকিলে আমরা এ পাপচিত্রের অবতারণা করিতাম না"।) সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল নীতি প্রচার। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই 'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থের ছটি খণ্ডের এইভাবে নাম দিয়েছেন—"পাপীয়সী', 'পাপ', 'পুণ্যের স্পর্শ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'প্রচ্ছাদন' ও 'সিদ্ধি'। এর প্রথম দুটি খণ্ডে শৈবলিনী কি ধরনের পাপীয়সী ও পাপ কিরূপ প্রদর্শিত, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে প্রতাপ চন্দ্রশেখর ও রমানন্দ স্বামীর পুণ্যের স্পর্শে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত এবং শেষ পর্যন্ত সে প্রায়শ্চিত্তের সিদ্ধির জন্য প্রতাপ কি ভাবে আত্মত্যাগ করলেন তারই বর্ণনা করা হয়েছে। তাই সমগ্র গ্রন্থের নামকরণে বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে প্রাধান্য না দিলেও গ্রন্থবর্ণিত ঘটনার সঙ্গে যে শৈবলিনীর জীবনের বিচিত্র যোগ আছে তা খণ্ডের নামকরণের দ্বারা ব্যঞ্জিত করেছেন।

গ্রন্থের শৈবলিনী নামকরণে নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্কোচের কারণ দেখা যায়। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে প্রতাপের নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ হ'ল না কেন? বঙ্কিমচন্দ্র যে স্থানে তাঁর লেখনীকে "শৈবলিনী কলুষিতা" বলেছেন সেখানেই প্রতাপের বর্ণনায় "আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে" বলেছেন ('চন্দ্রশেখর', ২।৩)। গ্রন্থের পরিশেষেও তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন "যাও প্রতাপ অনন্ত ধামে। যাও সেখানে ইন্দ্রিয় জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেখানে যাও। সেখানে, রূপ অনন্ত; প্রণয় অনন্ত; সুখে অনন্ত পুণ্য; সেইখানে যাও।" প্রতাপের নামকরণের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র আপনার শ্রদ্ধা অভিব্যক্ত করেছেন। প্রতাপ কেবল রূপে অতুলনীয় ছিলেন না, তাঁর চরিত্রের প্রতাপও অতুলনীয় ছিল। প্রতাপের ব্রাহ্মণত্বের অন্তরালে এক ক্ষাত্রশক্তির অদ্ভুত প্রতাপকে লক্ষ্য করি। আদর্শ ব্রাহ্মণের লক্ষ্য বাসনার পরিতৃপ্তি নহে,—ত্যাগের দ্বারা,

ঋজুতার দ্বারা পুণ্যের অধিকারী হওয়া। "আর্জবে বর্তমানস্থ ব্রাহ্মণ্যম্ অভিজায়তে" —ঋজুতার দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব পাওয়া যায় সেই ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী প্রতাপ। কেবল ব্রাহ্মণ বংশেই তাঁর জন্ম নয়, সমগ্র জীবনব্যাপী একটা বিরাট স্বার্থত্যাগ এবং আত্মসুখ-অস্বীকৃতির জীবন্ত বিগ্রহ প্রতাপ। প্রতাপ কিশোরী শৈবলিনীকে ভালবেসেছিলেন। সে ভালবাসা তাঁর চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিগত করেছিল। সে ভালবাসার প্রবল প্রবাহে তিনি যৌবনের প্রারম্ভে একবার শৈবলিনীর সঙ্গে গঙ্গায় আত্ম-ত্যাগের সঙ্কল্প করেছিলেন। পরে শৈবলিনী যখন পরস্ত্রী হয়ে গেলেন, যখন উদ্ধারকর্তা চন্দ্রশেখরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শৈবলিনীর অভিমুখে অগ্রগমনে সমাজের বাধা তাঁর চিত্তকে বিকল করে তুলল তখন অপ্রাপণীয়া শৈবলিনীর প্রতি তাঁর হৃদয়ে গভীর প্রণয়। পরে যখন তিনি ফষ্টরের নৌকা হতে শৈবলিনীকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন, যখন অনন্ত আকাশের নীচে গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে পূর্বের প্রণয়ী-যুগল আবার সন্তরণ-নিরত এবং পূর্বের প্রণয়িনী তেমনই প্রণয়চঞ্চল তখনই প্রতাপ চরিত্রের অবিস্মরণীয় মাহাত্ম্য প্রকটিত হয়েছে। কি অপূর্ব সেই দৃশ্য! সেই গঙ্গাবক্ষে "প্রতাপ ডাকিল, 'শৈবলিনী'। শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল·····চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এই মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

প্রতাপ বলিল, "চাঁদের? না। সূর্য উঠিয়াছে। শৈ। আর ভয় নাই" শৈবলিনীর মনে এই অনন্তবিস্তারী গঙ্গা, শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনী, বিস্মৃত অতীতের প্রিয় সম্ভাষণ, নির্জন গঙ্গাবক্ষে চির-ঈপ্সিত প্রণয়ীর সান্নিধ্য একটি রোমান্টিক ভাবমোহ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ব্যর্থ, বিড়ম্বিত, বিবাহিত জীবনের মধ্যে এই প্রেমের পুনরাবির্ভাবের প্রয়োজন কি? তাই শৈবলিনী প্রশ্ন করেছিলেন এই মরা গঙ্গায় আবার চাঁদের আলো কেন? কিন্তু প্রতাপ রোমান্টিক ভাবমোহ থেকে আত্মজয় করেছেন! তাই মাথার ওপর তিনি চাঁদ দেখেন নি, দেখেছেন নূতন দিনের সূর্য। গঙ্গা তাঁর কাছে পবিত্রতার প্রবাহ। সেই পাবন স্রোতের মধ্যে তাঁর জীবনের সব চেয়ে প্রিয় শৈবলিনীর ভাগ্যাকাশে নূতন সূর্য উঠুক এই কামনা করেছেন। তাই গঙ্গার মধ্যে তিনি শপথ করিয়ে নিয়েছেন যে শৈবলিনী তাঁকে চিত্ত থেকে বিদূরিত করবেন নইলে প্রতাপ জল থেকে উঠবেন না। এই সূর্যের আলোয় শৈবলিনীর মন ঝলসে গিয়েছে তাঁর চোখে, "তারা সব নিভিয়া গেল। চন্দ্র কপিশ

বর্ণ ধারণ করিল। নীল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল।" প্রতাপ শৈবলিনীকে সেই ভয়ঙ্কর শপথের কথা বললেন। শৈবলিনীর ব্যর্থ, বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যে একটুখানি সান্ত্বনা ছিল প্রতাপের স্মৃতি। সংসারের ধূ ধূ বালুকাস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে এক ফোঁটা সবুজ মরূদ্যান। কিন্তু সেখান হতেও শৈবলিনীকে সরে আসতে হবে। শৈবলিনী প্রতাপকে প্রশ্ন ক'রলেন, "এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে প্রতাপ?" প্রতাপ উত্তর দিলেন, "আমি"। শৈবলিনী আবার প্রশ্ন করলেন, "তোমার ঐশ্বর্য আছে—বল আছে—কীর্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ?" প্রতাপ উত্তর দিলেন, "কিছু না—আইস; তবে দুইজনে ডুবি।" এই একটি দৃশ্যের মধ্যেই প্রতাপ পরিপূর্ণতার মধ্যে আপন ব্যর্থতার কথা নিবেদন করেছেন। তিনি রূপবান যুবক জমিদার, ঘরে সুন্দরী স্ত্রী আছে, কিন্তু তাঁর সব থেকেও যে কিছুই নেই তারই একটা চমৎকাব চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। শৈবলিনীর জন্য প্রতাপেব বেদনা নীরব বেদনার ইতিহাস। প্রতাপের জন্য শৈবলিনীর অধীরতা প্রতিক্ষেত্রেই মুখরতা প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি বচনে, মনে এবং দেহে প্রতাপের জন্য চঞ্চল। আর প্রতাপ শৈবলিনীর জন্য বিরহ-ব্যথাক্লিষ্ট অথচ কায়ে, মনে এবং বাক্যে তিনি অসংযম প্রকাশ করেন নি। একমাত্র মৃত্যুর পূর্ববর্তী মুহূর্তে তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগ বশে বলেছেন, "এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আমি এই ষোড়শ বৎসর শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি? পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা...এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম।" প্রতাপের চরিত্রে যে মহত্ত্ব, যে ত্যাগের আদর্শ, যে পুণ্যের আদর্শ সেই আদর্শকে রমানন্দ স্বামীর মুখ দিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র শেষ লক্ষ্য বলে পরিচিহ্নিত করেছেন। তাই রমানন্দ স্বামী মৃত্যুপথযাত্রী প্রতাপকে বলেছেন, "ইন্দ্রিয় জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্ত সংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন, তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।" এ প্রতাপ চরিত্রের প্রতাপে অতুলনীয়, আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত, ব্রাহ্মণ প্রতাপ। আর যে প্রতাপ শৈবলিনীর উদ্ধার পরিকল্পনায় ক্ষাত্রশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে রামচরণের সাহায্যে ফষ্টরের নৌকা হতে শৈবলিনীকে উদ্ধার করেন সে প্রতাপ ক্ষত্রিয়। সেই ক্ষত্রিয় প্রতাপ ব্রাহ্মণ

প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন শেষ দৃশ্যে। সেখানে শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের কল্যাণ কামনায় প্রতাপ বীরের মৃত্যু বরণ করেন। সত্যই বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের কেন্দ্রস্থলে প্রতাপ চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নায়ক যে 'সদ্বংশ ক্ষত্রিয়, ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন' হয়ে থাকেন প্রতাপ চরিত্রের মধ্যে তার সবকটিই আছে এবং বেশী মাত্রাতেই আছে। এ ছাড়া গ্রন্থের আদ্যোপান্ত তিনিই আছেন। চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহের পূর্বে আমরা কিশোর প্রতাপ ও বালিকা শৈবলিনীর চিত্র দর্শন করি। অভিশপ্ত বাল্যপ্রণয়ের নিদারুণ বেদনায় প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবনত্যাগ দৃশ্য দেখি। আর শেষ পর্যন্ত সেই প্রতাপের আত্মত্যাগ আমাদের মনকে শ্রদ্ধায় ও করুণায় পরিপূর্ণ করে। প্রতাপের যৌবন আছে, চন্দ্রশেখরের নেই; প্রতাপের ঐশ্বর্য আছে, চন্দ্রশেখর দীন ব্রাহ্মণ। প্রতাপের স্বেচ্ছাকৃত স্বার্থত্যাগ আছে। প্রতাপ প্রেমপ্রবাহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েও, শৈবলিনীর সম্পূর্ণ ভালবাসা আকর্ষণ করেও তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। আর চন্দ্রশেখর বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যে শৈবলিনীর প্রতি নীরব ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছেন। আপন অভ্যস্ত জীবনাদর্শের দ্বারা নীরস শাস্ত্র আলোচনার মধ্যে একটি সরস প্রাণময়ী বালিকাকে অনাদরে শুকিয়ে তুলেছেন। তাহ'লে বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরের প্রাধান্য স্বীকার করলেন কেন? নায়ক-চরিত্রের যে Doing ও Suffering আমাদের বিস্ময় ও বেদনা অধিকার করে তা প্রতাপের জীবন অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে প্রদর্শন করেছেন চন্দ্রশেখরের জীবনে কি সেইরূপ অভিব্যক্তি লাভ করেছে? প্রতাপের যে দুর্দমনীয় প্রেম তাঁকে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল সে প্রেমের পরিচয় চন্দ্রশেখরের আট বৎসরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে কোথায়? শৈবলিনীকে আপন প্রণয়িনী জেনেও, শৈবলিনীর প্রতি আপন হৃদয়ের প্রবল অনুরাগ প্রতিনিয়ত অনুভব ক'রেও যে প্রতাপ শৈবলিনীকে গঙ্গাবক্ষে বৈরাগ্য মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন সে ধরণের চিত্তের সর্বস্ব ত্যাগ চন্দ্রশেখরের মধ্যে কোথায়? প্রতাপ শৈবলিনীর উদ্ধারের জন্য সর্বস্ব পণ করেছিলেন এই উদ্ধারের অভিযান কোনদিন চন্দ্রশেখর পরিকল্পনা করেছেন কি? আবার শৈবলিনীর পুনরুদ্ধারের এবং প্রায়শ্চিত্তের পর পরিশুদ্ধ-চিত্তা শৈবলিনীর মুখে প্রতাপ শুনেছেন যে তিনি বেঁচে থাকতে শৈবলিনীর চিত্ত সংযত হবে না, তখন তিনি নিশ্চিত মরণের মুখে যে ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সেই ধরণের আত্মসুখের অস্বীকৃতি, আত্মত্যাগের প্রবল প্রেরণা চন্দ্রশেখর চরিত্রে কোথায়? চন্দ্রশেখরের যে suffering তা না পাওয়ার suffering, প্রতাপের যে বেদনা তা পেয়ে হারানোর

বেদনা। চন্দ্রশেখরের যে বেদনা তা আপন অভ্যস্ত জীবনাদর্শের অসাড়তা, শৈবলিনীর অনুরাগহীনতা ও ভাগ্যবিপর্যয়ের ফল। প্রতাপের যে বেদনা তা আপন বিবেকবুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা সৃষ্ট আত্মনিগ্রহের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। তিনি প্রবল ভাবে চেয়েছিলেন শৈবলিনীকে, নিবিড় ভাবে পেয়েছিলেন শৈবলিনীর মনকে। আপন আদর্শবাদের দ্বারা তিনি ত্যাগ করেছেন সেই সহজলভ্য সুখ। নায়কের বয়স, নায়িকার চিত্তের গতি, গ্রন্থে বর্ণিত কার্যাবলী (Doing) ও বেদনা (Suffering) প্রভৃতির কেন্দ্রস্থলে প্রতাপ চরিত্র থাকা সত্ত্বেও এবং প্রতাপ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি গ্রন্থের নাম 'চন্দ্রশেখর' রেখেছেন বিশেষ উদ্দেশ্যবশতঃ। এ বিষয়ে স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের অপূর্ব বিশ্লেষণ বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত করা হ'ল। মোহিতলাল বলেন, "যে দুই আদর্শের কথা বলিয়াছি, 'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থে কবিমানসের সেই দুই আদর্শের দ্বন্দ্ব অতিশয় লক্ষণীয়। একদিকে হোমার, সেক্সপীয়র—অপর দিকে ব্যাস, বাল্মীকি। একদিকে পুরুষের রাজসিক আত্মাভিমান—প্রতাপের সেই আত্মজয়ের দুর্ধর্ষ বীরপনা, অপর দিকে সাত্ত্বিক আত্মস্থতার নিরভিমান মহত্ত্ব—চন্দ্রশেখরের কীর্তিহীন, বীরত্বহীন, আবক্ষুব্ধ পৌরুষ। এই দুই আদর্শের মধ্যে কোনটি মহত্তর, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা ঐ কাহিনীতে স্পষ্ট নির্দেশ করেন নাই, বরং শৈবলিনীর পতি নয়—প্রণয়ীই নায়কের স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং রোমান্সের চরমোৎকর্ষ হইয়াছে। এ কাহিনীর যত কিছু কাব্যরস প্রতাপ ও শৈবলিনীকে ঘিরিয়া অতলস্পর্শী হইয়াছে। কিন্তু তবু উপন্যাসের নামকরণ হইয়াছে চন্দ্রশেখরের নামে। বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে কবি, সমালোচক, যে সমালোচনা উৎকৃষ্ট সৃষ্টিশক্তির সহগামী, তাহারই রশ্মিপাতে কবির কল্পনা পথভ্রষ্ট হয় না। অতএব উপন্যাসের ঐ নামকরণের বিশেষ তাৎপর্য আছে। গ্রন্থমধ্যে তিনি পাঠকের বুদ্ধিভেদ করেন নাই—সম্ভবতঃ নিজের প্রবল গভীর কাব্যরসাবেশও তাহার জন্য দায়ী। অনন্তপ্রবাহিণী ভাগীরথীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল বারিরাশির মধ্যে প্রতাপ শৈবলিনীর সেই সাঁতার সমগ্র কাব্যখানিকে ভাববন্যায় উচ্ছালত করিয়াছে। তাই, সেই কাব্যবন্যা হইতে দূরে, পল্লীর এক নিভৃত কুটীরে মাটির প্রদীপে যে একটি স্থির শিখা জ্বলিতেছে, সেদিকে তাকাইবার সময় আমরা পাই না। তবু এই কাব্যের নাম 'চন্দ্রশেখর'। প্রতাপ পুরুষবীর, চন্দ্রশেখর জ্ঞানী, আত্মদর্শী। ঐ পুরুষবীর নারীপ্রেমকে প্রত্যাখ্যান করিয়াই তাহার পৌরুষাভিমান চরিতার্থ করিল। * * * কাব্য সমাপ্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপের উদ্দেশে একবারে নিজের

জীবনীতেই যে মর্মবিদারক সান্ত্বনাবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহাতে জীবনকে ও প্রকৃতিরূপা নারীকে একরূপ বর্জন করাই হয়; পুরুষের জীবনে একটা মহাশূন্যই মুখব্যাদান করিয়া থাকে। * * * শৈবলিনী ও প্রতাপের মধ্যে চিরবিচ্ছেদই অবশ্যম্ভাবী— নারীর ধর্ম ও পুরুষের ধর্ম এক নহে, একের যাহাতে নিঃশ্রেয়স অপরের পক্ষে তাহা আত্মহত্যা মাত্র। * * * প্রতাপ ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছিল—তাহাতেও আত্মার আর্তনাদ স্তব্ধ হয় নাই। সেই আত্মাভিমানের বশে সে ঐ নারীকে একটু মমতা করে নাই। শৈবলিনীর নারীজীবন ব্যর্থ, এমন কি নিঃশেষে নিহত হইবার পর প্রতাপের ঐ আত্মবিসর্জনে পুরুষের গৌরববৃদ্ধি হইতে পারে—শৈবলিনীর তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু আর একজনের দিকে চাহিয়া দেখ--সে স্থিতধী ও স্থিরপ্রজ্ঞ; তাহাকে প্রতাপের মতন যুদ্ধ করিতে হয় নাই, এমন করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করিতে হয় নাই। তাই বলিয়া তাহার হৃদয় ক্ষুদ্র নয়—নিস্তরঙ্গ বটে, কিন্তু গভীর। শৈবলিনী তাহার বিবাহিতা স্ত্রী—তাহার অন্তরের কাহিনী তাহার আজন্মের সেই অপ্রতিবিধেয় নিয়তির কথা সে শুনিল; স্ত্রী অন্যপূর্বা; তাহাও স্ত্রীর মুখেই জানিল; তথাপি সে তাহাকে ত্যাগ করিল না—অনন্ত ক্ষমা ও অপরিসীম করুণায় সে ঐ ভাগ্যহত, সমাজবিধিবিড়ম্বিত, সর্ব-আশাশূন্য, বিদীর্ণকায়া নারীকে বুকে তুলিয়া আপন ঘরে লইয়া গেল। প্রতাপ যখন ইন্দ্রিয়জয়ের বীরলোকে প্রয়াণ করিতেছে, তখন চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সেই জ্ঞানহীন ও প্রায় প্রাণহীন দেহ যে কারণে পরিহার করিতে পারিল না—তাহা হৃদয়ের দুর্বলতা নয়, অসতী স্ত্রীর প্রতি আত্মমর্যাদাহীন স্বামীর হীন আসক্তি নয়; তাহা যে কি, সে কথা ঐ কাহিনীর মধ্যে উহ্য রাখিয়া কবি উপন্যাসের নামকরণে দৃঢ় নির্দেশ করিয়াছেন। উপন্যাসের নায়ক ঐ দুজনেই—দুই আদর্শের; একজন নায়িকা নারীর প্রেমাস্পদ, সেই নারী নিষিদ্ধ প্রেমের অগ্নিবেষ্টনীতে আপনাকে বেড়িয়াছে, আর সেই পুরুষ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া, ভূমিতল হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া আকাশে যোগাসন পাতিয়াছে। অপর জন—তেমন নায়ক-মহিমা লাভ করিতে পারে নাই বটে কিন্তু প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে পুরুষের নীরব জয়লাভ এবং স্বতন্ত্র পুরুষ মহিমার একটি স্তব্ধ গভীর শান্ত স্থির মূর্তিরূপে সে আমাদের মুগ্ধদৃষ্টির অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছে।" প্রতাপের জীবন আত্মত্যাগ ও জয়ের গৌরবমণ্ডিত, চন্দ্রশেখরের জীবনে কেবল পরাজয়ের বেদনা, মৃত্যু অপেক্ষা ভীষণ কঠোর ক্লান্ত করুণ সেই গৌরব। প্রতাপ পেয়েছিলেন শৈবলিনীর

মন, বিবাহের মধ্য দিয়ে পাননি তাঁর দেহ। চন্দ্রশেখর বিবাহের মধ্য দিয়ে পেয়েছিলেন তাঁর দেহ কিন্তু কখনই পান নি তাঁর মন। আখ্যায়িকার প্রারম্ভে দীর্ঘ আট বৎসরের বিবাহিত জীবনে তাঁর শৈবলিনী সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ছিল না। আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তিতে তিনি অপরের প্রেমিকা এক ক্লান্ত নারীদেহকে ঘরে নিয়ে ফিরলেন কঠোর কর্তব্যের আনন্দহীন ভবিষ্যতের মধ্যে। সে জীবনের মধ্যে কোন আবেগ নেই, কোন প্রত্যাশা নেই, আছে কেবল নীরব সহনশীলতা। এত বড় ত্যাগ, এত বড় শৌর্য, শক্তি ও ঔদার্যকে প্রতাপের বীরত্ব ও মহত্ত্ব সম্পূর্ণ আড়াল করে। গ্রন্থের নামকরণ 'চন্দ্রশেখর' করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত হয় তাঁর দিকে। তা নইলে হয়ত এত বড় ত্যাগ ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের সশ্রদ্ধ বিস্ময় এমনিভাবে জাগ্রত হত না। প্রতাপ-চরিত্রের সঙ্গে চন্দ্রশেখর-চরিত্রের পার্থক্য এই যে প্রতাপের মধ্যে আমরা চরিত্রের পরিবর্তন লক্ষ্য করি না, কিন্তু চন্দ্রশেখর চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। যে চন্দ্রশেখর প্রতাপকে উদ্ধার করেছিলেন তিনি মহাদেবের মত সংযমী যোগী। তাঁর চিত্তসমুদ্র নিরুত্তরঙ্গ। চন্দ্রশেখর শব্দের অর্থ মহাদেব। আমরা মহাদেবের সেই ধ্যান বর্ণনার আভাষ পেয়ে থাকি যখন আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বলতে শুনি, "শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রতভঙ্গ হইল। * * * চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন।" যোগধ্যান-নিরত মহাদেবকে মদন দেখেছিলেন শার্দূলচর্মের আসনে। মহাদেব অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের মত সেই স্তব্ধ তপস্যার বনে যোগধ্যানে নিরত। তাঁর শান্ত চিত্ত-সমুদ্রের মধ্যে পার্বতীর মুখচন্দ্র ক্ষণেকের জন্য যৌবন-চাঞ্চল্য বিধান করেছিল। তারপর পার্বতীকে কত তপস্যার মধ্য দিয়ে কত যোগের মধ্য দিয়ে পেতে হয়েছিল সেই মহাদেবকে। এখানেও শৈবলিনী কঠিন পাহাড়ে শয়ন করে সপ্ত দিবানিশি যোগধ্যান করে সপ্তদিবসান্তে অকস্মাৎ ব্রহ্মচারীবেশে চন্দ্রশেখরকে পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছেন। শৈবলিনী যেরূপ "পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায়" শয়ন করেছিলেন, সেরূপ পার্বতীও বাহুলতায় মস্তক ন্যস্ত করে কঠিন প্রস্তরে শয়ন করেছিলেন (অশেত সা বাহুলতোপধায়িনী নিষেদুষী স্থণ্ডিল এব কেবলে)। পার্বতী যেমন বর্ষারম্ভে অনন্ত বর্ষণের মধ্যে তপোনিরত এবং যেমন নিম্নগামী বর্ষণ তাঁর মস্তক হতে সমগ্র শরীরকে প্লাবিত করে দিয়েছিল

(স্থিতাঃ ক্ষণং পক্ষ্মসু তাড়িতাধরাঃ পয়োধরোৎসেধনিপাতচূর্ণিতাঃ।
বলীষু তস্যাঃ স্খলিতাঃ প্রপেদিরে চিরেণ নাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ ॥)

শৈবলিনীও সেরূপ—"অবনত মস্তকে পার্বতীয় প্রস্তরাসনে শৈবলিনী বসিয়া —মাথার উপরে শীতল জলরাশি বর্ষণ হইতেছে"। প্রায়শ্চিত্তের মুহূর্তে সপ্তম রাত্রে শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে দেখলেন, "চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন।" (৪।৩), সকল তপস্যার শেষে পার্বতীর নিকট যেমন "অজিন আষাঢ়ধর" ব্রহ্মচারীরূপে মহাদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন সেরূপ সপ্তম দিবসের পরে "ব্রহ্মচারী বেশে চন্দ্রশেখর" আবির্ভূত হয়েছিলেন। চন্দ্রশেখর চরিত্রের মধ্যে মহাদেবের মত প্রেমের উদ্ভব হয়েছিল যখন শৈবলিনী গৃহত্যাগ করেছিলেন। নীরস দার্শনিকতার বল্মীকস্তূপের মধ্যেও যে প্রাণপুরুষ বেঁচে ছিল তা আমরা জানতে পারলাম। চন্দ্রশেখর যে ভাবে অন্তরের মাঝখানে বহ্নিজ্বালা অনুভব করেছেন তাঁর অধীত এবং অধ্যয়নীয় গ্রন্থগুলির বহ্ন্যুৎসবের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃ এই বহ্ন্যুৎসব দৃশ্য প্রতাপ-শৈবলিনীর জাহ্নবী বক্ষে সন্তরণের ন্যায় অপরূপ কাব্যরসমণ্ডিত। চন্দ্রশেখরের চৈতন্যপ্রাপ্তি হতে গ্রন্থ পরিসমাপ্তি পর্যন্ত তাঁকে আমরা প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকরূপে প্রেমের বহ্নিজ্বালায় নিরন্তর সন্তপ্ত দেখি। কিন্তু চন্দ্রশেখর আপন বেদনাকে নীরবে সহ্য করেছেন। তাঁর অন্তরের সবরিক্ততার বহিঃপ্রকাশ কেবল ব্রহ্মচারী বেশের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্ত হয়েছে। শিব যেমন সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত বিষ নিজ কণ্ঠে ধারণ ক'রে মৃত্যুঞ্জয় হয়েছিলেন সেরূপ চন্দ্রশেখর স্মরগরলের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় প্রাণহীন শৈবলিনীকে কণ্ঠলগ্ন করলেন চিরকাল; অসতীদেহকে চিরকাল ধারণ করলেন কঠোর কর্তব্য বশে। তাই এই গ্রন্থের নামকরণে বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শনিষ্ঠ জ্ঞানীকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন।

স্বপ্নদর্শন

শৈবলিনীর স্বপ্নদর্শন গ্রন্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' হতে 'বিষবৃক্ষ' পযন্ত যে স্বপ্নদর্শনের আয়োজন করেছিলেন তার মধ্যে কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন ব্যতীত চিত্ত বিশ্লেষণের দিক হতে অন্য স্বপ্নদর্শন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্য সকল ক্ষেত্রেই তিনি স্বপ্নকে বাহ্য বৈচিত্র্য বৃদ্ধির উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্নের মধ্যে অপূর্ব বিশ্লেষণী শক্তি প্রকাশ করেছেন। অনেক সমালোচক এই স্বপ্নদর্শন সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করেন নি। এক বাঙ্গালী সমালোচক তাঁর ইংলণ্ড হতে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ইংরাজী গ্রন্থে চমৎকার বিশ্লেষণের সঙ্গে এই স্বপ্নের প্রতি অশ্রদ্ধা. প্রকাশ করেছেন। কোন সমালোচকই শৈবলিনীর স্বপ্নদর্শন সম্বন্ধে

বিশেষ সুবিচার করেন নি। কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা এখানে একটি নূতন পথ খুঁজে পেয়েছে।

স্বপ্ন আমাদের বাস্তবজীবনের বিফল বাসনার সফলীকৃত রূপ বলে মনোবিশ্লেষক বলে থাকেন। আমাদের অবচেতন মনের স্তরে স্তরে যে সকল কামনা বাসনা প্রতিকূল বাস্তবের দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে অবদমিত অবস্থায় মনের এককোণে আশ্রয় নেয় তারাই মগ্ন চৈতন্যের মধ্য হতে স্বপ্নের মধ্যে নূতনরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকে। আবার এও দেখা যায় যে তন্দ্রাগ্রস্ত অবস্থার পূর্বে আমাদের অনেক শারীর যন্ত্রণা ও বেদনা, বহুদূরশ্রুতধ্বনি স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থার নূতন পরিবেশে নূতন ছদ্মবেশে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় যে শয্যা পৃষ্ঠদেশকে কোন কারণে ব্যথিত করে সেই ব্যথা, শারীর যন্ত্রণা হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার সময় ভীত মানুষের মনে পৃষ্ঠচ্ছেদী ছোরার স্বপ্ন সৃষ্টি করে। কথাসাহিত্যিক 'বনফুল' এই বিষয়ে একটি চমৎকার গল্প লিখেছেন। অনেক সময় ভোরবেলায় যখন প্রথমবারের ঘুমটি পাতলা হয়ে আসে তখন বহুদূবাগত কোন মন্দিরের ধ্বনি, কোন ভাববিহ্বল চিত্তের মধ্যে পূজারতির চমৎকার স্বপ্ন সৃষ্টি করে। এসকল ঘটনা আমাদের প্রায় প্রত্যেকেরই জীবনে প্রত্যক্ষ হয়েছে। যাঁদের ভূতের ভয় একটু বেশী শ্বাস প্রশ্বাসের কোনরকম চাপ পড়ায় স্বপ্নের মধ্যে ভূত এসে তাঁদের বুকে চেপেছে এধরনের স্বপ্নদর্শনের কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনের পিছনে স্বকীয় চিন্তাবৈশিষ্ট্য, শারীর ক্লেশাদির কথা, নানারূপ আদর্শের সংঘাত, প্রবৃত্তি ও সংস্কারের দ্বন্দ্ব অনেকক্ষেত্রেই প্রতিফলিত দেখি। এই আলোচনার পটভূমিকায় শৈবলিনীর স্বপ্নদর্শনের একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করা যায় কিনা দেখা যাক।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-ঘরের কুড়ি বছরের যে বধূটি আপন প্রেমের টানে স্থিতপ্রজ্ঞ, কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর মনে আঘাত হেনে দীর্ঘ তিনটি বৎসরের দাম্পত্য জীবন পদদলিত করে উন্মত্ত আগ্রহে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি নিভৃত চিন্তার নির্জন মুহূর্তে আপন কৃতকার্যের জন্য যে আপনাকে নিন্দিত করেন নি একথা মনে করা যায় না। একদিকে আমাদের আজন্মপালিত সংস্কার অপরদিকে এক উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের আকর্ষণ। দ্বিধাদীর্ণ শৈবলিনীর চিত্তে পাপ ও পুণ্যের নিভৃত চিন্তার মধ্যে অবচেতন মনের স্তরে স্তরে এই স্বপ্নদর্শনের সামগ্রী ধীরে ধীরে সঞ্চিত করেছিলেন। তারপর সেই পদ্মাবক্ষে প্রতাপের সঙ্গে সন্তরণের মুহূর্তে যখন তিনি জানলেন যে প্রতাপ এক

তাঁর মধ্যে একটি নীতিনিয়মের অলঙ্ঘ্য প্রাচীর চিরকালের জন্য ব্যবধান রচনা করে দিয়েছে তখন তিনি নিজেকে নিতান্ত নিঃস্ব, অসহায় ও বিপর্যস্ত উপলব্ধি করলেন। যে ভাবমোহ তাঁকে একরূপ আচ্ছন্ন করেছিল তার ওপর মরাগঙ্গায় বাস্তবসূর্যের আলোক দেখা দিল। বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি দৈনন্দিন জীবনে বারে বারে যে বিবেকের কশাঘাত সহ্য করেছিলেন তা এতদিন সংহত মূর্তি নিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ অভিভূত করল। প্রতাপের আশা সেই বিবেক যন্ত্রণার মধ্যে সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়েছে। এবারে রইল না কোন আশা, কোন ভরসা। যে অন্যায় তিনি করেছেন এবার সেই অন্যায় সম্বন্ধে তাঁর আজন্মলালিত সংস্কার তাঁকে চিন্তায় অভিনিবিষ্ট করে তুলল। পলায়ন করলেন তিনি প্রতাপের নিকট হ'তে। চলে এসেছেন তিনি সংসার এবং সমাজ হ'তে। এবার এ জীবনের কলরব সমস্ত মিথ্যা হয়ে গেল। অবসন্ন ইহকালের শেষে যে ব্যথাকরুণ পরকালের চিন্তা তাঁর মনকে সেদিন অভিভূত করে তুলল সে পরকালে না আছে সুখ, না আছে শান্তি, না আছে পুণ্যের সঞ্চয়-জনিত আনন্দ। আছে কেবল দুঃখ, অন্ধকার এবং সমগ্র জীবনব্যাপী অন্যায় এবং পাপের বিচার। শৈবলিনীর সংস্কার যে-পরলোকের সৃষ্টি করেছে সে-পরলোকের মধ্যে স্বর্গের আনন্দ তাঁর জন্য নয়, নরকের যন্ত্রণা তাঁর জন্য অবশ্যম্ভাবী। এই মানস অবস্থার সঙ্গে সেদিনের শারীর অবস্থার কথা চিন্তা করুন। পলায়ন করেছেন তিনি প্রতাপের নিকট হতে। দীর্ঘপথ চলায় তাঁর শরীর ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। চলেছেন তিনি পার্বত্য বনপ্রদেশের মধ্য দিয়ে অন্ধকারে। বঙ্কিমের ভাষায়ঃ

"আকাশে চাঁদ উঠিল না, মেঘ আসিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা, নীলিমা সকল ঢাকিল * * * অনন্ত অন্ধকার * * * সেই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী * * * শৈবলিনী অন্ধকারে গিরি আরোহণ আরম্ভ করিল। অন্ধকারে শিলাখণ্ড সকলের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র লতা-গুল্মমধ্যে পথ পাওয়া যায় না; তাহার কণ্টকে ভগ্ন শাখাগ্রভাগের, বা মূলাবশেষের অগ্রভাগে, হস্তপদাদি ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। * * * কণ্টকময়, হিংস্রকজন্তুপরিবৃত পার্বত্যারণ্যে * * * ক্ষতবিক্ষত চরণে শোণিতাক্ত কলেবরে ক্ষুধার্ত পিপাসাপীড়িত শৈবলিনী গিরি আরোহণ করিতে লাগিল। * * * ঘোরতর মেঘডম্বর * * * শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল জগতে প্রস্তর, কণ্টক এবং

অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই, * * * শৈবলিনী হতাশ হইয়া সেই কণ্টকবনে উপবেশন করিল। * * * বিদ্যুৎ চমকিত হইল * * * গম্ভীর মেঘগর্জন * * * নিদাঘবার্তা * * * ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি * * * তারপর দিগন্তব্যাপী গর্জন। সে গর্জন বৃষ্টির, বায়ুর এবং মেঘের * * * কোথাও ভীত পশুর চিৎকার * * * অঙ্গের উপর বৃক্ষলতাগুল্মাদির শাখা সকল বাত্যাতাড়িত হইয়া প্রহত হইতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার প্রহত হইতেছে। * * * অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইল। * * * শৈবলিনী সেইখানে বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিল * * * তখন তাঁহার গার্হস্থ্যসুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল * * * এমন সময় সেই মনুষ্যশূন্য পর্বতে সেই মহাঘোর অন্ধকারে * * * কে তাহাকে ভুজোপরি উত্থিত করিয়া কোথায় লইয়া গেল।"

তৃতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে (অষ্টম পরিচ্ছেদ) বর্ণিত এই দৃশ্যের সঙ্গে আরও কিছু যোগ করুন (চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ):

"মহান্ধকারময় পর্বত গুহায় পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুইয়া শৈবলিনী * * * কেবল অন্ধকার * * * এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভূতা হইল। ভয়? তাহাও নহে। মনুষ্যের স্থিরবুদ্ধিতার সীমা আছে, শৈবলিনী সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। * * * প্রায় দুই দিন অনশন *** পথ শ্রান্তি * * * বাত্যাবৃষ্টিজনিত পীড়া ভোগ * * * এই ভীষণ দৈব ব্যাপার (অন্ধকারে কোন মহাকায়ের দ্বারা অন্যত্র অপসারণ) * * * দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—শৈবলিনী অপহৃতচেতনা হইয়া অর্ধ নিদ্রাভিভূত, অর্ধ জাগ্রতাবস্থায় রহিল। গুহাতলস্থ উপলখণ্ড সকলে পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত হইতেছিল।"

এইবার শৈবলিনীর স্বপ্নদর্শন। যে গঙ্গাবক্ষে শৈবলিনী সন্তরণ করেছিলেন প্রতাপের সঙ্গে সেই অনন্তবিস্তৃতা নদীটি শৈবলিনীর হতাশ হৃদয়ে এইভাবে প্রতিভাত হল। "শৈবলিনী দেখিল সম্মুখে এক আসন্ন বিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই—দুই কূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোত বহিতেছে। * * * যে মহাকায় পুরুষ তাহাকে পর্বত হতে ধৃত করিয়া এই নদীতীরে বসাইল। সেই প্রদেশে রৌদ্র নাই, জ্যোৎস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোক মাত্র নাই।" পূর্বে যে অংশ আমরা উদ্ধৃত করেছি সেই অংশের প্রথমেই আমরা এই ধরণের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে শৈবলিনীকে প্রথম লক্ষ্য করেছি। ("আকাশে চাঁদ উঠিল না… গিরি উপত্যকায় একাকিনী"—অংশ দেখুন)। "মহাকায় পুরুষ তখন হস্তস্থিত

বেত্র প্রহারের জন্য উত্থিত করিলেন *** বেত্র জলন্ত, লোহিত, লৌহ নির্মিত *** শৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিল।" পূর্বের উদ্ধৃতাংশে শৈবলিনীর 'পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যা'র কথা এই প্রসংগে স্মরণ করা যাক আর স্মরণ করা যাক সেই দৃশ্যে অন্ধকার আকাশের মধ্যে লোহিত লৌহবৎ বিদ্যুতের মুহুর্মুহুঃ চমক। আরও স্মরণ করা যাক যে শৈবলিনীর শরীরের উপরে বায়ুতাড়িত বৃক্ষলতাগুল্মাদির শাখা বারে বারে প্রহার করেছে। এই স্বপ্নের মধ্যে শৈবলিনীর শারীর ক্লেশ ও মানস যন্ত্রণার একটি চমৎকার সংমিশ্রণ আমরা লক্ষ্য করি। স্বপ্নে শৈবলিনী শুনলেন, "হৃদয়বিদারক আর্তনাদ, পৈশাচিক হাস্য, বিকট হুঙ্কার, অশনিপতন, শিলাঘর্ষণ, অগ্নিগর্জন। *** ভীমনাদে প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল। *** শীতে শত সহস্র ছুরিকাঘাতের ন্যায় অঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল।" পূর্বে উদ্ধৃতাংশে দিগন্তব্যাপী গর্জনের সঙ্গে ভীত পশুর চিৎকার ও উপলখণ্ডের অবতরণ শব্দ এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। শীতে তিনি কী ভাবে ক্লিষ্ট হয়েছিলেন সে বর্ণনাও স্মরণে আনা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর স্বপ্নদর্শনের সঙ্গে সেই স্বপ্নের উপযোগী দৈহিক ও মানসিক অবস্থার একটি চমৎকার পূর্বপ্রস্তুতি করেছেন। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র এই স্বপ্নের মধ্যে আপন নীতিবাদ-প্রচার সুকৌশলে সংগুপ্ত করেছেন। কপালকুণ্ডলার স্বপ্নের মধ্যে তার অবচেতন মনের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে স্বপ্ন ভবিতব্যের ইঙ্গিত রূপেও বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের মধ্যে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ভবিতব্যের দ্বার বঙ্কিমচন্দ্র উদঘাটিত করেন নি। তাই চন্দ্রশেখর গ্রন্থে শৈবলিনীর স্বপ্ন দর্শন বঙ্কিমের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার একটি চমৎকার পরিচয় স্থল।

'চন্দ্রশেখ'র গ্রন্থে বর্ণনা

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রতিভা কোথাও গদ্যকবিতাধর্মী ভাষায়, কোথাও অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায়, আবার কোথাও "ধ্বনিজাত" রসের মধ্যে আপনাকে সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত করেছে। গদ্যকবিতাধর্মী ভাষার উদাহরণ হিসাবে নিম্নের উদাহরণগুলি দেখুন—

(ক) জল দুলিয়া দুলিয়া
নাচিয়া নাচিয়া,
ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে।

—(চন্দ্রশেখর : উপক্রমণিকা : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

(খ) মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। ভীরু কবির কবিতা কুসুমের ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে তবু ফোটে না। মানিনী স্ত্রীলোকের মানকালীন কণ্ঠাগত প্রণয় সম্বোধনের ন্যায়, ফোটে ফোটে তবু ফোটে না।

—(ঐ : ১।১)

(গ) নীচে নদী অনন্ত ;
পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত ;
তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত ;
উপরে আকাশ অনন্ত ;

—(ঐ : ৩।৪)

(ঘ) কেন আমি ভুলিলাম, কেন মজিলাম—কেন মরিলাম !

* * *

আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া—আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ ?
কেন না দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম !
সেই যে ভাষা পরিষ্কৃত পরিস্ফুট,
হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত, স্নেহপরিপ্লুত
মৃদু, মধুর, পরিশুদ্ধ—
কিসের প্রতাপ !
কেন মজিলাম—কেন মরিলাম—কেন কূল হারাইলাম !

—(ঐ : ৪।৩)

(ঙ) যখন নৈশ নীলাকাশে চন্দ্রোদয় হয় তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে ;
যখন সুন্দরীর সজল নীলেন্দীবর লোচনে বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে ;
......আর যখন তোমার গৃহিণীর পাদপদ্মে ডায়মনকাটা মলভাস্থ লুটাইতে থাকে তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।

—(ঐ : ৫।৩)

নিম্নলিখিত অংশটির গদ্য প্রায় সমমাত্রিক ধ্বনিপ্রধান কবিতার ন্যায়—

(সেই) নৈশ গঙ্গা বি | চারিণী তরণী
(মধ্যে) নিদ্রা হৈলে জা | গিল শৈবলিনী।

প্রকৃতিবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতের শব্দাড়ম্বর পরিত্যাগ ক'রে অপূর্ব রসসৃজনী-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—"যুবতীর হস্তপদ সঞ্চালনে জল ফোয়ারা কাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলেরও হিল্লোলে যুবতী হৃদয় নৃত্য করে। দুই-ই সমান। জল চঞ্চল, এই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি? পুষ্করিণীর শ্যামল জলে স্বর্ণ রৌদ্র ক্রমে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে সব শ্যাম হইল—কেবল তালগাছের অগ্রভাগ স্বর্ণ পতাকার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।"

অন্যত্র বিপরীতধর্মী চিত্রের সাহায্যে রস সৃষ্টির অনবদ্য উদাহরণ দেখুন :—

(ক) চন্দ্রশেখরের বিকৃত কণ্ঠ শুনিয়া রোরুদ্যমানা পরিচারিকাও নিস্তব্ধ হইল। চন্দ্রশেখর আবার ডাকিলেন। গৃহমধ্যে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কেহ উত্তর দিল না।

ততক্ষণ শৈবলিনীর চিত্রিত তরণীর উপর গঙ্গাম্বু-সঞ্চারিত-মৃদুপবনহিল্লোলে ইংরাজের লাল নিশান উড়িতেছিল— মাঝিরা সারি গাহিতেছিল।

—(ঐ : ১। ৫)

(খ) সেই অন্ধকার রাত্রে রাজপথে দাঁড়াইয়া দলনী কাঁদিতে লাগিল। মাথার উপর নক্ষত্র জ্বলিতেছিল— বৃক্ষ হইতে প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধ আসিতেছিল—ঈষৎ পবনহিল্লোলে অন্ধকারাবৃত বৃক্ষপত্র সকল মর্মরিত হইতেছিল। দলনী বলিল, "কুলসম !"

—(ঐ : ২। ২)

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অনুপ্রাস ব্যবহারের উদাহরণ হিসাবে নিম্নের উদ্ধৃতিটুকু দেখুন :—

'গঙ্গার তর তর রব সে ব্যঙ্গ সঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়া গেল।'

বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশে গদ্যের style-এ আমরা ভীষণ বঙ্কিমী অনুপ্রাসের উদাহরণ ১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধার করেছি। 'দুর্গেশনন্দিনী' গ্রন্থে গদ্যের ভাষাতে স্বরবর্ণের অনুপ্রাসও লক্ষ্য করা হয়েছে (পৃ· ৭৬ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী কালের গদ্যে অনুপ্রাস বিলোপের পথে। এখানে অনুপ্রাস সুন্দর ও সংযত।

পরিকল্পনাগত ত্রুটি ও অসঙ্গতি

'মৃণালিনী' গ্রন্থের ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে 'সে' ও 'তিনি' একই নামের সর্বনাম রূপে পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরণের ভাষাগত ত্রুটি 'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থে অল্প পরিমাণে আছে। যেমন—

"নৌকারোহী একজন দেখিল—প্রতাপ ডুবিল। সে লাফ দিয়া জলে পড়িল। নৌকারোহী চন্দ্রশেখর শর্মা। চন্দ্রশেখর সন্তরণ করিয়া, প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠিলেন।" * * * "প্রতাপ বলিলেন" "প্রতাপ বলিল" এধরণের অনেক প্রয়োগও আছে।

বিরাম চিহ্ন প্রয়োগ বিষয়ে লক্ষ্য করা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থে অত্যধিক পরিমাণে "ড্যাস" বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করেছেন। এবিষয়ে মাত্রাতিরেক হয়েছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে।

হিন্দী ভাষার ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও কিছু কিছু অশুদ্ধ প্রয়োগ করেছেন, যেমন "এ দোসরা চাঁদ সুলতানা" বা "পাকড়ো, হামারা বিবি।"

গ্রন্থে সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি চরিত্র বা ঘটনা-পরিকল্পনাগত অস্বাভাবিকত্ব। সে ত্রুটিও এ গ্রন্থে আছে:

(ক) ইতিহাস মতে-একথা সত্য যে গুরগন খাঁ মীরকাশিমের সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হয়ে ইউরোপীয় ধাঁচে দেশী সৈন্য শিক্ষিত করেছিলেন এবং অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পিত গুরগন খাঁ "কামান বন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন, তাহা ইউরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল" (চন্দ্রশেখর : ২।২)। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উচ্ছ্বাসের কারণ আমাদের জানা নেই।

(খ) প্রতাপ সম্বন্ধে আমরা এক স্থলে শুনি—"চন্দ্রশেখর নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমিদার। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা এবং দেশবিখ্যাত নাম" —(চন্দ্র : ২।৪)।

অন্যত্র সেই প্রতাপ যখন ফষ্টরের নৌকা হ'তে শৈবলিনীকে উদ্ধার করলেন তখন চিৎকার ক'রে বললেন, "শুন আমার নাম প্রতাপ রায়। নবাবও আমাকে ভয় করেন।" প্রতাপের এই আত্মশ্লাঘা অর্থহীন। তিনি নবাবের সরকারে

কাজ করছেন। এখন জমিদার হ'লেও অকারণে 'নবাবও আমাকে ভয় করেন' বলার কোনও ঘটনা ঘটেনি।

অন্যত্র নবাব যে তাঁকে জানেন না একথাই আমরা শুনতে পাই। শৈবলিনীকে পরবর্তী কালে (চন্দ্র : ৩/২) মীরকাশিম প্রশ্ন করেছেন

"প্রতাপ কে? তাহার বাড়ী কোথায়?"

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিল।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল?

শৈ। সরকারের চাকরী করিবেন বলিয়া।"

প্রতাপ নবাব সরকারে চাকরী ক'রে স্বীয়গুণে উন্নতি লাভ ক'রে বর্তমানে জমিদার হয়েছেন (দ্বিতীয় খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে), তিনি নূতন ক'রে আবার সরকারে চাকরীর জন্য আসবেন এ-কথার অর্থ কি? এখানে দেখা যাচ্ছে নবাব তাঁকে জানেন না! নবাবের এই উক্তির আলোকে প্রতাপের আত্মশ্লাঘা-প্রকাশক উক্তি "নবাবও আমাকে ভয় করেন" সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে না কি?

(গ) প্রতাপ যখন শৈবলিনীকে উদ্ধার করতে যান তখন ভৃত্য রামচরণের অব্যর্থ গুলিতে ফষ্টরের তেলিঙ্গা প্রহরী নিহত হয়। তার মৃতদেহ জলে পড়ে যায়। জলে পড়ামাত্র সেই মৃতদেহ ভাসতে ভাসতে চলে যায়। "লরেন্স ফষ্টর বাহিরে আসিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার 'তেলিঙ্গা' প্রহরী অন্তর্হিত হইয়াছে—নক্ষত্রালোকে দেখিলেন, তাহার মৃতদেহ ভাসিতেছে।... কলকল রবে অনন্তপ্রবাহিণী গঙ্গা ধাবিত হইতেছেন। সেই স্রোতে প্রহরীর শব ভাসিয়া যাইতেছে" (চন্দ্র : ২/৫)। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি শবদেহ জলে ভাসে?

(ঘ) প্রতাপ যখন শৈবলিনীকে ফষ্টরের নৌকা হ'তে উদ্ধার করেন তখন নৌকাগুলি গঙ্গার উপরে ছিল। প্রতাপ সাঁতরে নৌকার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি জলে দাঁড়িয়ে "এক লাফ দিয়া বজরার উপর উঠিলেন।" জল থেকে লাফ দিয়ে একেবারে উঁচু বজরার উপরে ওঠা যায় কিনা তা সাঁতারু পাঠক বিচার করুন।

(ঙ) প্রতাপ হাল ধরা অবস্থায় "দুইটি বন্দুক তাহাদের উপর লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন।".. (চন্দ্র : ২/৫)। এ ঘটনাও বিচার্য।

(চ) প্রথম খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে নাপিতানী বেশে সুন্দরী ঠাকুরঝি যখন শৈবলিনীর উদ্ধারের চেষ্টা করেন তখন "একটা চরে শৈবলিনীর পাক হইতেছিল—এখনও হিন্দুয়ানী আছে—একজন ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল।" অন্যত্র আমরা

শুনি লরেন্স ফষ্টর চন্দ্রশেখরকে বলছেন, "একদিনও আমার অন্ন বা আমার স্পৃষ্ট অন্ন স পায় নাই, সে নিজে রাঁধিত।" (চন্দ্র: ৬৭)। শৈবলিনীও চন্দ্রশেখরকে বলেছেন, "প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছি।" (চন্দ্রঃ ৬৬)। প্রথম খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত 'ব্রাহ্মণের পাক' তাহ'লে অর্থহীন?

(ছ) মৃত্যুর পূর্বে প্রতাপ রমানন্দ স্বামীকে বলেছেন যে তিনি "ষোড়শ বৎসর" শৈবলিনীকে কত ভালবেসেছেন তা কেউ জানে না। এক্ষেত্রে ষোড়শ বৎসরের অর্থ কি? শৈবলিনীর বিবাহিত জীবন কি ষোড়শ বৎসরের? বিবাহের আট বছর বাদে আখ্যায়িকার সূত্রপাত। বাকী আট বছর আখ্যায়িকার ঘটনাকাল? তাহলে মীরকাশিম ও ইংরাজের সংঘর্ষ কি আট বছর ব্যাপী? এই হিসেবে (ঘটনার কাল আটবৎসর ধরলে) শেষ দৃশ্যে শৈবলিনীর বয়স (১২ + ১৬ = ২৮) আটাশ, চন্দ্রশেখরের (৩২ + ১৬ = ৪৮) আটচল্লিশ ও প্রতাপের (২০ + ১৬ = ৩৬) ছত্রিশ। অন্যভাবে "ষোড়শ বৎসর" ব্যাপী ভালবাসার অর্থ করলে দাঁড়ায় যে শৈবলিনীর বিবাহের আট বছর পূর্ব হ'তে প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবাসতেন। বিবাহকালে শৈবলিনীর বয়স বার এবং প্রতাপের বয়স কুড়ি। তাহ'লে প্রতাপের বয়স যখন বার এবং শৈবলিনীর চার তখন থেকেই কি তিনি শৈবলিনীকে ঐ ধরণের ভালবেসেছেন?

এ সমস্ত দোষত্রুটি ছাড়া গ্রন্থের মধ্যে উপকাহিনীর বিস্তৃতি আছে। কোথাও কোথাও দলনী বেগমের-বিড়ম্বিত ভাগ্যের করুণ আর্তনাদ শৈবলিনীর দিক হ'তে আমাদের দৃষ্টি অপসারিত করে। দলনী বেগমের পাতিব্রত্য ও শৈবলিনীর অসতীত্বের বৈপরীত্য প্রদর্শনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তা বিস্তারিত করেছেন মনে করলে মীরকাশিম-দলনীর কাহিনীর অপ্রয়োজনীয় বিবৃদ্ধির একটা সঙ্গত কারণ পাওয়া যায়। কিন্তু শৈবলিনীর আত্মদোষ স্বীকৃতির পর লরেন্স ফষ্টরের জবানবন্দীতে ঘটনা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয়নি। কাহিনী এক স্থলে দাঁড়িয়ে পাক খেয়েছে। কাহিনী পরিকল্পনায় এ অংশ মারাত্মক ত্রুটির চিহ্ন বহন করে।

এ সব সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' একটি অনবদ্য উপন্যাস। কাহিনী, চরিত্রচিত্রণ, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, জীবনদর্শন, বর্ণনা প্রভৃতি দিক হ'তে বঙ্কিমপ্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই গ্রন্থে লক্ষিত হয়।

(২) অনেক স্থলে শব্দপ্রয়োগ যথেষ্ট সতর্কতার চিহ্ন বহন করে না। বঙ্কিমচন্দ্র-ব্যবহৃত শব্দগুলি দেখুন ঃ—

'রজনী দারিদ্র্যাবস্থাপন্না (২/৫) ('দরিদ্র' অর্থে) ;

'পুষ্পনারী' ('ফুলওয়ালী' অর্থে) ;

'তবে সুতরাং শুনাইতে বাধ্য হইব' ('তবে' অর্থে ; ৪/৩)।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় অসাধারণ উৎকর্ষ ও সাধারণ অনবধানতার এমন মিশ্রণ ঘটেছে যে সত্যই মনে হয়—

প্রায়েণ সামগ্রবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ।

নবম পরিচ্ছেদ

ত্রয়ী লঘুকাহিনী

যুগলাঙ্গুরীয় ঃ রাধারাণী ঃ ইন্দিরা

সরকারী চাকুরীর গুরু দায়িত্ব ও গম্ভীর সাহিত্যচর্চার ফাঁকে ফাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দোচ্ছল মনটি মাঝে মাঝে যে অসম্ভবের রাজ্যে পাড়ি জমিয়েছে তারই বিশিষ্ট প্রমাণ—"ইন্দিরা", "যুগলাঙ্গুরীয়" ও "রাধারাণী"। সেক্সপীয়রের মন ও শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডাউডেন বলেছেন, যে, "সেক্সপীয়র যখন 'As You Like It' গ্রন্থটি রচনা করেন তখন তিনি নিজেই আনন্দ জগতের বাসিন্দা।" নিঃসন্দেহে একথা বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীজীবন সম্বন্ধেও সত্য। যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা উপন্যাস-প্রবন্ধের ক্ষেত্রে নানা গুরুগম্ভীর পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিমগ্ন দেখতে পাই সেই বঙ্কিমচন্দ্রের লঘু আনন্দ-চঞ্চলতার অনবদ্য চিত্র এই তিনটি কাহিনী। যে বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী কালে উপদেশ-সমৃদ্ধ গুরুগম্ভীর 'ত্রয়া' উপন্যাস দিয়েছেন, তিনি এখানে পরিহাসসমুজ্জ্বল উপকথাধর্মী 'ত্রয়ী' লঘু কাহিনী পরিবেশন করেছেন। 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' এই তিনটি রচনাকে ঠিক উপন্যাসের মধ্যে ফেলা চলে না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম প্রকাশের পরবর্তীকালে 'উপকথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। এই তিনটি রচনার মধ্যে অলীক অবাস্তবতার সঙ্গে কোন বিরোধ নেই। উপকথা বা রূপকথা রাজ্যের অলিতে গলিতে যে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, পক্ষিরাজ ঘোড়া, অচিনপুরের রাজপুত্রের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনটি রচনার ক্ষেত্রেই আমাদের সেই সম্ভব-অসম্ভবের সন্দেহবিহীন নির্বাধ আনন্দের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যে প্রতিকূল দৈব আমাদের বাস্তব জীবনে ব্যর্থতা ও বেদনার সৃষ্টি করে রূপকথার রাজ্যে তা মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত নয়নাভিরাম রূপে চিত্তে সুখবিধান করে। আরব্য রজনীর জীবন-আলেখ্যের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের অংশটুকু যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে তা যেমন এক ধরণের প্রেমকাহিনীর অবাস্তব চিত্র হয়ে দেখা দেয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়' সেই শ্রেণীর।

যুগলাঙ্গুরীয়

বাল্য প্রণয়ী হিরণ্ময়ী ও পুরন্দরের পারস্পরিক আকর্ষণ যখন যৌবনের রক্তরাগে রঞ্জিত হয়েছে তখন প্রতিকূল দৈব (জ্যোতিষের গণনায়) মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। দুই প্রণয়ীর মধ্যে জেগেছে বিরহের সুদীর্ঘ যবনিকা। পুরন্দর দেশ ত্যাগ করেছেন, হিরণ্ময়ী অনন্যচিত্তে তাঁকে ধ্যান করেছেন। তারপর সেই বিচ্ছেদের দিনে অন্ধকারে চোখ বাঁধা অবস্থায় কার সঙ্গে বিবাহিত হয়েছেন হিরণ্ময়ী নিজে জানেন না। তারপর সে স্বামীর সঙ্গে তার কোন সাক্ষাৎ হয়নি। দীর্ঘ বিচ্ছেদের অন্তে পুরন্দর ফিরেছেন অজ্ঞাতবাস হতে। কিন্তু আজ হিরণ্ময়ীর কি দেবার আছে? মনের মধ্যে মন লুকিয়ে রাখা ছাড়া আর কিইবা করার আছে? কিন্তু উপকথার রাজ্যে 'অসম্ভব'ও সম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যে প্রতিকূল দৈব জ্যোতিষের গণনায় উভয়ের মিলনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছিল সেই প্রতিকূল দৈবই মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষণতঃ অবনত করে হিরণ্ময়ীর চরণ বন্দনা করেছে। সমস্ত কুহেলিকাচ্ছন্ন অতীতের মধ্যে জ্যোতির্ময় সত্যের আবির্ভাব ঘটেছে। হিরণ্ময়ী জেনেছেন অন্ধকারের মধ্যে চোখ বাঁধা অবস্থায় তিনি পুরন্দরকেই বিবাহ করেছেন। দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়েছে। রজনীগন্ধার বনে ঝড়ের শেষে শুভ্র জ্যোৎস্নার হাসি ফুটেছে। চরিত্রচিত্রণ, বাস্তববোধ, বর্তমান সমস্যা এ সকলের কোন কিছুর দ্বারাই পরিচিহ্নিত নয় 'যুগলাঙ্গুরীয়'। রূপকথা রাজ্যের একখানি পাতা বঙ্কিমচন্দ্র এখানে পাঠকসমাজের সামনে মেলে ধরেছেন।

রাধারাণী

'রাধারাণী' গল্পটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্থানে ও কালে বর্তমান বাস্তব জগতের সামীপ্যে এসে পড়েছেন। শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী মাহেশে একটি রথের দিনে রাধারাণী নামে একটি মেয়ে ফুলের মালা বেচতে এসেছিল। প্রথম দৃশ্যের মেয়েটি দশ এগারো বছরের অভাগিনী বালিকা। শেষ দৃশ্যের সেই রাধারাণী ঊনবিংশ ভাদ্রের ভরা নদী। রথের মেলার দিনে ফুলের মালা কেউ কেনেনি। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি এসেছে আর রাধারাণীর চোখে নেমেছে জলের ধারা। পয়সা যদি না নিয়ে যেতে পারে বালিকা, মায়ের হাতে কি দেবে? রাধারাণীর মা লক্ষপতির গৃহিণী হলেও স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনের চক্রান্তে কপর্দক-শূন্য। ভাঙ্গা কুঁড়ের বাসিন্দা। হাইকোর্ট পর্যন্ত মকদ্দমায় পরাজিত হবার পর

তিনি প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করেছেন বটে। কিন্তু বর্তমানে চরমতম দারিদ্র্যের মধ্যে একটি মাত্র মেয়েকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকার দুর্বল প্রয়াস করেন। সেই মেয়ে রাধারাণী মায়ের দুঃখ বোঝে। আজ এই রথের দিনে খালি হাতে বাড়ী ফিরে গেলে তাদের চলবে কি করে? সেই মেঘদুর্দিন অন্ধকারে একটি দয়ালু মানুষ এগিয়ে এলেন। কিনলেন তিনি মালা। পৌঁছে দিয়ে গেলেন তিনি রাধারাণীকে তার কুঁড়ে ঘরে। অন্ধকারে ডবল পয়সা বলে তার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখে গেলেন নোট। সেই নোটে নাম লেখা রুক্মিণীকুমার। নিকটবর্তী একটি কাপড়ের দোকান হতে দোকানীকে দিয়ে কাপড়ও পাঠিয়ে দিলেন। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত এই দয়ালু মানুষটি মিলিয়ে গেলেন অন্ধকারে। কিন্তু রাধারাণীর মনে একটি রুক্মিণীকুমারের মূর্তি জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠতে লাগল। তারপর রাধারাণী বালিকা হতে যুবতী হলেন, প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির অধিকারিণী হলেন। কিন্তু কোথায় গেল সেই রুক্মিণীকুমার? সেই রুক্মিণীকুমারের নামে তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। রুক্মিণীকুমারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। অবশেষে একদিন পঁয়ত্রিশ বছরের এক সুপুরুষ ব্যক্তি হাজির হলেন সেখানে। তাঁর নাম দেবেন্দ্রকুমার। রুক্মিণীকুমার তাঁর নাম নয়। কিন্তু রুক্মিণীকুমারের ছদ্মনামে তিনি রাধারাণী নামে একটি বালিকাকে দীর্ঘ আট বৎসর পূর্বে সাহায্য করেছিলেন। তারপর হতে সেই রাধারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই চেষ্টা তাঁর সার্থক হয়নি। বিজ্ঞাপনের ফলে তাঁর কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল। এইবার দেখলেন এক অপূর্ব লাবণ্যবতী প্রখর-ব্যক্তিত্বসম্পন্না বুদ্ধিমতী ধনশালিনী এক যুবতীকে। রাধারাণীও দেখলেন অনেক কালের ওপার হতে তাঁর আরাধ্য দেবতা তাঁরই দ্বারপ্রান্তে উপনীত। কথায় কথায় জানলেন যে রুক্মিণী পত্নীবিহীন। রুক্মিণীও জানলেন রাধারাণী কার সাধনায় দীর্ঘ প্রতীক্ষায় নিরত। অনুকূল ভাগ্য দুটি প্রতীক্ষাস্পন্দিত হৃদয়কে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করল। 'যুগলাঙ্গুরীয়' নিছক রূপকথা শ্রেণীর। 'রাধারাণী' স্থানে এবং কালে আমাদের নিকটবর্তী হলেও কাহিনীর প্রকৃতি বিচারে বাস্তব রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমায় তার অবস্থিতি। এ আখ্যায়িকা কোন ক্রমেই উপন্যাস নয়। আকৃতি যেমনই হোক প্রকৃতি বিচারে 'রাধারাণী'কে ছোট গল্পও বলা চলে না। একটি ক্ষুদ্রাবয়ব অবাস্তব আখ্যায়িকার মধুর রূপায়ণই 'রাধারাণী'র বৈশিষ্ট্য।

চরিত্রচিত্রণ বা বাস্তববোধ কোন দিক হতেই এ গ্রন্থের বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যাঁরা সমস্যাজর্জর, বস্তুভারপ্রপীড়িত উপন্যাসের কর্দমপঙ্কলিপ্ত পরিবেশ থেকে আনন্দজগতে হাঁপছাড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তাঁদের পক্ষে 'রাধারাণী' একটি সুন্দর স্বর্গের দ্বার অবারিত করে দেয়। বর্ণনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র 'রাধারাণী'র মধ্যে যে 'যুগলাঙ্গুরীয়' অপেক্ষা অধিক মনঃসংযোগ করেছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ আমরা 'রাধারাণী' গ্রন্থের পঞ্চম হতে অষ্টম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিশেষ অনুধাবন সহকারে পড়তে বলি। অংশটির ঘটনাকাল কয়েকটি ঘণ্টা মাত্র, কিন্তু প্রাণোচ্ছল সংলাপের মধ্যে এই ঘণ্টা কয়েকের পুনর্মিলন দৃশ্যটি অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছে। নামকরণের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছেন। বৈষ্ণবপদাবলীপ্লাবিত বাংলাদেশে পাঠক-পাঠিকার নিকট একথা বলার প্রয়োজন নেই যে পরম প্রেমের আধারভূতা রাধা ঠাকুরাণী কৃষ্ণে সমর্পিতপ্রাণ। কৃষ্ণেই তাঁর জীবনের প্রধান আলম্বন এবং উদ্দীপন। কৃষ্ণের আর এক নাম যে রুক্মিণীরমণ একথা সবাই জানেন। (বৈয়াকরণ নিশ্চয়ই রুক্মিণীহরণকে রুক্মিণীকুমার বলতে চাইবেন না।) রাধারাণীর রূপ বর্ণনার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সকল দুঃখের অবসানে, সকল সংশয়ের শেষে যখন রুক্মিণীকুমারকে রাধারাণী স্পষ্টভাবে জানতে পারলেন তখন তাঁর চিত্তের বিহ্বল আনন্দ, দুচোখের বাঁধভাঙা অশ্রুর মধ্য দিয়ে যে ভাবে অভিব্যক্ত হল তা বঙ্কিমচন্দ্র অনবদ্য ভাষায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কি অপূর্ব রাধারাণীর সেই রূপের বর্ণনা! "ফুলের কুঁড়ির ভিতর যেমন জল ভরা থাকে, ফুলটি নীচু করিলে যেমন ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িয়া যায়, রাধারাণী মুখ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই তাহার চোখের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল।"

বঙ্কিমচন্দ্র রাধারাণীর জবানবন্দীতে যে ভাবে **পাঠিকা-সম্বোধন** করেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঠিকা-সম্বোধনটি দেখুন :—"হাঁ গা, এমন করিয়া কি কথা কহা যায় গা? যাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, 'প্রাণেশ্বর! দুঃখিনীর সর্বস্ব! চিরবাঞ্ছিত!' বলিয়া যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে, আবার যাকে সেই সঙ্গে 'হাঁ গা, সেই রাধারাণী পোড়ারমুখী তোমার কে হয় গা' বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে,—তাহার সঙ্গে 'আপনি' 'মশাই' 'দর্শন দিয়াছেন' এই সকল কথা নিয়ে কি কথা কহা যায় গা? তোমরা পাঁচ জন রসিকা, প্রেমিকা, বাক্‌চতুরা, বয়োধিকা ইত্যাদি আছ তোমরা পাঁচজন বল দেখি, ছেলেমানুষ রাধারাণী কেমন ক'রে এমন কথা কয় গা?"

ইন্দিরা

উনিশ বছরের আর একটি যুবতীর মেঘে ঢাকা ভাগ্যাকাশের মধ্যে 'বাদল গেছে টুটি'র গান 'ইন্দিরা'। যে হৃদয় সকল বিপরীত ভাগ্যকে অস্বীকার ক'রে মিলনের আনন্দে যৌবনকে সার্থক করে তারই একটি অনুপম কথাচিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় 'ইন্দিরা'র ন্যায় একটি কথা-কাহিনী বোধ হয় আর নেই। যে বয়সে নারী প্রগল্‌ভা হয়, সেই উনবিংশতি বসন্তের প্রসন্ন হাসি ইন্দিরার সর্বাঙ্গে। পিতৃগৃহে অর্থের অভাব ছিল না, দেহে রূপ-যৌবনের অসঙ্গতি ছিল না। মনে ছিল প্রেম, চোখে ছিল কটাক্ষ, আর মুখে ছিল হাসি। কোটিপতির কন্যা বিবাহিত জীবনের প্রথম অধ্যায়ে পাল্‌কি বেহারার ঘাড়ে চেপে পতি-সমাগমে যাত্রা করেছিলেন। হঠাৎ ইন্দিরার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিল। শ্বশুরবাড়ী চলেছিলেন তিনি মনের আনন্দে। কিন্তু সেই প্রিয়মিলনের অভিসারে প্রতিকূল দৈব একটা মস্ত বড় প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করল। ডাকাতের হাতে পড়লেন ইন্দিরা। সম্পূর্ণ নিরাভরণ অবস্থায় আশ্রয়প্রার্থী হলেন এক জায়গায়। সেখান থেকে রাঁধুনীর কাজ নিয়ে ইন্দিরাকে আসতে হল সুভাষিণীর বাড়ী। যার পিতৃগৃহে অভাব ছিল না দাসী-চাকরাণীর, তাঁকে বেছে নিতে হল রাঁধুনীর জীবন। কিন্তু রন্ধনশালা ইন্দিরার প্রসন্ন হাসির অভিষেকে বিড়ম্বিত ভাগ্যের মধ্যেও ক্রন্দনশালা হয়ে উঠল না। সুভাষিণী তাঁর সখী হয়ে উঠলেন, র-বাবু তাঁর শুভানুধ্যায়ী, বৃদ্ধ রাম রাম দত্তের স্ত্রী (কালীর বোতল পর্যন্ত) কিছুটা ভিজে গেলেন। রন্ধনশালাকে আনন্দের হাসিতে নন্দনশালা করে তুললেন ইন্দিরা। সুভাষিণী শুনেছিলেন ইন্দিরার ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা, এবার স্বামী র-বাবুর সঙ্গে সুখের ষড়যন্ত্র করলেন। ইন্দিরার স্বামী উপেন্দ্রবাবু র-বাবুর মক্কেল। বৈষয়িক কাজের অছিলায় উপেন্দ্রকে আহারের নিমন্ত্রণ করলেন র-বাবু। ইন্দিরার উপর পরিবেশনের ভার দেওয়া হল বিশেষ উদ্দেশ্যে। ইন্দিরা অর্ধ অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হতে কটাক্ষের বিষ ঢেলে দিলেন। উপেন্দ্রের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। পাচিকা ইন্দিরা উপযাচিকা হয়ে রাত্রে তাঁর কাছে অভিসারে এলেন। ইন্দিরা চিনেছেন উপেন্দ্রকে। কিন্তু উপেন্দ্র চেনেন নি তাঁকে। কটাক্ষের আঘাতে উপেন্দ্রের মন যখন মিলন-লালসায় চঞ্চল তখন ইন্দিরা মনের মধ্যে আগ্রহের আগুনকে জ্বালিয়ে দিয়ে দৈহিক মিলনের সমস্ত প্রলোভনকে সামনে রেখে উপেন্দ্রকে কামনাবিহ্বল করে বিদায় নিলেন। এইবার উপেন্দ্রের মনে ইন্দিরার প্রতি তীব্র আকর্ষণ দেখা দিল।

অভিসারিকা ইন্দিরা জয়যুক্ত হলেন। কিন্তু এই জয়ের মধ্যে একটু বেদনার স্পর্শ ছিল। তাঁর রূপ এবং যৌবন উপেন্দ্রের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে বটে এটা তাঁর আনন্দ। কিন্তু কেবল আনন্দের নয় দুঃখেরও কথা। স্বামী যে রূপলালসায় কত দুর্বল তাও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। উপেন্দ্র চেয়েছেন রূপসী যুবতীকে, ইন্দিরাকে স্ত্রী বলে চিনতে পারেন নি। সুভাষিণী এবং র-বাবুর ষড়যন্ত্র সফল হল। উপেন্দ্র জানালেন এই পাচিকা ইন্দিরাকে তিনি বিবাহ করে নিয়ে যেতে চান। ইন্দিরার কাছে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁর নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রী ইন্দিরা যদি কখন ফিরেও আসে তাহলে কখন তাকে গ্রহণ করবেন না। উপেন্দ্র স্বদেশে এই পত্নীকেই তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী ইন্দিরা বলে পরিচয় দেবেন। ইন্দিরা রাজী হলেন উপেন্দ্রকে অনুগৃহীত করতে। আরও জানালেন ইন্দিরা শাপগ্রস্তা বিদ্যাধরী। তিনি ইচ্ছা করলে উপেন্দ্রের প্রথমা স্ত্রীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। উপেন্দ্র তাঁর পরীক্ষা নিতে চাইলেন। জানাতে চাইলেন তাঁর প্রথমা স্ত্রী ইন্দিরার পিত্রালয় কোথায় ছিল, কোন মুখে দরজা, বিবাহের সময় কে সম্প্রদান করেছিল আর বিবাহের পরে বাসরে ইন্দিরাকে তিনি কি বলেছিলেন, ইন্দিরাই বা কী উত্তর দিয়েছিল। শাপ-ভ্রষ্টা বিদ্যাধরীর মত এই পাচিকা এই সকল প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর দিলেন। বিহ্বল উপেন্দ্র বুঝলেন হয় ইন্দিরা নয় বিদ্যাধরী এই পাচিকা। তারপর দুজনে যাত্রা করলেন ইন্দিরার পিতৃগৃহে। সেখানে সকল সন্দেহের অবসান হল। ইন্দিরার ভাগ্যাকাশে হঠাৎ আবির্ভূত কালোমেঘ অন্তর্হিত হল।

একটি চমৎকার হাস্যোজ্জ্বল গ্রন্থ 'ইন্দিরা'। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, "আমি অনেকদিন ধরিয়া কেবল কাঁদিয়াছিলাম। অনেকদিনের পর আজ হাসিলাম, সে হাসি তামাসা দরিদ্রের নিধির মত বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল।" বঙ্কিম-চন্দ্র সত্যই প্রাণবন্যায় টলমল হয়ে ঐ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাই গ্রন্থপ্রারম্ভে তিনি শেলীর "Rarely, rarely, comest thou, Spirit of Delight" কবিতাটি উল্লেখ করেছেন। সত্যই বঙ্কিমচন্দ্রের মন এই অবস্থায় Spirit of Delight-এর দ্বারা অভিভূত ছিল এবং সেই Spirit of Delight-এর রক্তে মাংসে গড়া নারীমূর্তি ইন্দিরা।

'ইন্দিরা' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা সর্বাগ্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে বাংলা সাহিত্যে 'ইন্দিরা'ই প্রথম গ্রন্থ যেখানে একটা প্রধান চরিত্র আপন জবানবন্দীতে সমগ্র কাহিনী প্রকাশ করেছেন। 'ইন্দিরা'র পরবর্তীকালে রচিত 'রজনী' গ্রন্থে

বঙ্কিমচন্দ্র এই কাহিনী-বর্ণন-প্রণালী আরও বিচিত্র করে তুলেছেন। সেখানে এক জন সমগ্র আখ্যায়িকার বক্তা নয়। অনেকগুলি চরিত্রই সেই সমগ্র কাহিনীটিকে আংশিক ভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেই সকল খণ্ড অংশের অখণ্ড রূপই 'রজনী'।

'ইন্দিরা' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ বছরের নারীর হৃদয়ের গভীর গহনে প্রবেশ করেছেন এবং নারীর চোখে দেখা এই জগৎ সংসারেব বিচিত্র রূপ অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে আপনাকে ইন্দিরা ভাবে বিভাবিত করেছেন; এবং নারীর বিচিত্র লীলাকৌতুক এবং প্রণয় প্রবর্তনার মর্ম মূলে বসে আনন্দের বাঁশী বাজিয়েছেন। আমাদের প্রতিদিনের একরঙা সংসারের উপরে জ্যোতির্ময়ী ইন্দিরার প্রসন্ন হাস্যের অভিষেক হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল তুচ্ছতা এবং ক্ষুদ্রতার নেপথ্যে যে সৌন্দয ও মাধুর্যের একটি অবহেলিত রূপ রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র তা আশ্চয সহানুভূতিব সঙ্গে উদ্ঘাটিত করেছেন। উনিশ বছরের ভরা যৌবন নিয়ে ইন্দিরা প্রিয় মিলনের অভিসারে যে আনন্দচঞ্চল অভিযাত্রা শুরু করেছিলেন তা সুখদুঃখের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরম মংগল-জনক পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। ইন্দিরার সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আমাদের সংসারের রন্ধনশালাটি কেবল জীবন্ত হয়ে ওঠে নি সুভাষিণী, সুভাষিণীর কন্যা, তিন বৎসরের পুত্র, র-বাবু, রাম রাম দত্ত এবং কালীর বোতল পর্যন্ত পরম কৌতুকের রেখায় ভাস্বর হয়ে উঠেছেন। বৃদ্ধ রাম রাম দত্তের স্ত্রী বৃদ্ধা। তিনি সুভাষিণীর শাশুড়ী। ইন্দিরা প্রথম দর্শনেই এই শাশুড়ীর আকৃতি-প্রকৃতির একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন—

"তিনি তখন ছাদের উপর অন্ধকারে একটা পাটি পাতিয়া তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া আছেন, একটা ঝি পা টিপিয়া দিতেছে। আমার বোধ হইল, এক লম্বা কালীর বোতল গলায় গলায় কালি ভরা—পাটির উপর কাত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। পাকা চুলগুলি টিনের ঢাকনির মত শোভা পাইতেছে। অন্ধকারটা বাড়াইয়া তুলিয়াছে।"

এই কালির বোতলের ভয় সোমত্ত বয়সের মেয়েদের। বৃদ্ধ স্বামীর কাছে তাই তিনি ইন্দিরাকে পরিবেশন করতে পাঠাতে চান নি। ইন্দিরা তাঁর নারীদৃষ্টি দিয়ে এক মুহূর্তে এই কালির বোতলের অন্তঃপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে নিয়েছেন। ইন্দিরার জীবনের একপ্রান্তে যেমন কালির বোতলের অন্ধকার তেমনি অপর প্রান্তে

সুভাষিণীর পাঁচ বছরের মেয়ে হেমা ও তিন বছরের ছেলের নূতন আলো। সেই মেয়ে কেবল কথায় কথায় ছড়া কাটে, কথায় কথায় শ্লোক বলে। ইন্দিরার রান্না প্রসঙ্গে শ্লোক উদ্ধার করে বলে ঃ—

"রাঁধ বেশ, বাঁধ কেশ
বকুল-ফুলের মালা,
রাঙ্গা শাড়ী, হাতের হাঁড়ি,
রাঁধছ গোয়ালার বালা।
এমন সময়, বাজল বাঁশী
কদম্বের তলে,
কাঁদিয়ে ছেলে রান্না ফেলে
রাঁধুনী ছোটে জলে।"

এই আলো অন্ধকারের মধ্যে পথ ক'রে চলেছেন ইন্দিরা উপেন্দ্রের অভিসারে। মনে রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রের নামকরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইন্দিরা শব্দের অর্থ যে লক্ষ্মী এবং উপেন্দ্র শব্দের অর্থ যে নারায়ণ সে-কথা সবাই জানেন। পৌরাণিক লক্ষ্মী দুর্বাসার অভিশাপে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে বিষ্ণু হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে জলের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের লক্ষ্মীকে বলতে শুনি—

"রমার আশার বাস হরির উরসে
হেন হরি-হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধ গুণে।

এখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা যে উপেন্দ্র-বিরহে বেঁচেছিলেন এবং দেহে ও মনে পরিপূর্ণ যৌবনলক্ষণাক্রান্ত ছিলেন সে কেবল সুভাষিণীর স্নেহৌষধগুণে। কৃষ্ণ-বিরহে বিদ্যাপতির রাধিকা বলেছিলেন ঃ—

"পাখী যদি হউ পিয়া পাশে উড়ি জাউ

আর উপেন্দ্র-বিরহে বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা বলেছেন—

"পাখী হইতে পারিলে আজি এখনই উড়িয়া চিরবাঞ্ছিতের নিকট পৌছিতাম।"

"ইন্দিরা"র আরও অনেকস্থলে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'ইন্দিরা'তে উদ্ধৃত নিচের প্রাচীন গীতটি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—

"একা কাঁকে কুম্ভ করি কলসীতে জল ভরি
জলের ভিতরে শ্যাম রায়।

কলসীতে দিতে ঢেউ আর না দেখিলাম কেউ
পুনঃ কানু জলেতে লুকায় ॥"

বৈষ্ণব পদাবলীধৃত বসু রামানন্দের পদ প্রত্যেক পাঠকের মনে পড়বে। সত্য সত্যই বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগ, অভিসার, স্বয়ং দৌত্য, ছদ্মবেশে মিলন, মানান্তে মি· ন, রসোদ্গার প্রভৃতি পর্যায়ের কথা 'ইন্দিরা' পড়তে পড়তে আমাদের মনে আসে। আদ্যোপান্ত গ্রন্থখানি আনন্দোচ্ছল বঙ্কিমের প্রাণবন্ত কৌতুকে ভরা। পরিচ্ছেদের নামগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করুন—

শ্বশুর বাড়ী চলিলাম ; আমাকে এগ্‌জামিন দিতে হইল প্রভৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' উপন্যাস হোক বা না হোক এটি যে অত্যন্ত উপাদেয় হয়েছে এবং লঘু কাহিনী হিসেবে এ জাতীয় রচনা যে আর একটিও নেই তা বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বুঝেছিলেন। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণের ছোট 'ইন্দিরা'কে পঞ্চম সংস্করণে বড় 'ইন্দিরা'তে রূপান্তরিত করতে যে পরিমাণ পরিবর্তিত করেছেন তার ফলে তা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হয়ে গেছে। এমন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বঙ্কিমচন্দ্র আর কোনও লঘু গ্রন্থের করেন নি।

'ইন্দিরা'র প্রথম সংস্করণে—

(১) পরিচ্ছেদের নামকরণ হয়নি। পঞ্চম সংস্করণে (যে সংস্করণ আজ প্রচলিত তাতে) পরিচ্ছেদের নামগুলি কৌতুকরসে উচ্ছল।

(২) প্রথম সংস্করণ আট পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। বর্তমান প্রচলিত সংস্করণ (৫ম সংস্করণ) দ্বাদশ পরিচ্ছেদে প্রসারিত।

(৩) প্রথম সংস্করণে (ক) ছড়াগুলি নাই, (খ) 'কালির বোতল' অনুপস্থিত, (গ) শাপভ্রষ্টা অশরীরীর বৃত্তান্ত নাই, (ঘ) পরিশেষে পুনর্বিবাহে বাসর ঘরের দৃশ্য ও তৎপ্রসংগে বঙ্কিমের নীতি-উপদেশাবলী নাই। বর্তমান গ্রন্থের যে বিশেষ মাধুর্য তা বঙ্কিমের যত্নকৃত সুসংস্কারের ফলশ্রুতি।

সত্যই বাংলা সাহিত্যে কৌতুকধর্মী রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের 'ইন্দিরা' তুলনারহিত। বর্ণনভঙ্গীর দিক হ'তেও এখানে বঙ্কিমের এক অভিনব প্রয়াস। 'ইন্দিরা' গ্রন্থে নায়িকা ইন্দিরা নিজেই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এ প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব কীর্তি। পরবর্তী কালের রচনা (এ গ্রন্থে যদিও পূর্বে আলোচিত) 'রজনী' গ্রন্থের কাহিনী বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর জবানবন্দীরূপে আমাদের কাছে পরিবেশিত হয়েছে।

এ গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য **পাঠক-সম্বোধন**। বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ববর্তী উপন্যাসে যে পাঠক বা পাঠিকা-সম্বোধন করেছেন সেখানে তিনি পুরুষ লেখক। এখানে তিনি ইন্দিরা-ভাবে-বিভাবিত। "নারীরূপে পাঠকের প্রতি পরিহাস ক'রে বলেছেন, পাঠককে স্মরণ করিয়া দিতে হইবে না যে'আমি পুরুষ মানুষ নহি, মেয়ে মানুষ'।"

'ইন্দিরা'র রচনারীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য তার ঝর ঝরে ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের সকল গ্রন্থেই ভাষার উৎকট প্রয়োগ আছে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রেব সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থে অপূর্ব সুন্দব ভাবার সঙ্গে উৎকট সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। নানা ভাষাদোষও ঘটেছে। ('কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর 'ভাষাদোষ' বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু এ গ্রন্থে এ ধবণের কোনও ভাষাদোষ ঘটেনি। মাঝে মাঝে অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ভাষাও আছে যেমন—

'উঠিতেছে,
বসিতেছে,
খেলিতেছে,
হেলিতেছে,
দুলিতেছে, নাচিতেছে,
দৌড়াইতেছে, হাসিতেছে,
বকিতেছে, মারিতেছে,
সকলকে আদব করিতেছে।'

ভাষায় ইংরাজীমিশ্রিত বাংলা চমৎকার হাস্যোচ্ছলতাব সৃষ্টি করেছে, যেমন—"ও ইয়াস্, বিবিপাণ্ডব ফাষ্ট কেলাস বাবুর্চি ছিলেন।"

নারীর মুখে প্রগলভ শৃঙ্গার রসের মাধুর্য ইন্দিরার উক্তিতে—"দ্রৌপদী না হ'লে ভালো রাঁধা যায়। গোটা পাঁচেক জোটাও না, রান্না খেয়ে লোকে অজ্ঞান হবে।"

ইন্দিরা স্ত্রীজাতিব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেন, "আমি অবগুণ্ঠনবতী কিন্তু ঘোমটায় স্ত্রীলোকের স্বভাব ধরা পড়ে না। ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমন্ত্রিত বাবুটিকে দেখিয়া লইলাম।...তাঁহাকে দেখিয়াই রমণীমনোহর বলিয়া বোধ হইল।" অন্যত্র স্ত্রীলোকের স্বভাব সম্বন্ধে নায়িকা নিজেই যখন বলে, 'কি বলিব, বলিতে লজ্জা করিতেছে, সর্পের যেমন চক্রবিস্তার, কটাক্ষ আমাদিগেরও তাই।' নায়িকা ইন্দিরাকে অভিসারে চুম্বন প্রয়োগ করার কথা সুভাষিণী নিজেই বলেছেন।

"সুভাষিণী 'তবে আমার ব্রহ্মাস্ত্র শিখে নে' এই বলিয়া আমার মুখখানা তুলিয়া চুম্বন করিল।" নায়িকা ইন্দিরাও নিজের কাহিনী বর্ণনায় নিঃসঙ্কোচে বলেন, "যা শিখাইয়াছিলে, তার মধ্যে একটা বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল—সেই মুখচুম্বনটি। এসো আর একবার শিখি।"

ইন্দিরার প্রতিক্রিয়া উনিশ বছরের প্রেমচঞ্চল নারীব প্রতিক্রিয়া। হাস্যোচ্ছল নারী হৃদয়ের এই কামনার কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যেভাবে বলেছেন আর কখনও তিনি এমন লঘুভাবে অন্যত্র পরিব্যক্ত করেন নি। লক্ষ্য করাব বিষয় উপেন্দ্র ও ইন্দিরার বয়সের পার্থক্য দশ (বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী দেবীব ন্যায়) ; যখন উপেন্দ্র ৩০, তখন ইন্দিরা ২০। এই গ্রন্থ রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মীদেবী যথাক্রমে ৩৫ ও ২৫ বৎসর। মনে হয় সুখোচ্ছল বঙ্কিমচন্দ্র আপন জীবনের পরিপূর্ণ মাধুর্যকে একটি কাহিনীর পাত্রে পবিবেশন করেছেন। এমনটি আর কোথাও ঘটেনি।

নিশাকরের নিয়োগও সেই ক্রূর ভাগ্যের প্রচ্ছন্ন পরিহাস মাত্র। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে সত্যকার ভিলেন চরিত্র পাওয়া যায় না। নিশাকরকে ঠিক ভিলেন বলা চলে না। কিন্তু সে যে ভাবে রোহিণী এবং গোবিন্দলালের মনে লালসা ও ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করেছে সেই উপায়টি খাঁটি ভিলেনী বলা যেতে পারে। প্রথম খণ্ডের ঘটনাস্থান কৃষ্ণকান্তের সংসার। ঘটনার প্রধান অবলম্বন রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আসক্তি এবং ভ্রমরের অসুখ। সেই আসক্তির উদ্বোধন ক্ষেত্র বারুণী পুষ্করিণী। সেইখানে রোহিণী ডুবেছিল এবং গোবিন্দলাল সেখান হতে তুলে তার অরবিন্দতুল্য অধরে অধর সংস্থাপন পূর্বক কৃত্রিম ভাবে প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। যে-লালসার উদ্ভব বারুণী পুষ্করিণীর কূলে সেই লালসার জলাঞ্জলি দ্বিতীয় খণ্ডে শীর্ণশরীরা চিত্রা নদীর সমীপবর্তী প্রসাদপুরের বিলাসকুঞ্জে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনায় দুটি খণ্ড একটি অপরটির পরিপূরক। সমগ্র কাহিনীটি অপরূপ কয়েকটি দৃশ্যে কয়েকটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে অনির্বচনীয় রস সৃষ্টি করেছে।

সূক্ষ্ম ইঙ্গিত

সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলি কি চমৎকার। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে ধ্বনির উপর। সেই ধ্বনি রসের সৃষ্টি করে। বাচ্যার্থ সীমার বাঁধনে বাঁধা। সেই বাচ্যার্থের সীমার বাইরে ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি আমাদের নিয়ে যায়। বাচ্যার্থ অকবি বা ছোট কবির শেষ সীমা, ব্যঙ্গ্যার্থ বড় কবির প্রারম্ভপথ। বাচ্যার্থ (বা sense expressed) হল সাংসারিক দোকানদারী ; 'ব্যঙ্গ্যার্থ' (বা sense suggested) হ'ল রসিকের খাসমহল। বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা'য় যে রসের ধ্বনি সুরু করেছিলেন তা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মধ্যে আরও সুন্দর। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে তার বিশ্লেষণ করি।

(ক) প্রথম খণ্ড পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বারুণী পুষ্করিণীর পুষ্পোদ্যানে বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তানিমগ্ন গোবিন্দলালকে নিয়ে গেছেন সেইখানে যেখানে—"বেদিকামধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্ত্রীপ্রতিমূর্তি—স্ত্রী-মূর্তি অর্ধাবৃতা।...ভ্রমর পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্তি অর্ধাবৃতা দেখিয়া কালামুখী বলিয়া গালি দিত—কখনও কখনও আপনি অঞ্চল দিয়া তাহার অঙ্গ আবৃত করিয়া দিত... সেইখানে আজি গোবিন্দলাল সন্ধ্যাকালে বসিয়া দর্পণানুরূপ বারুণীর জলশোভা দেখিতে লাগিলেন।"

এই বারুণীতে, রোহিণীর জল-নিমজ্জনের পূর্বে, রোহিণী ও গোবিন্দলালের

পাপে নিমজ্জনের অব্যবহিত পূর্বে, ঐ অর্ধাবৃতা স্ত্রী-মূর্তির উল্লেখ যথেষ্ট ব্যঞ্জনাধর্মী। যে অপরূপ লালসা উদ্বোধনকারী বিস্রস্তবেশা জীবন্মৃত "স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী"কে গোবিন্দলাল জল হ'তে উত্তোলন ক'রে "তার সুধা পরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদহলাহলকলসিতুল্য রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়া ফুৎকার" দেবেন তার পূর্বপ্রস্তুতি ক'রেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ঐ 'অর্ধাবৃতা' 'কালামুখী' 'স্ত্রীমূর্তি'র উল্লেখে।

আবার এই দৃশ্যেই দেখুন—

(খ) "গোবিন্দলাল তখন সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুম-কান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন।

সেই সময়ে ভ্রমর, একটি লাঠি লইয়া, একটি বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরের কপালে লাগিল।"

চমৎকার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত!

যে বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীর প্রতি মৃত্যুবিধান দিয়ে ভ্রমর ক্ষারি চাকরাণীকে পাঠিয়েছিলেন, বারুণীর অগভীর শয্যাতল হ'তে সে রোহিণী উঠে এসেছে দুই হাতে কেবল বিষভাণ্ড নিয়ে। ভ্রমরের নিষ্ঠুর নির্দেশ রোহিণীর জীবনকে বিপর্যস্ত না ক'রে তাঁর ভাগ্যকেই বিড়ম্বিত করেছে। রোহিণী মারা গেল না। গোবিন্দলাল রোহিণীর রাঙ্গা অধরে অধর রেখে রোহিণীকে বাঁচিয়ে তুললেন; ভ্রমরকে মেরে ফেললেন।

(গ) রোহিণীকে সঞ্জীবিত ক'রে গোবিন্দলাল "বলকারক ঔষধ" পান করালেন। বলা বাহুল্য, এ 'বলকারক ঔষধ' আর কিছু নয় সুরা, 'বারুণী'। বারুণী পুকুরের পুষ্পোদ্যানে রোহিণী পান করলেন 'বারুণী সুরা'। আর চোখ দিয়ে গোবিন্দলাল পান করলেন তার বিস্রস্ত পরিপুষ্ট দেহের রূপসুরা। রোহিণীর যখন জ্ঞান হল, তখন রোহিণী—

"একদিকে স্ফাটিকাধারে স্নিগ্ধপ্রদীপ জ্বলিতেছে
আর একদিকে হৃদয়াধারের জীবনপ্রদীপ জ্বলিতেছে।"

চমৎকার ইঙ্গিত এবং পরিপূর্ণ পরিপক্ব সর্বযমক। এই পংক্তিদ্বয় আমাদের স্মরণে আনে ওথেলোর "Put out the light and put out the light" উক্তি। ওথেলো বাহিরের আলো আর জীবনের আলো উভয়কেই নির্বাপিত করতে চেয়েছেন। এখানে সেই 'মধুতের কুঞ্জবনে কেলিসদনে' একদিকে স্ফটিকের আধারে

স্নিগ্ধ প্রদীপ আর একদিকে রোহিণীর অন্ধকার জীবনের একমাত্র আলো গোবিন্দলাল, অপরূপ রূপ নিয়ে তার সামনে উপস্থিত।

(ঘ) আর একটি দৃশ্যের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত গোবিন্দলাল ও রোহিণীর মনকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। প্রথম খণ্ডের পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে গোবিন্দলাল আপনার সঙ্গে যুদ্ধে বিপর্যস্ত কিন্তু এখনও মিলন হয়নি রোহিণীর সঙ্গে। রোহিণীও গোবিন্দলালের জন্য নিন্দিত। সে কুৎসা নিন্দা তার অঙ্গের ভূষণ।...

পারস্পরিক আকর্ষণের কি চমৎকার রেখা চিত্র......

"রোহিণীর কথা প্রথমে স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল বারুণীতটে, পুষ্পবৃক্ষপরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন। বর্ষাকাল।...

......গোবিন্দ দেখিলেন, সম্মুখে রোহিণী।

গোবিন্দলাল বলিলেন, 'ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন রোহিণী ?'

রো। আপনি কি আমাকে ডাকিলেন ?

গো। ডাকি নাই। ঘাট বড় পিছল, নামিতে বারণ করিতেছিলাম। দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন ?

রোহিণী সাহস পাইয়া মণ্ডপমধ্যে উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, লোকে দেখিলে কি বলিবে ?

রো। যা বলিবার তা বলিতেছে। সে কথা আপনার কাছে একদিন বলিব বলিয়া অনেক যত্ন করিতেছি।

গো। আমারও সে-সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। কে একথা রটাইল ? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন ?

রো। সকল বলিতেছি। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি ?

গো। না আমার সঙ্গে আইস।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল, রোহিণীকে ডাকিয়া বাগানের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।"

সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে অনির্বচনীয় রসসৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথমেই কালের উল্লেখ লক্ষণীয়। বর্ষাকাল। বর্ষাকালের নিবিড় বর্ষণের সঙ্গে বিরহবেদনার একটা নিবিড় যোগ আছে। এমনই ভরা ভাদ্রের ভরা বাদরে বিদ্যাপতির রাধিকাও 'হরি বিনে দিন রাতিয়া' কেমন ক'রে কাটাবেন ভেবেছিলেন। বিরহী যক্ষ হ'তে সুরু করে

উনবিংশ শতাব্দীর কবিচিত্তও এই বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে 'এমন দিনে তারে বলা যায়' বলে গান ধরেছে। 'সঙ্গ পবশহাবা' গোবিন্দলালের মিলনৌৎসুক্য বাড়িয়ে দিয়ে সেদিন বর্ষা এসেছে। বর্ষা এসেছে আকাশ কালো ক'বে 'সমাজ সংসার মিছে সব' বাণী নিয়ে বোহিণী-গোবিন্দলালেব জীবনে। বর্ষা এসেছে বারুণী পুকুরের তীরবর্তী নিকুঞ্জে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান পরিকল্পনাটিও লক্ষ্য করুন। আবার সেই বারুণী পুষ্করিণীব প্রান্তশায়ী পুষ্পোদ্যান। যে বারুণীতীরে মর্মরে নির্মিত অর্ধনগ্ন স্ত্রীমূর্তি বিবাজিত, যে বারুণীতীরেব পুষ্পোদ্যানে বোহিণীব সিক্তদেহবাসের মধ্য হ'তে বিকশিত যৌবনকে বুভুক্ষুব মত লক্ষ্য ক'বেছিলেন গোবিন্দলাল, যে পুষ্পোদ্যানবর্তী কক্ষে বোহিণীর বাঙ্গা রাঙ্গা অধরে 'অধব সংস্থাপন' ক'রেছিলেন আজ আবার সেই স্থান। সেদিন যতটুকু পেয়েছিলেন 'ভীরু বাসনাব অঞ্জলিতে' আজ তার চেয়ে অনেক বেশী প্রাপ্তির সম্ভাবনা এই স্থানে। স্থান কালের পরিকল্পনার সঙ্গে পাত্রেব পবিকল্পনাও দেখুন। গোবিন্দলাল ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত...রোহিণীও তাই। আজ বোহিণী আবার এসেছে নীপবনের ছায়া বীথি তলে সিক্তবস্ত্রে। বোহিণী নিকটে এসেছে 'ভিজিতে ভিজিতে।' প্রশ্ন করেছে, 'আপনি কি আমাকে ডাকিলেন ?' গোবিন্দলাল উত্তর দিয়েছেন, 'ডাকি নাই। ঘাট বড় পিছল, নামিতে বারণ কবিতেছিলাম।' এ কোন ঘাট ? 'বাদলের ধারা ঝরে ঝর' এবং 'ঘাটে যেতে পথ রয়েছে পিছল'—সবেমাত্র কথার সুরু। তার পরের কথা 'ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিবে।' গোবিন্দলালও বলেছেন, 'দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন ?' এ প্রশ্নের ধাবায় রোহিণী সাহস পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত গোবিন্দলাল কয়েকটি কথা শোনার জন্য, 'আমার সঙ্গে আইস' বলে রোহিণীকে বাগানবাড়ীর বৈঠকখানায় নিয়ে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'ঘাট বড় পিছল'। কিন্তু গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সে সাবধান-বাণী শোনার সময় নেই। পড়ে থাক ভ্রমর নিরুদ্ধ অভিমানে, পড়ে থাক সংসার তার কুৎসিত কলঙ্কের উদ্ভাবনীশক্তি নিয়ে। আজ বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে—

সে কথা শুনিবে না কেহ আর
নিভৃত নির্জন চারিধার
দুজনে মুখোমুখি, গভীর দুখে দুখী
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর ॥

অবৈধ পূর্বরাগের সমস্ত মাধুর্য অল্প কথায় ব্যঞ্জিত ক'রে একটি চমৎকার রসসমৃদ্ধ দৃশ্য বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

(ঙ) এই দৃশ্যের পাশে আর একটি দৃশ্য বঙ্কিম আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যে আনন্দ ও ধিক্কার গোবিন্দলালকে এই অবৈধ প্রেমের ক্ষেত্রে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তায় দ্বিধাক্লিষ্ট ক'রছে তারই পাশে আমরা ভ্রমরের আশঙ্কাব্যাকুল অবুঝ হৃদয়ের একটি অপূর্ব চিত্র পাই। ভ্রমর গোবিন্দলালের অন্তর্বেদনা বুঝতে পারেন নি, কিন্তু বুঝেছেন সে গোবিন্দলাল আর নেই। সে গোবিন্দলাল নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত করতে চাইছেন না। কেমন যেন একটি অনির্দিষ্ট আশঙ্কা ভ্রমরকেও ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরের এই অনির্দেশ্য আকুলতার একটি চমৎকার রেখাচিত্র এঁকেছেন প্রথম খণ্ড অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে—

"কেমন একটি বড় ভারি দুঃখে ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। যেমন বসন্তের আকাশ—বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল—কোথাও কিছু নাই—অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলে—ভোমরার বোধ হইল, যেন তার বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া সহসা চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলিল। ভ্রমরের চক্ষে জল আসিতে লাগিল। ভ্রমর মনে করিল, আমি অকারণে কাঁদিতেছি—আমি বড় দুষ্ট হইয়াছি—আমার স্বামী রাগ করিবেন। অতএব ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গিয়া, কোণে বসিয়া পা ছড়াইয়া অন্নদামঙ্গল পড়িতে বসিল। কি মাথা মুণ্ডু পড়িল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু বুকের ভিতর হইতে সে কালো মেঘখানা কিছুতেই নামিল না।"

নারীর অভিমান, পত্নীর অনুরাগ, বালিকার অবোধ আশঙ্কা চমৎকার ভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

পাঠক-পাঠিকা সম্বোধন

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে পাঠক-পাঠিকা সম্বোধনে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যে অপরিচিত পাঠককে বঙ্কিমচন্দ্র 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছিলেন সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে, সে-পাঠক এখন পরিচিত ; পাঠিকা-কুলও পরিচিত। এখন বঙ্কিমচন্দ্র পাঠক-পাঠিকা সম্বোধন বাদ দিয়ে কেবল নিজের জবানবন্দী রূপেই কাহিনী পরিবেশন করতে পারেন। এই ধারা 'কমলাকান্তের দপ্তর' হতে পরবর্তী উপন্যাসে প্রবাহিত। তিনি নিজে যেন সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রে এই ভাবে আপন উপস্থিতি ঘোষণা করেছেন। যেমন—

(ক) অনুসন্ধানের পর মনেব সাক্ষাৎ পাইয়া, কৃষ্ণকান্তের উইলের কথা ফাঁদিয়া লিখিতে বসিতেছিলাম, এমন সময় তুমি আকাশ হইতে ডাকিলে "কুহু! কুহু! কুহু!" তুমি সুকণ্ঠ, আমি স্বীকার করি, কিন্তু সুকণ্ঠ বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই। যাই হউক, আমার পলিত কেশ, চলিত কলম, এ সব স্থানে তোমার ডাকাডাকিতে বড় আসে যায় না। (১৬)

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্রেব বয়স চল্লিশের কাছে, ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ, বঙ্গদর্শন পত্রিকার জন্য তিনি লেখনী চালনায় অক্লান্তকর্মী। তাই তিনি সত্যই পলিত কেশ ও চলিত কলম। 'কমলাকান্তেব দপ্তর'-এর বিশেষ style এইস্থানে উপরের অংশে ['আমাব মন' শীর্ষক রচনা স্মবণীয়] সুন্দবভাবে আত্মপ্রকাশ কবেছে। এছাড়া কমলাকান্তেব পবিহাসমণ্ডিত পরিপক্ক আত্মপ্রসাদ, এবং অহিফেনভক্তিও কৃষ্ণকান্ত চরিত্রে বিশেষ ছাপ রেখে গেছে। পাঠক-সম্বোধন বেশীব ভাগ স্থলে বর্জন এবং 'আমি' রূপে লেখকের কাহিনী পরিবেশন 'কমলাকান্তের দপ্তব'এর অব্যবহিত ফল। যথা—

(খ) কুহুঃ কুহুঃ কুহুঃ! বোহিণী চারিদিক চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি রোহিণীর সেই ঊর্ধ্ববিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই ক্ষুদ্র পাখিজাতি—তখনই সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। (১৬)

(গ) সেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে রোহিণীর মনের কি সম্বন্ধ, সেইটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে, এই বারুণী পুকুব লইয়া আমি গোলে পড়িলাম। আমিও গোলে পড়িলাম, আর গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িল। (১৭)

(ঘ) তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না, যেমন ঘটিয়াছে, আমি তেমনি লিখিতেছি। (১৯)

সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে পাঠক-পাঠিকা-সম্বোধন একেবারে নাই বলা চলে। কেবল একস্থলে পাঠককে বলেছেন, "নিশাকরের সকল কথাই যে মিথ্যা, তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা কিছুই বুঝেন নাই।"

অন্যত্র পাঠিকাকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

"আমাদের বড় দুঃখ রহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিল, কিন্তু

রোহিণীকে একটি কিলও মারিল না, এই আমাদের আন্তরিক দুঃখ। আমাদের পাঠিকারা উপস্থিত থাকিলে রোহিণীকে যে স্বহস্তে প্রহার করিতেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই।" (১।১২)

কমলাকান্তের দপ্তর-এর প্রভাব

'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থের তিন বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছে। অহিফেনসেবী কমলাকান্ত বাংলা সাহিত্য হ'তে ভারতীয় সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। * বাংলা দেশ কমলাকান্তকে কোনও দিন ভুলবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে সেদিন কমলাকান্তের আফিংয়ের ঘোর লেগেছিল। তাই 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'বসন্তের কোকিল' বঙ্গদর্শন হ'তে বেরিয়ে এসে বারুণী তীরের আম্রকানন মুখরিত ক'রে তুলেছে। সে-কোকিল রোহিণীকে আনমনা করেছে, গোবিন্দলালকে বিহ্বল করেছে এমন কি স্বয়ং কৃষ্ণকান্তও সেই পথের গান গেয়েছেন। কমলাকান্ত অহিফেন-প্রসাদাৎ যে উর্বশী-রম্ভার সঙ্গে মানসসাক্ষাৎ মাঝে মাঝে লাভ করতেন সে সাক্ষাৎ অহিফেনসেবী কৃষ্ণকান্তও লাভ করেছেন। তিনিও 'অহিফেন-প্রসাদাৎ' 'রোহিণীর চাঁদপানা' মুখের স্বপ্ন দেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়:—

"রোহিণীর চাঁদপানা মুখখানা বুড়ারও মনের ভিতর ঢুকিয়াছিল বোধহয়,—চাঁদ কোথায় উদয় না হয়? নহিলে বুড়া আফিংয়ের ঝোঁকে ইন্দ্রাণীর স্কন্ধে সে মুখ বসাইবে কেন।"

এ স্বপ্নদর্শনের কোনও বয়স নেই। কৃষ্ণকান্ত ও গোবিন্দলাল একই পথের পাথক। গোবিন্দলাল নূতন পৃথিবীর ফসল আর কৃষ্ণকান্ত প্রাচীন পৃথিবীর ফসিল মনে করার কোনও কারণ নেই। জোর গলায় বঙ্কিমচন্দ্র আপনার চল্লিশ বছরের তরুণ-প্রাণকে অস্বীকার ক'রে বলেছেন—

'কুহু! কুহু! কুহু!' তুমি সুকণ্ঠ, আমি স্বীকার করি কিন্তু সুকণ্ঠ বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই। যাহা হউক আমার পলিত কেশ, চলিত কলম, এ সব স্থানে তোমার ডাকাডাকিতে বড় আসে যায় না।' বঙ্কিমচন্দ্র আপনাকে 'পলিত কেশ' বলে কোকিলের প্রভাবকে মৌখিক অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর প্রাণের তারুণ্য যে তখনও অম্লান ছিল 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সৃষ্টিই তার

---

* বিস্তৃত বিবরণের জন্যে এ গ্রন্থে "বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতীয় সাহিত্য" বিষয়ক আলোচনা দেখুন।

প্রমাণ। এক্ষেত্রে কোকিলের বলার অধিকার আছে, "তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে তখনও আমের বনে গন্ধ ছিল।"

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর প্রভাব 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর ভাষার মধ্যেও স্পষ্ট। যেমন—

হায়! ফলাহার! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্মান্তিক পীড়া দিয়াছ! এ দিকে সংক্রামক জ্বর, প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার পর ফলাহার উপস্থিত। তখন কাংস্যপাত্র বা কদলীপত্রে সুশোভিত লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ প্রভৃতির অমল ধবল শোভা সন্দর্শন করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে, না আহার করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহস্র বৎসর সেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বসিয়া তর্কবিতর্ক করেন, তথাপি তিনি এই কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না—এবং মীমাংসা করিতে পারিয়া—অন্য মনে পরদ্রব্যগুলি উদরসাৎ করিবেন। (কৃ. উইল ১২)

গদ্য কবিতার ধারা

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনার ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই গদ্য কবিতার বৈশিষ্ট্য স্মরণে আনে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য কবিতায় আমরা পংক্তির প্রারম্ভে বা প্রত্যন্ত ভাগে কথাগুচ্ছ পুনরাবৃত্তির প্রক্রম লক্ষ্য করেছি।* এ জাতীয় গদ্যকবিতাধর্মী গদ্যধারা আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের-এ গ্রন্থেও লক্ষ্য করি। যথা—

(ক) পূর্বভাগে এক জাতীয় কথাগুচ্ছের পুনরাবৃত্তির উদাহরণ—

কখনও ভাবিল গরল খাই;
কখনও ভাবিল......সকল কথা বলি;
কখনও ভাবিল পলাইয়া যাই;
কখনও ভাবিল বারুণীতে ডুবে মরি; (১।১৩)

তুলনীয়—

* (১) অধরা ছিল তোমার | দূরে চাওয়া চোখের
পল্লবে
অধরা ছিল তোমার | কাঁকন-পরা নিটোল হাতের
মধুরিমায়। —শেষসপ্তক : রবীন্দ্রনাথ

(২) কোথাও রইল না তার | ক্ষত,
কোথাও থাকল না তার | ক্ষতি। —শেষসপ্তক : রবীন্দ্রনাথ

(খ) অন্ত্যভাগে এক জাতীয় কথাগুচ্ছের পুনরাবৃত্তির উদাহরণ—**

"নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশূন্যের প্রীতিস্থান তুমি, যম !
চিত্ত বিনোদন, দুঃখ বিনাশন,
বিপদ ভঞ্জন, দীন রঞ্জন, তুমি যম !
আশা শূন্যের আশা,
ভালবাসা শূন্যের ভালবাসা, তুমি যম !
ভ্রমরকে গ্রহণ কর, হে যম।" (১১২৭)

ভাষা-দোষ

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা অপূর্ব মাধুর্য ও কবিত্বমণ্ডিত হলেও কোন কোন স্থলে তার মধ্যে যে বিশেষ দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হয় সে বিষয়ে কোন সমালোচকই বোধহয় বিশেষ কিছু বলেন নি। আমরা নীচে দেখাবার চেষ্টা করছি ভাষাদোষের ফলে এই গ্রন্থে কি ধরণের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

(ক) একই চরিত্র কখনও সম্মানসূচকে 'তিনি' এবং পরমুহূর্তে 'সে' সর্বনামের দ্বারা পরিচিহ্নিত। যথা, ভ্রমর প্রসঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ড ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে :—

(১) "ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল ..ভ্রমর দ্বার রুদ্ধ করিল...ভ্রমর পত্র পড়িল . ভ্রমর গাত্রোত্থান করিলেন...পত্রে উত্তরে যাহা লিখিবেন... ভ্রমর তাহা স্থির করিয়াছিলেন" ইত্যাদি।

(২) গোবিন্দলাল প্রসঙ্গে প্রধানতঃ 'তিনি'। কখনও কখনও 'সে'ও ব্যবহৃত আছে। যথা, দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে—

**তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থের বাইশ সংখ্যক কবিতার শেষ কয় পংক্তি :—

"মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি উৎসবের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোনো কিছুই নেই
অহঙ্কারের প্রাচীরে ঘেরা।"

গোবিন্দলাল ভালবাসিয়া ছিলেন . গোবিন্দলাল তাহা পারিল না···
গোবিন্দলাল সুখ পাইয়াছিল .. গোবিন্দলাল গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৩) ব্রহ্মানন্দ প্রসঙ্গেও গ্রন্থের একপ্রান্তে 'তিনি'রূপে উল্লেখ অপর প্রান্তে সেরূপে উল্লেখ যথা প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে :—

'ব্রহ্মানন্দের স্নানাহার করিয়া নিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন, এমত সময় বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন'।

অন্যত্র দ্বিতীয় খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে :—

'ব্রহ্মানন্দের মুখ শুকাইল.. ব্রহ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল . ব্রহ্মানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল।

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ভিতরে 'ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিল ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নোট করাইয়া দিল' ইত্যাদি।

(৪) "হরলাল প্রসঙ্গেও একবার 'তিনি' এবং পরবর্তী মুহূর্তে 'সে', যথা—প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে :—'হরলাল রায় আসিয়া তাঁহার শিওরে বসিলেন... হরলাল পাঁচ শত টাকার নোট দিলেন হরলাল হাত পাতিল . নোট লইয়া হরলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ইত্যাদি।"

(খ) শব্দপ্রয়োগে ত্রুটি। যথা—

(১) 'ব্রহ্মানন্দের স্নানাহার করিয়া নিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন।'
(১ম খণ্ড, ২য় পরি)

(২) 'প্রথম বৎসরের শেষে ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন।'
(২য় খণ্ড, ১ম পরি)

(৩) 'ভ্রমর রুগ্ন শয্যাশায়িনী' (২য় খণ্ড, ২য় পরি)

(৪) 'দেখিলেন—সেই শ্যামাসুন্দরী, যাহার সর্বাবয়ব সুললিতগঠন ছিল —এক্ষণে বিশুষ্কবদন, শীর্ণশরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ননয়নেন্দীবর।'
(২য় খণ্ড, ২য় পরি)

(৫) গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত (২/১৫)

(৬) গোবিন্দলাল কলে বলিলেন (২/১৫)

(৭) সেই ভ্রষ্টশোভ কাননে (পরিশিষ্ট)

(গ) Syntax বা পদবিন্যাসগত ত্রুটি, যথা—

'তরণী সজ্জিত করিয়া ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমরের মুখ চুম্বন

করিয়া, গোবিন্দলাল দশদিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা করিলেন।'

(ঘ) অসার্থক উপমার প্রয়োগ। যথা—

'চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল।' (১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরি)

চরিত্র চিত্রণ

রোহিণী ও শরৎচন্দ্র

'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছেন :—

"রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপর পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে লাশ চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক্ দিয়ে পাপের পরিণামের বাকি কিছু আর রইল না।...

অনেকবারই আমার মনে হয়েছে, রোহিণীর চরিত্র আরম্ভ করবার সময় এ কল্পনা তাঁর ছিল না, থাকলে এমন ক'রে তাকে গড়তে পারতেন না। কেবল প্রেমের জন্যই নিঃশব্দে, সংগোপনে বারুণীর জলতলে আপনাকে আপনি বিসর্জন দিতে পাপিষ্ঠাকে কবি এমন করে নিয়োজিত করতেন না।

গোবিন্দলালকে রোহিণী অকৃত্রিম এবং অকপটেই ভালবেসেছিলেন—সমস্ত হৃদয় প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, এবং এ প্রেমের প্রতিদান যে সে পায়নি তাও নয়। কিন্তু হিন্দু ধর্মের সুনীতির আদর্শে এ প্রেমের সে অধিকারী নয়, এ ভালবাসা তার প্রাপ্য নয়। সে পাপিষ্ঠা, তাই পাপিষ্ঠাদের জন্য নির্দিষ্ট নীতির আইনে বিশ্বাসঘাতিনী হওয়া চাই এবং হলও সে। তার পরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মিনিট পাঁচেকের দেখায় নিশাকরের প্রতি আসক্তি এবং পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ জবরদস্ত অপমৃত্যুতে।..."

'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছেন—

'তাহার গোবিন্দলালকে ভালবাসিবার যে শক্তি তাহা সাধারণ নারীতে অসম্ভব,—উইল বদলাইতে সে কৃষ্ণকান্তের মত বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল—গোবিন্দলালের ভাল করিতে, বারুণীর জলতলে প্রাণ দিতে গিয়াছিল সে এমনি প্রিয়তমের জন্য, আবার সেই রোহিণীই যখন কেবলমাত্র নীতিমূলক উপন্যাসের উপরোধেই অকারণে এবং মুহূর্তের দৃষ্টিপাতে সমস্ত ভুলিয়া আর একজন অপরিচিত পুরুষকে

গোবিন্দলালের অপেক্ষা বহু গুণে সুন্দর দেখিয়া প্রাণ দিল, তখন পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় সপ্রমাণ করিয়া সাংসারিক লোকের সুশিক্ষার পথে হয়ত প্রভূত সাহায্য করা হইল, কিন্তু আধুনিক লেখক তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না।'

শরৎচন্দ্রের অভিযোগ বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়—

(ক) রোহিণী চরিত্র আরম্ভ করার সময় বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তখন তাকে পাপী চরিত্র সৃষ্টি করেন নি। সে পরে 'পাপেব পথে নেমে গেল'...

(খ) বারুণীর জলতলে যে রোহিণী আত্মবিসর্জন দিচ্ছিল সেখানে তাব প্রেরণাশক্তি ছিল নিঃশব্দ গোপন গভীর প্রেম। কাবণ গোবিন্দলালকে সে 'অকৃত্রিম এবং অকপটে ভালবেসেছিল'।

(গ) তার নিশাকব-আসক্তি 'কেবলমাত্র নীতিমূলক উপন্যাসের উপরোধ'। তার চরিত্রের পক্ষে এ ঘটনা স্বাভাবিক নয়।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের সমালোচনা যে পবিমাণ হৃদযালুতাবিশিষ্ট সে পবিমাণ কি বিশ্লেষণধর্মী?

'কৃষ্ণকান্তের উইল' মধ্যে রোহিণী সর্বাপেক্ষা আলোচনার বিষয় এবং এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের অভিমত সর্বাপেক্ষা গভীব আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। শবৎচন্দ্রের অভিমতের উক্তি এবং বিশ্লেষণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এই অভিমতের বিরুদ্ধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত যে অপূর্ব বিচার বিশ্লেষণ করেছেন তা প্রত্যেক পাঠকের অবশ্যপাঠ্য। বস্তুতঃ ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় যে অনবদ্য বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং ডক্টর সেনগুপ্ত তাঁর প্রদর্শিত পন্থা অনুসবণ করে যে সুনিপুণ যুক্তিসহ আলোচনা করেছেন তার পরে আর নূতন কথা বলার বেশী অবসর নেই। এই বিষয়ে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাসগুপ্তেব 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের প্রতিও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পূর্ববর্তী সমালোচকদের যুক্তির ধারা অনুসরণ ক'রে আমরা বলতে পারি যে রোহিণীর প্রেম অকৃত্রিম, অকপট ও সুগভীর ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা যায় কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। হরিদ্রাগ্রামের যে প্রগলভ মেয়েটি বাল বৈধব্য-জনিত অপরিতৃপ্ত আসঙ্গলিপ্সায় অভিভূত হয়ে পড়ছিল, তার লোল অপাঙ্গের কটাক্ষ বর্ষণে পাখী এবং বিড়াল কেহই বঞ্চিত হয় নি। যার ঠমকে ঠমকে চলা এবং বিড়ালের উপর কটাক্ষের experiment তার চঞ্চল চিত্তের অনিবার্য অভিব্যক্তি,

বঙ্কিমচন্দ্র তাকে ভালো করে গড়েন নি, সৎ করে গড়েন নি। সে কৃষ্ণকান্তের ঘরে উইল চুরি করতে গেছে, হরলালের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের প্রলোভনে। তার নীতি শিক্ষা হয় নি এবং সেজন্য তার মনে কোন দুঃখ নেই। কিন্তু তার অপরিতৃপ্ত তারুণ্যের মধ্যে হরলালের আবির্ভাব তাকে যেন পথের সন্ধান দিয়েছে। তার যে দেহ আছে এবং দেহের যে প্রয়োজন আছে সে প্রয়োজন সে অস্বীকার করতে পারে নি। হরলাল তার কাছে সে প্রয়োজনসিদ্ধির উপায় হিসাবে দেখা দিয়েছে। হরলালের জন্য সে যে দুষ্কর কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিল সেখানে নিশ্চয়ই হরলালের প্রতি কোন গভীর প্রেম ছিল না। তার দুঃসাহস এবং আসঙ্গলিপ্সাই বাঘের ঘরে চুরি করতে তাকে প্রেরিত করেছিল। তারপর যেদিন রোহিণী জানল হরলাল তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবে না, চোরকে সে পত্নী করতে পারবে না, সেদিন তার সামনে অন্ধকার আরো নিবিড় করে এসেছে। ক্ষণপ্রভার প্রভায় সে সামান্য পথ দেখতে পেয়েছিল মাত্র, কিন্তু গভীরতর অন্ধকারে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ অবলুপ্ত, নৈরাশ্যপীড়িত। ব্রহ্মানন্দের বিপদে আশঙ্কিত রোহিণীকে গোবিন্দলালের অপরূপ রূপ-মাধুরী এবং সামান্যতম সহৃদয়তা প্রণয়রঞ্জিত করেছে একথা অস্বীকার করা যায় না। সে উইল ফেরৎ দিতে গেছে এবং ধরা পড়েছে। গোবিন্দলালের প্রতি সে কটাক্ষপাত করেছে। গোবিন্দলালকে সে তার মনের কথা জানিয়েছে। গোবিন্দলাল [illegible]রের কালো রূপের পটভূমিকায় রোহিণীর অতুলনীয় রূপরাশি দেখেছেন। রোহিণীর কলঙ্কিত চৌর্যলিপ্ত হৃদয়ের অনুরাগতরঙ্গিত ধ্বনি কান পেতে শুনেছেন। রোহিণী নিজেকে প্রকাশিত করেছে ভয় বিসর্জন দিয়ে। সে চুরি করেছে লজ্জা বিসর্জন দিয়ে। সে গোবিন্দলালের কাছে নিজের হৃদয়কে অনাবৃত করেছে। রোহিণীর অন্তর ব'লে যে জিনিস ছিল সেই অন্তরের মধ্যে একটি নূতন মানুষের আসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কৃতজ্ঞতা, আসঙ্গলিপ্সার সঙ্গে গোবিন্দলালের রূপ ও গুণ তার শূন্য জীবনের মধ্যে একটা পূর্ণতার আভাষ নিয়ে এসেছে।

ডঃ সেনগুপ্ত সঙ্গত ভাবেই বলেছেন, "ক্লিওপেট্রার যে প্রেম তা যত ঐশ্বর্যবানই হোক একনিষ্ঠ নয় রোহিণী চরিত্র আলোচনায় রমণী হৃদয়ের এই বৈশিষ্ট্যটুকু মনে রাখতে হবে।' "রোহিণী একনিষ্ঠ অকৃত্রিম গভীর প্রেমের উপাসিকা" মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। সে সাধারণ রমণী। যার সম্বন্ধে মোহিতলাল বলেন "স্বচ্ছন্দ স্বৈরিণী সে যে, নিত্য শুদ্ধা নিত্য সে অসতী"—সে এই রমণী জাতিরই প্রতিনিধি। কিন্তু একথাও মনে রাখতে

হবে সতী হোক বা অসতী হোক, একনিষ্ঠ হোক বা না হোক রোহিণীর প্রেম তাকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। সে বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি চায় নি। আত্মত্যাগের দ্বারা গোবিন্দলালের সামনে একটা বড আদর্শ সে রেখে যেতে চায় নি। তার লজ্জাহীন ভয়হীন প্রেম সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচের অবগুণ্ঠনের অন্তবাল হতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত করেছে। লজ্জাশীলা কুলবধূর প্রেম না হলেও রোহিণীর সেই বলিষ্ঠ প্রেমের মহিমাকে অস্বীকার কবা যায় না। তা কৃত্রিম নয় তা কপট নয়। রোহিণী যখন ভ্রমরের কাছে নির্দেশ পেল মৃত্যুর, বারুণী পুকুরে আত্মহত্যার পথনির্দেশ সে মাথা পেতে নিল। তার জীবনের সর্বগ্রাসী শূন্যতাব মধ্যে সে এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচতে চেয়েছিল হবলালের মত তৃণখণ্ডকে অবলম্বন কবে। তাব বঞ্চিত ভাগ্যের সামনে যৌবনের সুধাপাত্রটি তুলে ধবেছেন অপরূপ রূপ ও গুণের প্রতিমূর্তি গোবিন্দলাল। সে ভালবেসেছে আপন দেহকে চিবকাল। সেই ভালবাসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আজ গোবিন্দলালেব প্রতি প্রেম। সে সুন্দর ভুবনে মরতে চায় নি, সে বাঁচতে চেয়েছিলো আবো পাঁচটি মেয়েব মত। কিন্তু বিধাতা তাকে বিড়ম্বিত করেছেন। আজ এই ব্যর্থ বিডম্বিত জীবনের উপরে তা যেন একটা বৈরাগ্য এনে দিয়েছে। এ বৈবাগ্য তাব অনুবাগেরই তিযক প্রকাশ। সংসারে সে চোর, সমাজে সে ঘৃণ্য, অন্তরে সে দেউলে। ভবিষ্যতেব কোনও আদর্শ তার মৃত্যুর প্রতিবন্ধক নয়। গোবিন্দলাল তাকে বলেছেন গ্রাম থেকে চলে যেতে। ভ্রমর পাঠিয়েছেন মৃত্যুর নির্দেশ। বোহিণী সেই নির্দেশ মাথা পেতে নিতে দ্বিধা করেনি। কাবণ পূর্বেই আমবা দেখেছি ভয় জিনিসটাকে সে তার জীবনে বড় হতে দেয় নি। বাঘের ঘরে যে মেয়ে চুবি কবতে যায় সে সতী না হতে পারে কিন্তু সাহসী। আর যে বাঘের ঘবেব চুবির ধন প্রত্যর্পণ করতে যায় সে কেবল সাহসী নয়, সে প্রেমিকা। প্রেমেব মন্ত্রে দীক্ষিত দুর্বল নারীও জহরব্রত করেছে, সতীদাহের বিধানকে গ্রহণ কবেছে। আজ তার আশাহীন, ভাষাহীন চিত্তের মধ্যে তার বলদৃপ্ত নির্ভীক সত্তা তাকে সেই পথেরই অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে।

আমরা জেনেছি 'রোহিণী না পারে এমন কাজ নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র তাকে অশুচি বলে উল্লেখ করেছেন এক ক্ষেত্রে কিন্তু তার পূর্বে সেই রোহিণী সম্বন্ধেই বলেছেন, "তোমরা একবার আহা বল গো।" গোবিন্দলালের হৃদয় দিয়ে তিনি রোহিণীর ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "কেন তোমায় বিধাতা

এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন তো সুখী করিলেন না কেন?" শরৎচন্দ্র ঠিকই বলেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী চরিত্র সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত করে এমন স্পষ্ট এবং জীবন্ত করে তুলেছিলেন যে পাপের উজ্জ্বল চিত্রকে তিনি নীতির প্রয়োজনে বিসর্জন দিতে গিয়ে কিছুটা রচনাত্রুটির পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য এ কথা ঠিক যে (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত চমৎকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন) রোহিণী প্রেমের দ্বারা ততখানি অভিভূত নয় যতখানি আসঙ্গলিপ্সার দ্বারা। তার উৎকট বিজয় অভিযান তাকে বিড়াল কোকিল হতে শুরু করে হরলাল গোবিন্দলাল প্রভৃতি মানুষকেও প্রলুব্ধ করতে সাহসী করেছে। নিঃসন্দেহে রোহিণী উচ্চ আদর্শের চরিত্র নয়। কিন্তু উচ্চ আদর্শের চরিত্র না হলেও সে যে পরিমাণ জীবন্ত ও উজ্জ্বল, তার প্রলোভনের পরিচয় যে পরিমাণ বিস্তৃত, তার প্রায়শ্চিত্তের পরিচয় সে পরিমাণ বিস্তারিত নয়। সঙ্গত ভাবে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় রোহিণীর অপঘাত সম্বন্ধে Bad Art-এর প্রশ্ন তুলেছেন এবং চমৎকার ভাবে তিনি দেখিয়েছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র নীতির অনুরোধেই রোহিণীর অপঘাত মৃত্যুর ব্যবস্থা করেন নি। করেছেন তার চরিত্রের বিশেষ প্রবণতার পথেই ; গোবিন্দলালের বিলাসপ্রবণ প্রেমের ভঙ্গুরতার পথেই রোহিণীর মৃত্যু এসেছে। শীর্ণা চিত্রা নদীর পার্শ্ববর্তী প্রসাদপুরের প্রমোদগৃহের মধ্যে রোহিণী নিশাকরকে দেখে যে চঞ্চল হয়ে উঠবে তা তার চরিত্রের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক এবং গোবিন্দলালও যে তার প্রতি ভোগক্লান্তিবশতঃ বিরক্তি ও বিস্পৃহতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবেন তাও স্বাভাবিক। কারণ রোহিণীর ক্ষেত্রে পুরুষের প্রতি তার আসঙ্গ-লিপ্সা অভিব্যক্তি পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি। সে ভোগস্পৃহা কিছুটা প্রশমিত হয়েছে বটে কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, "ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।" রোহিণীর অন্তরের অন্তস্তলে একটা পুরুষ-লালসা আত্মগোপন করে ছিল। ভোগতৃপ্তির নেপথ্য হতে সে আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে। মনস্তত্ত্বের দিক হতে এটা খুবই স্বাভাবিক তাতে আপত্তি করার কোন কারণ নেই। আবার গোবিন্দলাল রোহিণীর দেহ নিষ্পেষিত করে যে আনন্দ পেয়েছেন সে আনন্দের সঙ্গে অনুশোচনা, বিবেকের তীব্র কশাঘাত, প্রেমময়ী পত্নী ভ্রমরের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ, কলঙ্কিত গোপন জীবন, চরিত্রহীনতার জন্য বিষয়চ্যুতির স্মৃতি তাঁর অবসন্ন, ভোগক্লান্ত প্রবাসীজীবনকে রোহিণীর প্রতি অনিবার্য ভাবেই বিদ্বিষ্ট করে তুলবে। এছাড়া রোহিণী তাঁর রক্ষিতা। রক্ষিতার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ

গড়ে উঠলেও যে মানসিক প্রীতি সত্যিকার প্রেমের মধ্যে ভোগক্লান্ত জীবনকে আনন্দরসে সঞ্জীবিত করে তোলে রোহিণীর সঙ্গে তাঁর জীবনে সেই প্রেমের অভাব ছিল। রূপজ মোহ তাঁকে আবিষ্ট করেছে। সে মোহের শাস্তি তাঁকে রোহিণীর প্রতি বিরূপ করে তুলেছে।

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত চমৎকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে সুরেশ ও অচলার কলঙ্কিত জীবনের মধ্যে (শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসে) সুরেশের যে বৈরাগ্যের ভাব জাগ্রত হয়েছিল ভোগক্লান্ত গোবিন্দলালের যে সেই ধরণের বৈরাগ্য এসেছিল তা বঙ্কিমচন্দ্র চমৎকার ভাবে ইঙ্গিত করেছেন। আমাদের আপত্তি সেই দিক থেকে নয়। রোহিণীর চরিত্রের মধ্যে নিশাকরের প্রতি আসক্তি হয়ত সম্ভব এবং গোবিন্দলালের চরিত্রের মধ্যে রোহিণীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রতিক্রিয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের আপত্তি হল, রোহিণী আমাদের মনের মধ্যে ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থের মধ্যে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের জীবনে যে পরিমাণ স্থান অধিকার করে নিয়েছে নিশাকর নামক চরিত্রটি সেই পরিমাণই নিষ্প্রভ এবং নির্জীব। সে সমগ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রথম ভাগে অনুপস্থিত। দ্বিতীয় ভাগে মাধবীনাথের প্রেরিত চর রূপে সে একটি সংবাদ সংগ্রহের কাজে এসেছিল মাত্র। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে, একটি দৃশ্যের মাত্র কয়েক ঘণ্টা উপস্থিতির মধ্যে সে এতবড় ঘটনা ঘটিয়ে ফেলল যাতে রোহিণীর মৃত্যু ঘটল, গোবিন্দলাল হত্যাকারী হয়ে উঠলেন, হত্যাকারী স্বামীর সঙ্গে ভ্রমরের চিরবিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল। এই সামান্য চরিত্রটির দ্বারা এত সুদূরপ্রসারী ঘটনা সংঘটিত করা বঙ্কিমের রচনাকৃতিত্বের পরিচয় দেয় না। গোবিন্দলালের চরিত্রের মধ্যে রোহিণীর প্রতি যে-পরিমাণ বিদ্বেষের বিষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল তাই অনিবার্য ভাবে একদিন রোহিণীকে বিদূরিত করার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি নিয়ে আসত। কিন্তু একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত দৃশ্যের মধ্যে সংক্ষিপ্ততর চরিত্র বাহিরের কতকগুলি কাজের দ্বারা যেভাবে রোহিণীকে অপসারিত ক'রে ফেলল তাতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের বলতে ইচ্ছে করে যে রোহিণীর অপঘাত মৃত্যু অনেক পরিমাণে আকস্মিক। পাঠকের মনকে পূর্ব হতে প্রস্তুত করা হয়নি গোবিন্দলালের গুলিতে রোহিণীর মৃত্যুর জন্য। নিশাকর-রোহিণী-সংবাদের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা রোহিণীর মৃত্যুকে Art-এর দিক থেকে বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে। যে পরিমাণ রোহিণীর চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছিল সেই পরিমাণ পরিসর ও জীবনলক্ষণ যদি এই

হ'তে চেয়েছেন। একদিকে তাঁব দেশ অপরদিকে তাঁর মন। একদিকে সহস্র মানুষের কল্যাণকামনা অপরদিকে কল্যাণী। একদিকে জাতির পুনর্জাগরণ অপরদিকে আপনার আত্মিক মৃত্যু। দ্বিধাগ্রস্ত, দোলাচলচিত্তবৃত্তিসম্পন্ন ভবানন্দের চিত্ত চমৎকার ভাবে চিত্রিত হয়েছে। বাইরের বীরত্ব ও ধর্মের অন্তরালে একটি মানুষের ত্যাগদীপ্ত ভোগলুব্ধ জীবনের কাহিনী চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।

জীবানন্দ ও শান্তির আখ্যায়িকার সঙ্গে মহেন্দ্র বা কল্যাণী কারুর কোনও যোগ নেই। কিন্তু ভবানন্দ ও কল্যাণীর কাহিনীর পাশে তার এক বিশেষ মূল্য আছে। মানুষের নিরুদ্ধ আবেগের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত সন্তানধর্ম যে দুর্বল তারই একটি প্রমাণ ভবানন্দ। তিনি আপনার অন্তরকে জয় করতে পারেন নি ; আপনার অপরাধকে অকপটে গুরু সত্যানন্দের নিকট প্রকাশ করতে পারেন নি ; সন্তান-ভ্রাতা ধীরানন্দকে হত্যা করতে গেছেন। এবং সর্বাপেক্ষা জঘন্য অপরাধ, কল্যাণীর স্বামী বর্তমান থাকা সত্বেও তিনি কেবল তাঁর প্রণয় ভিক্ষাই করেন নি, স্বামী বর্তমানেও তিনি কল্যাণীর পাণিগ্রহণের প্রত্যাশায় লালসাক্লিষ্ট হয়েছেন। এর পাশে আর একটি চিত্র—শান্তি-জীবানন্দ। 'যে প্রেম সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে' জানে, জীবানন্দ ও শান্তিব মধ্যে সে প্রেমের শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা। জীবানন্দ ও শান্তি একই কক্ষে, আনন্দমঠের অভ্যন্তরে সহবাস করেছেন, কিন্তু ব্রহ্মচর্য হ'তে স্খলিত হন নি। শান্তি ত্যাগব্রতে দীক্ষিতা হ'য়ে স্বামীর সংস্পর্শ হ'তে নিজেকে দূবে রেখেছেন। অথচ প্রয়োজন মত তিনি সহস্র পুরুষের সঙ্গে সন্তানরূপে দেশ ও দশের কাযে আত্মনিয়োগ করেছেন। আপনার নারীরূপের ফাঁদ পেতে ইংরেজ-সৈন্যদলে চাঞ্চল্য বিধান করেছেন। লিণ্ডলের সঙ্গে একই অশ্বে আবোহণ করেছেন, টমাস সাহেবের কাছে সন্ন্যাসীর বক্ষাবরণচর্ম খুলে তিনি যে কত সুন্দরী তা সাহেবকে বুঝতে দিয়েছেন—অথচ কায়মনোবাক্যে তিনি পতিব্রতা এবং ব্রহ্মচারিণী। সহবাসেও যে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা যায়, অপরের সান্নিধ্য ও পরিহাস প্রযত্নের মধ্যেও যে নারীর শুচিতা রক্ষা করা যায়—তা শান্তি-চরিত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন। নারী যে অবলা নয়, সে যে আসক্তি ও শক্তির সম্মিলিতরূপ বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তা চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন।

এই দুটি বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে বিধৃত করে রেখেছে সত্যানন্দের ভাবাদর্শ এবং

আনন্দমঠের পটভূমিকা। আনন্দমঠই সকল কাহিনীর ঐক্য-বিধায়ক… আনন্দমঠই সকল প্রাণের প্রেরণার উৎস। সুতরাং গ্রন্থের নামকরণ সঙ্গত কারণেই 'আনন্দমঠ' রাখা হয়েছে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন কয়েকটি কাহিনী সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাকৌশলে স্থান-কাল-পাত্রগত ঐক্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় না।

'আনন্দমঠ'-এর সন্তান সঙ্ঘ যে কৃষ্ণের উপাসনা কবেন তিনি শক্তির আধার, চতুর্ভুজধারী। সাধুদের পবিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীর বিনাশের জন্য তাঁর আবির্ভাব। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা কৃষ্ণের ঐশ্বর্যকে দূরে সবিয়ে মাধুর্যেব উপাসনা করেছেন। তাঁদের কাছে উপাস্যদেবতা প্রেমময়, লীলাময় ব্রজেব কৃষ্ণ। সন্তানসঙ্ঘ যে কৃষ্ণের উপাসনা করেছেন তিনি মহাভারতের কৃষ্ণ। বাণী গ্রহণ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে গীতার কৃষ্ণের। তাঁরা প্রেমময় কৃষ্ণের উপাসনা করেন নি। তাই তাঁদেরও আদর্শ অসম্পূর্ণ। পরবর্তী উপন্যাস 'দেবীচৌধুরাণী'তে প্রফুল্ল গীতার নিষ্কাম সাধন আদর্শ গ্রহণ কবতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁব আদর্শ হযেছে প্রেমময় কৃষ্ণ। স্বামী ব্রজেশ্বরের অভিসারে তিনি কণ্টকাকীর্ণ পথে যাত্রা করেছেন।

চরিত্রচিত্রণ

রসবিচাবে 'আনন্দমঠ' বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্বলতম রচনা; ভাববিচারে মহত্তম সৃষ্টি। সমগ্র গ্রন্থেব পটভূমিকার মন্বন্তর ও যুদ্ধ যে পবিমাণ সুন্দর হয়েছে—পাত্র-পাত্রী সে পরিমাণ জীবনলক্ষণাক্রান্ত হয়নি। আদি কাহিনীর মহেন্দ্র, জীবনবিহীন অস্তিত্বে শেষ পর্যন্ত বর্তমান। কল্যাণী ভবানন্দের কামনার উৎসরূপে উল্লেখিত। ধীরানন্দ ব্যক্তিত্বহীন। নেতৃত্বের অন্তরালে সত্যানন্দের মানুষরূপটি বিশেষ ফোটেনি। মহাপুরুষ অরণ্যের ছায়াকে মায়াময় ক'রে তুলেছেন। শান্তি যে পরিমাণ জীবন্ত, সে পরিমাণ স্বাভাবিক নয়। আর জীবানন্দ যে পরিমাণ স্বাভাবিক সে পরিমাণ জীবন্ত নয়। শান্তি যখন বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশে ইংরেজ সৈন্যদলে যান তখন তাঁর জন্য জীবানন্দের কোনও উৎকণ্ঠা দেখি না। যখন গোরা সৈনিকের সঙ্গিনী রূপে শান্তি অশ্বারোহণে আসেন তখন কোনও অশান্তি জীবানন্দের মনকে আন্দোলিত করে কিনা জানা যায় না। 'ব্যক্তিগত প্রেমের ক্ষুদ্র সীমায় তাঁদের মন বাঁধা নেই। তাই জীবানন্দ যে পরিমাণ ব্রতনিষ্ঠ সে পরিমাণ জীবনলক্ষণাক্রান্ত বলে ঠিক মনে হয় না। এই আরণ্য পরিবেশ ও সন্তানব্যূহের মধ্যে একটি মানুষ তার দুর্বলতা ও

(ঘ) গলির দুইপার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী; সূর্যদেব মধ্যাহ্নে এক একবার গলির ভিতর উঁকি মারেন মাত্র। তৎপরে অন্ধকারেরই অধিকার।

(ঙ) মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। নিস্তব্ধ কাননমধ্যে, ঘনবিন্যস্ত শালতরুশ্রেণীর অন্ধকার ছায়ামধ্যে, পশু পক্ষী ভগ্ননিদ্র হইবার পূর্বে, তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল। সাক্ষী কেবল সেই নীল গগনবিহারী ম্লানকিরণ আকাশের নক্ষত্রচয়, আর সেই নিষ্কম্প অনন্ত শালতরুশ্রেণী।

(চ) অপ্সরোগণের ভ্রূবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতি লইয়া অতিযত্নে নির্মিত যে সম্মোহন শর, পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতির প্রতি অপব্যয় করেন না।... যেখানে গাঁটছড়া বাঁধা হইল—সেখানে আর তিনি পরিশ্রম করেন না। প্রজাপতির উপর সকল ভার দিয়া, যাহার হৃদয়-শোণিত পান করিতে পারিবেন, তাহার সন্ধানে যান। কিন্তু আজ বোধহয় পুষ্পধন্বার কোন কাজ ছিল না—হঠাৎ দুইটা ফুলবাণ অপব্যয় করিলেন। একটা আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল—আর একটা আসিয়া শান্তির বুকে পড়িয়া, প্রথম শান্তিকে জানাইল যে, সে বুক মেয়েমানুষের বুক—বড় নরম জিনিস। নবমেঘনির্মুক্ত প্রথম জলকণানিষিক্ত পুষ্পকলিকার ন্যায় শান্তি সহসা ফুটিয়া উঠিয়া, উৎফুল্ল নয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল।

॥ ৩ ॥ পরিকল্পনাগত দোষত্রুটি

বর্তমান কাল আর বঙ্কিমচন্দ্রের কালের মধ্যে অনেক দিনের ব্যবধান। সেদিনকার পরিহাস আজ কোনও কোনও ক্ষেত্রে 'বদ জবান'। আজকের সুরুচিসম্পন্ন অনেক কিছুই সেদিনের চোখ দিয়ে দেখলে অশ্লীল। কিন্তু মার্জিত রসবোধ যখন পরিণত বয়সের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের রূপ নিয়ে আসে তখন স্বভাবতঃই আমাদের মনে তার রুচি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং মার্জিতরুচি বঙ্কিমের পরিণত বয়সের রচনা 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগা উচিত নয়। তবু রুচিপরিবর্তনের ফলে আমাদের মনে যে সুরান্তর সৃষ্টি হতে পারে তার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নের কয়েকটি অংশের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(ক) জীবানন্দকে আমরা ভাবাদর্শের উচ্চস্তরে স্থাপন করেছি। তাঁর মন প্রাণ স্বদেশ স্বজাতি ও স্বধর্মের কল্যাণে নিয়োজিত। সেই জীবানন্দ মহেন্দ্রের অনুবর্তী হ'তে গিয়ে পথের মাঝখানে একটি সপ্তদিবসের অনাহারক্লিষ্ট

স্ত্রীলোকের প্রাণদানের জন্য কিছুটা সময় আটকে পড়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—"মাগীকে বাঁচাইয়া তাহাকে অতি কদর্য ভাষায় গালি দিতে দিতে (বিলম্বের অপরাধ তার) এখন আসিতেছিলেন।" জীবানন্দের মত দেশপ্রেমিক এবং উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তির চরিত্র পরিকল্পনায় এখানে পাত্রানৌচিত্য দোষ এসেছে বলে আমাদের মনে হয়। কারণ, জীবানন্দ এখানে সপ্তদিবসের অনশনক্লিষ্ট মৃতপ্রায় এক রমণীকে দুর্ভিক্ষের দিনে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টায় বিলম্ব ঘটা যদি কদর্য ভাষায় গালির কারণ হয়ে উঠে তা হলে জীবানন্দের মহত্ত্ব বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র ভাল ধারণা হয় না। এ কথা সত্য যে মহাপুরুষেরা অনেক সময় অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেন। কিন্তু জীবানন্দ পরিকল্পনায় সেই ধরণের অতিবাস্তবতার প্রয়োজন ছিল না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ভাবাদর্শের উচ্চগ্রাম থেকে এখানে কাহিনী ও চরিত্র পরিকল্পনা করেছেন। (সেই জন্যেই ভবানন্দের আত্মত্যাগের দৃশ্য যতই অবাস্তব হোক্ না ভাবাদর্শের দিক থেকে উচ্চগ্রামে আমাদের মনকে নিয়ে যায়। সেখানে আমরা দেখেছি ভবানন্দের একটি হাত যখন দেহ হতে বিচ্যুত হয়ে গেল তখনও তিনি অপর হাতে তরবারি ঘুরিয়েছেন এবং পার্শ্বে অবস্থিত ধীরানন্দের সঙ্গে ধীরভাবে কথোপকথন করেছেন। অপর হাতটিও যখন দেহ হতে বিচ্যুত হয়েছে তখনও তিনি কথা বলেছেন বিন্দুমাত্র কাতরতা প্রকাশ না ক'রে।) সুতরাং 'আনন্দমঠ'-এ ভাবমোহ সৃষ্টি করার জন্য যে ধরণের চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে সেখানে ধীরানন্দের পক্ষে ব্যবহৃত এধরণের কদয ভাষা অপ্রয়োজনীয় এবং অসঙ্গত।

(ঘ) সেকাল ও একালের মধ্যে রুচিগত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। তাই শান্তি ও নিমাইয়ের কথোপকথনের মধ্যে যে নারীজনোচিত (গর্হিত ?) হাস্যরসের ব্যবহার করা হয়েছে তা সেকালের নারী সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ পরিহাসের যেরূপ নিদর্শনই হোক না কেন বর্তমান কালে পুরুষ পাঠকদের পক্ষে পরিপাকযোগ্য বলে মনে হবে না। বিশেষতঃ শান্তির জীবনাদর্শের সঙ্গে এই ধরণের পরিহাসের সংযোগসূত্র খুঁজে বার করা সঙ্গত নয়। শান্তি যখন ননদের কোলে শিশু সুকুমারীকে লক্ষ্য করেছেন তখন তিনি প্রশ্ন করেছেন, "তোর মেয়ে হল কবে লো ?"

নিমাই উত্তর দিয়েছেন, "এ যে দাদার মেয়ে।" শান্তি মনে করেছেন যে, জীবানন্দ অন্য কোন নারীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে এই কন্যার জন্ম দিয়েছেন বলে

নিমাই তির্যক আক্রমণ চালিয়েছে। তাই কাল্পনিক বিদ্রূপের প্রত্যুত্তরে শান্তি কঠোরতর বিদ্রূপ করে বলেছেন, "মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, মায়ের কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।" এই প্রত্যুত্তর যতই স্ত্রীজনোচিত এবং স্বাভাবিক হোক না কেন আনন্দমঠের উচ্চ ভাবাদর্শের সঙ্গে এই ধরণের গ্রাম্য পরিহাস অসঙ্গত বলেই আমাদের মনে হয়।

(গ) সত্যানন্দ যখন শান্তির ছদ্মবেশ উন্মোচন করেন এবং শান্তি যখন ভক্তি-গদগদ ভাবে তার সঙ্গে কথোপকথনে নিরত হন তখন তাঁর মধ্যে ভক্তির সঙ্গে দৃঢ়তার চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটেছে। অনেক কথোপকথনের পর সত্যানন্দ শান্তিকে আশীর্বাদ দিয়ে বিদায় দিয়েছেন এবং বলেছেন তোমাব কপালে (চোখে) আগুন আছে সে আগুন দিয়ে যেন সন্তান সম্প্রদায়কে ধ্বংস করো না। সত্যানন্দ শান্তির চোখের মধ্যে যে সন্তান-বিধ্বংসী যুবতীর রূপের আগুনেব কথা বলেছেন শান্তি সেই গূঢ় অর্থ গ্রহণ করেন নি। তিনি কপালে আগুন অর্থাৎ পোড়াকপালী বলে অর্থ করেছেন এবং স্বগত উক্তি করে বলেছেন, "ব বেটা বুড়ো! আমাব কপালে আগুন! আমি পোড়াকপালী, না তোর মা পোড়াকপালী ?"

সত্যানন্দকে 'ব্যাটা' এবং 'বুড়ো' বলা নিশ্চয়ই শান্তিব চরিত্রকে ভাবমার্গে উন্নীত করে না। সর্বজনশ্রদ্ধেয় সত্যানন্দেব মাতাকে এই স্বগতোক্তিব মধ্যে অসঙ্গত ভাবে সহসা ('তোব মা পোড়াকপালী') আক্রমণ করায় শান্তির চরিত্রের মধ্যে একটা নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকের ঈর্ষা-উদ্বেজিত অসঙ্গত অশ্লীলতার নিদর্শন পাই মাত্র। আনন্দমঠের উচ্চ ভাবাদর্শের সঙ্গে, শান্তির ব্রহ্মচারী জীবনের আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এই নীচতা এবং প্রাকৃত নারীজনোচিত ঈর্ষা ও অশ্রাব্য ভাষণের কোন অনিবার্য যোগ নেই।

(ঘ) কল্যাণী, মহেন্দ্র, নবীনানন্দের মিলন উদ্ভাসিত সেই উজ্জ্বল দৃশ্যটির কথা স্মরণ করুন। মহেন্দ্র এবং কল্যাণী পদচিহ্নে ফিরে গেছেন। আনন্দ উৎসবের মধ্যে একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন নবীনানন্দের ছদ্মবেশে শান্তি। ঈর্ষা জেগেছে মহেন্দ্রের। অন্তঃপুরের মাঝখানে মহেন্দ্র গিয়ে দেখেন যে নবীনানন্দ কল্যাণীর শয়নকক্ষে এবং কল্যাণী তার গায় হাত দিয়ে বাঘছালের গ্রন্থি খুলছেন। মহেন্দ্র সেই দৃশ্যে স্বাভাবিক ভাবে রুষ্ট ও বিস্মিত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করেছেন। তার সেই বিস্ময় ও ক্রোধ দেখে নবীনানন্দ হেসে বলেছেন, মহেন্দ্র সন্তান হয়ে অপর সন্তানকে অবিশ্বাস করেন। মহেন্দ্র তখন ভবানন্দকে অবিশ্বাসী বলে উল্লেখ

করেছেন। তার উত্তরে নবীনানন্দ বলেছেন, "কল্যাণী কি ভবানন্দের গায় হাত দিয়া বাঘছাল খুলিয়া দিত।" এই দৃশ্যের পরিহাসলঘুতা আনন্দমঠের ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে একটি স্নিগ্ধশ্রী আনয়ন করে বটে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' উপন্যাসের মধ্যে যে পরিহাস প্রগল্‌ভতা অত্যন্ত সঙ্গত এবং স্বাভাবিক এখানে দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় সন্তানদের কঠোর জীবনধারায় এবং ব্রহ্মচর্যের রুক্ষ পরিবেশে তা রসাভাসের সৃষ্টি করে। নবীনানন্দরূপী ব্রতচারী শান্তির উক্তি ভবানন্দ এবং কল্যাণীর উপর একটা অসঙ্গত অশ্লীল বিদ্রূপের মত সহসা ঝলসে ওঠে।

(ঙ) শান্তির জীবনাদর্শের মধ্যে যে ব্রতচারিণীর কঠোর নিয়মনিষ্ঠা এবং স্বামীর সঙ্গে এক কক্ষে অবস্থিতি সত্ত্বেও ব্রহ্মচর্যের যে উজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে সেখান হতে শান্তিকে টমাস এবং মেজর এডওয়ার্ডের নিকটবর্তী অবস্থায় বিপরীত ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। যিনি সন্তান ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামীর দেহ হতে অনেক দূরে যৌন জীবনযাত্রার বহির্ভাগে নিজেকে নির্বাসিত করে রাখেন সেই ব্রতচারিণী শান্তি টমাস সাহেবের নিকট যখন আত্মপ্রকাশ করেছেন তখন তাঁকে অন্যরূপে দেখি। টমাসের নিকটবর্তী হয়ে শান্তি "সন্ন্যাসীর বক্ষাবরণ চর্ম্ম খুলিয়া ফেলিয়া দিল। এক টানে জটা খুলিয়া দিল।·····সাহেব দেখিলেন অপূর্ব সুন্দরী মূর্তি।" যে শান্তি ব্রতচারিণী, আর যে শান্তি এক বিদেশী পর-পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে আপন বক্ষাবরণ চর্ম বিদূরিত ক'রে সেই সতৃষ্ণ দৃষ্টিকে আপন দেহের প্রতি আকৃষ্ট করেন—এই দুই শান্তির মধ্যে আচরণের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য সন্তানগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই শান্তিকে টমাসের চিত্তবিভ্রম উৎপাদনের চেষ্টা করতে হয়েছিল। বিভ্রান্ত টমাস শান্তিকে আপন বিলাসিনী রূপে ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ব্রহ্মচারিণী শান্তি, সংযত আত্মশুদ্ধির প্রতীক শান্তি, স্বীকার করেছিলেন, "যদি তুমি জেত, তবে আমি তোমার উপপত্নী হইয়া থাকিব স্বীকার করিতেছি যদি বাঁচিয়া থাকি।" শান্তির ঐ উক্তির মধ্যেই তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ তিনি যে কোনদিনই সাহেবের উপপত্নী হবার জন্য বেঁচে থাকবেন না তা বক্রোক্তির মধ্যে প্রকাশিত করেছেন। কিন্তু যিনি স্বামী সঙ্গ করেন না, ব্রহ্মচর্য যাঁর জীবনের আদর্শ, একটি পরপুরুষের বিভ্রম উৎপাদনের এই নটীসুলভ কৌশল এবং এই ধরণের অসম্মানজনক (উপপত্নী হবার) প্রস্তাবের পর,

"হাসিতে হাসিতে চলিয়া" যাওয়া কতদূর স্ববিরোধী তা বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই।

*　　　*　　　*

মেজর এডওয়ার্ডের নিকট বৈষ্ণবী বেশে শান্তির আত্মপ্রকাশ দৃশ্যটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। যিনি যৌন জীবনযাত্রার স্বাভাবিকতার মধ্যে কঠোর ব্রহ্মচর্যের বেষ্টনী রচনা করে স্বামীর দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করেছেন এবং যাঁর জীবনাদর্শের প্রসঙ্গে আমরা একথা শুনি যে তিনি সত্যানন্দের দক্ষিণ হস্ত ভবানন্দকে ধ্বংস করার জন্য আসেন নি তিনি সেই দক্ষিণ হস্তের মধ্যে শক্তি-সঞ্চারের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন; (আনন্দমঠের মধ্যে একই কক্ষে স্বামী স্ত্রী পৃথক আসন রচনা করে ব্রহ্মচর্যের কঠোর নিয়মনিষ্ঠায় স্বামীর সন্তানধর্মকে সুরক্ষিত করার প্রয়াস পেয়েছেন) সেই ব্রহ্মচারিণী শান্তি 'মাতাহরি' স্পাইয়ের মত যৌন আবেদনের সাহায্যে যখন মেজর এডওয়ার্ডের চতুর্দিকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত করেন তখন একদিকে যেমন তাঁর বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত হই অপর দিকে সেই আচরণ ও তাঁর অভ্যস্ত জীবনাদর্শের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য লক্ষ্য না করে আমরা বিমূঢ় হই। যৌন আবেদনের জন্য চিকণ রকম রসকলির উপরে খয়েরের টিপ কেটে—কোঁকড়াচুলে চাঁদমুখ ঢেকে একটি সারেং হাতে তিনি ইংরেজ শিবিরে দেখা দিয়েছিলেন এবং মেজর সাহেবের নিকটে গিয়ে "মধুর হাসি হাসিয়া মর্মভেদী কটাক্ষ সাহেবের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া" গান ধরেছিলেন। এরপর শান্তির ব্রতনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের এবং স্বামীর সঙ্গদান অনিচ্ছার আদর্শবাদ আমাদের কাছে আর তত উচ্চগ্রামের ভাববস্তু বলে মনে হয় না। শান্তি ও লিগুলের অশ্বারোহণপর্বের পর শান্তি ও জীবানন্দের পৃথগাসন পর্বের আদর্শবাদ আমাদের মনকে দম্পতির ব্রহ্মচর্যের প্রতি ভাবমোহশূন্য ক'রে তোলে। আরবী ঘোড়ায় মলপরা পায়ের আঘাত ক'রে একটি সুন্দরী বিদ্যুল্লেখার মত আনন্দমঠের অন্ধকার অরণ্যচ্ছায়াকে ক্ষণপ্রভাস্বর ক'রে শান্তি চলে গেছেন আরব্য উপন্যাসের দেশে। তাঁর মত নারীকে হয়ত আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পূর্বেও পেয়েছি।...বিমলার বিভ্রমবিলাস, শৈবলিনীর সদ্যস্নাতসিক্তবসন ও রসালাপ অনেক কৎলুখাঁ বা লরেন্স ফষ্টরের মাথা ঘুরিয়ে দেয় একথা সত্য। সে বিষয়ে শান্তির যৌন আবেদন ও ইংরাজ যুবকের বিরুদ্ধে হয়ত অস্বাভাবিক আচরণের অভিযোগ উত্থাপন করা যায় না। বিশেষতঃ গ্রন্থের মধ্যে বাস্তবতা

অপেক্ষা আদর্শবাদকে বঙ্কিমচন্দ্র যখন নানা কারণে অধিক মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু অবাস্তবতার অভিযোগ যদি নাও করা যায় শান্তির চরিত্র পরিকল্পনায় পাত্রানৌচিত্য দোষের কথা বলা যায় না কি ?

(চ) অনেক ক্ষেত্রে ভাবমোহ যেখানে sublime সৃষ্টি করে, বাস্তব বিশ্লেষণ সেখানে ludicrous-এর সন্ধান পায়। কল্যাণী ও সুকুমারীর বিয়োগবিধুর বেদনা-বিহ্বল মহেন্দ্রকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সত্যানন্দ নেপথ্যে হ'তে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁকে আপন কোলে টেনে নিয়েছিলেন—এটি ভাবাবেগক্ষেত্রে একটি চমৎকার উচ্ছ্বাসসমৃদ্ধ দৃশ্য। কিন্তু বাস্তব বিশ্লেষণকারী দৃষ্টিভঙ্গীতে বৃদ্ধ "সত্যানন্দ (মাঝবয়সী) মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন" একটি হাস্যকর পরিকল্পনা।

(ছ) ভবানন্দের আত্মত্যাগের দৃশ্যের মধ্যে যে আদর্শবাদের ভাবমোহ সৃষ্ট হয়েছে তা আমাদের বাস্তব জ্ঞান বিদূরিত করে এবং একপ্রকার সম্মোহিত অবস্থায় আমরা দৃশ্যটির অলৌকিক মাহাত্ম্য উপলব্ধি করি। কিন্তু আমাদের ভাবমোহ অপসারিত হলে অপগত বিস্ময়ে আমরা যখন দৃশ্যটির পুনর্বিবেচনা করি তখন আদর্শ এবং বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভবানন্দ এবং ধীরানন্দ কথোপকথন এবং যুদ্ধ যে ভাবে করেছেন তাতে অলৌকিকতার ইন্দ্রজাল যে পরিমাণ আছে বাস্তবতা সে পরিমাণ নেই। কারণ ভবানন্দ আত্মত্যাগের সেই মুহূর্তে দক্ষিণবাহু ছিন্ন হবার পর, বিন্দুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করেন নি। কেবল ধীরানন্দের সঙ্গে কথা বলেছেন। 'ভবানন্দ তখন একহাতে যুদ্ধ করিতেছিলেন'। যুদ্ধের সঙ্গে কথোপথনের নিশ্ছিদ্র মুহূর্তে "ভবানন্দের বাম বাহুও ছিন্ন হইল।" এতেও ভবানন্দ বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। কথা বলেছেন, মৃত্যুকালে 'বন্দে মাতরম্' শুনতে চেয়েছেন এবং বেদনা-বিরহিত অবস্থায় 'মুখে "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে, মনে বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ' করেছেন।

বীর বীরত্বের সঙ্গে মারা যান ঠিকই। কিন্তু দুটি বাহুই যখন ছিন্ন তখনও কথোপকথন করা এবং কাতরোক্তিবিহীন অবস্থায় গান গাইতে গাইতে প্রাণত্যাগ করা অবাস্তব ভাবকল্পনার বস্তু ; বাস্তবের জিনিস নহে।

(জ) আর একটি পরিকল্পনাগত অনবধানতার চিত্র সত্যানন্দের 'শুভ্র বসন'। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীবৃন্দের official বেশ ছিল গেরুয়া। এ গৈরিক বসন তাঁদের

জীবনব্যাপী ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতীক। রাজপুরুষদের অত্যাচারের ভয়ে সকলেই ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সত্যানন্দ কোনও দিন গেরুয়া পরিত্যাগ করেন নাই ("কেবল সত্যানন্দ কোন কালে গৈরিক বসন পরিত্যাগ করিবেন না" ১।১৩; অন্যত্র, "অপরাপর সন্তানগণ আজ সকলেই গৈরিক বসন ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সত্যানন্দ প্রভু গেরুয়া পরিয়া একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন" ১।১৭)। নানা আলোচনা হ'তে জানতে পাবা যায় যে সত্যানন্দের অঙ্গ হ'তে গৈরিক বসন কোনও দিন অপসৃত হয় নি। অথচ কল্যাণীর নিকট প্রথম আবির্ভাবের দিনে (আনন্দমঠ, ১ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ) সত্যানন্দ শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে কেন যে 'শুভ্র বসন' ধাবণ করেছিলেন তা জানা যায় না। আনন্দমঠের অভ্যন্তরেও (১৫ ম) তিনি কল্যাণীর সম্মুখে 'শুভ্র বসন' পরিহিত অবস্থায় আর একবার দেখা দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে * সত্যানন্দের ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর গায়ে নিছক বিস্মৃতি বশতঃ 'শুভ্র বসন' চাপিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদেও সেই ধাবণাব বশবর্তী হ'য়ে তিনি শুভ্র বসন বেখে দিয়েছেন বোধহয়। কিন্তু সত্যানন্দ ও শুভ্র বসনেব মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নেই।

(ঝ) ভাষা ব্যবহারে দোষ

ভাষা ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যধিক সংস্কৃতানুরাগিতার পরিচয় দিয়েছেন কোথাও কোথাও। ফলে 'আনন্দমঠ' গ্রন্থেব এমন অনেক শব্দ পাই যা বাংলা অক্ষরে লেখা হ'লেও বাংলা ভাষায অপরিচিত শব্দ হয়ে রয়ে গেল। যেমন—

বনান্ধকাববিমিশ্র চন্দ্ররশ্মি; তথাভূত চেতনে; গতক্লম; বিটপবিচ্ছেদ নিপতিত জ্যোৎস্নায়; ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত; জ্ঞানানন্দনামা; ক্রোশৈকদূরে; শরন্মেঘবিলুপ্তচন্দ্রমা; শিলাপ্রতিঘাত প্রতিপ্রেরিতনির্ঝরিণীবৎ

বাংলা ভাষা ব্যবহারও সবত্র ত্রুটিমুক্ত নয়। যেমন—

অনেক আম্রাদি বৃক্ষ (আম্রাদি অনেক বৃক্ষ অর্থে)

অথবা শান্তি ও সত্যানন্দের কথোপকথনের নিম্নোদ্ধৃত অংশ—

শান্তি—কেহ কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই ?

সত্য—চারিজন মাত্র।

শা—জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে ?

---

* Match করার জন্য কি ?

সত্য—নিষেধ কিছু নাই। একজন আমি।

শান্তি—আর ?

সত্য—জীবানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ।

সত্যানন্দের উত্তর শুনে প্রথমেই মনে হয় যে চারিজন মাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই। বাকি সকলেই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। অথচ ঠিক উল্টো কথাই সত্যানন্দ বলতে চেয়েছেন। এ ছাড়া এখানে পরীক্ষোত্তীর্ণ সন্তানদের মধ্যে সর্বাগ্রে নিজের নাম জাহির করা পরীক্ষক সত্যানন্দের অশোভন গর্বের পরিচয় দেয়।

(ঞ) বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনায় ঐতিহাসিক ভ্রান্তিরও নিদর্শন আছে। ইংরাজি ১৭৬৯-৭০ বা বাংলা ১১৭৬ সালে যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার জীবন বিপর্যস্ত সে মন্বন্তরের পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৭৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে মীরজাফরের মৃত্যু হয়। অথচ এই মন্বন্তরের আধিভৌতিক কারণ হিসেবে বলেছেন, "মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়।" মন্বন্তরের সময় মীবজাফব চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। তাঁর পুত্র তখন বাংলার মসনদে।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যে ইতিহাসাশ্রয়ী রূপক চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন সে প্রসঙ্গে আচার্য যদুনাথ লিখছেন :—

'প্রথমেই তো গোঁড়ায় গলদ। তাহাব (আনন্দমঠেব) সন্তানেরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত ; কিন্তু যে সব "সন্ন্যাসী ফকিরেরা" সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তরবঙ্গে (বীরভূমে নহে) ঐসব অত্যাচার করে তাহারা এলাহাবাদ কাশী ভোজপুব প্রভৃতি জেলার পশ্চিমের লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর ভগবদ্গীতাব নাম পর্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তানসেনা বৈষ্ণব, আর আসল 'সন্ন্যাসী'রা ছিল শৈব, আজ পযন্ত তাহাদের নাগা সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।...সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরি-পুরীর দল, একেবারে * লুটেরা ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারিও করিত। মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনার সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে 'আনন্দমঠে' বর্ণিত নরনারী এবং তাহাদের কার্য ও কথা (ইংরেজ সৈন্যের সহিত দুইটি খণ্ডযুদ্ধ বাদে)

* উদ্ধৃতিতে 'লুঠেড়া' স্থলে 'লুটেরা' করা হল।

অনেকাংশে অসত্য এবং এ বইখানি কোন মতেই ঐতিহাসিক এই বিশেষণ পাইতে পারে না।'—আচার্য যদুনাথ সরকার : ভূমিকা : আনন্দমঠ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ।৶—॥৹।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে চান নি। 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে 'আনন্দমঠ' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'পাঠক মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক 'আনন্দমঠ'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।'

'আনন্দমঠ'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে করার কোনও কারণ না থাকলেও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর প্রসঙ্গে মীরজাফরের উল্লেখ ভ্রমাত্মক বলার কোনও বাধা নেই। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ'কে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শায়িত ক'রে উপস্থিত করেছেন—সুতরাং সে প্রসঙ্গে ইতিহাসের অন্য তথ্যগত ভ্রান্তির আলোচনা নিরর্থক।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দেবী চৌধুরাণী

॥ ১ ॥ ব্যষ্টি ও অনুশীলনতত্ত্ব

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর গভীর ভাবে অভিভূত করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রকে। তিনি সেই মন্বন্তরের পটভূমিকায় সমষ্টিগত অনুশীলনতত্ত্বের একটি ভাবোদ্দীপক চিত্র তুলে ধরেছেন 'আনন্দমঠ'-এ। এইবার তিনি সমষ্টি হ'তে ব্যষ্টির ক্ষেত্রে দৃষ্টিকে আনলেন সরিয়ে। স্বদেশ ও স্বধর্মক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধ পুরুষের রাজনৈতিক শৃঙ্খলো-মুক্তির প্রয়াস তিনি দেখিয়েছেন। এইবার স্বধর্ম স্বদেশ ও স্বসংসার ক্ষেত্রে নারীর জীবনাদর্শকে তিনি উপস্থাপিত করলেন। নারী যে বহুবলধারিণী এবং স্বামীর ধর্মক্ষেত্রে সহযোগিনী তার চিত্র আমরা শান্তির মধ্যে পেয়েছি। এবার তিনি আরও এগিয়ে গেলেন। পুরুষ যেখানে স্বধর্ম স্বদেশ ও স্বসংসার ক্ষেত্রে নির্বিকার উদাসীন...নারী সেখানে কি প্রচণ্ড শক্তি সাহস ও উদ্দীপনার অধিকারী তার চিত্রও তিনি আমাদের সামনে এনে হাজির করলেন। যে নারীকে অবলা ও ধর্মপথে পরিত্যাজ্যা বলে মনে করা হয়, দেবী চৌধুরাণী সেই নারী সমাজের মস্ত বড় প্রতিবাদ। যে পুরুষ সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে জ্বলে উঠে স্বদেশ স্বসমাজ ও স্বধর্মের কল্যাণ সাধনে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, যার চিত্র 'আনন্দমঠ'-এ, তার মূর্ত প্রতিবাদ ব্রজেশ্বর। তাঁর মধ্যে পুরুষের রূপ আছে, গুণ নেই। প্রফুল্ল রূপে ও গুণে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে ব্রজেশ্বর অপেক্ষা অনেক অগ্রবর্তী। 'আনন্দ-মঠ'-এ একটি পটভূমিকা অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন কাহিনীর একমাত্র ঐক্যসূত্র। এখানে কোনও বিচ্ছিন্ন কাহিনী নেই, কিন্তু একটি দীনাতিদীন-মহামহীয়ান নারীহৃদয় সমস্ত কাহিনীর কেন্দ্রস্থলে। সংসার হ'তে নির্বাসিত, দরিদ্র, নিগৃহীত প্রফুল্ল সংসারের প্রাণকেন্দ্রে এসেছেন, অর্থ দিয়ে উদ্ধার ক'রেছেন তাঁদের যাঁরা তাঁকে বিতাড়িত করেছেন, সপত্নীকে ভগিনীর অধিক ভালবেসেছেন, বুদ্ধি দিয়ে পরিচালিত করেছেন দস্যুদলকে, কল্যাণীরূপে প্রজাসাধারণকে অনাহারের অন্ন দিয়েছেন। অবশেষে ত্রিশবৎসরের নববধূরূপে পুকুরঘাটে এ'টো বাসন মাজার মধ্যে নারী-জীবনের সার্থকতার সন্ধান করেছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'—একটি উপকথা, রোমান্স

ও উপন্যাসের অদ্ভুত সমন্বয়। কিন্তু 'দেবী চৌধুরাণী'র মধ্যে সার্থকভাবে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে নারীর বুদ্ধি, বিদ্যা, বল, ধর্মবোধ, কর্তব্যজ্ঞান কোনও মতেই অবহেলার বস্তু নহে। তার মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনা আছে। কেবল প্রতিকূল পরিবেশ সেই নারীশক্তিকে বিকশিত হ'তে দেয়না মাত্র।

আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে নারীজীবনে সাংসারিক ও সামাজিক কর্তব্যের যোগ কোথায় তা বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। 'আনন্দমঠ'-গ্রন্থের সর্বোত্তম চরিত্র শান্তির সংসার সেবার চিত্র নেই। সে-বিষয়ে বঙ্কিমের আদর্শ সেখানে সংসারের বাইরে নিরাসক্ত দাম্পত্য জীবন। গ্রন্থ পরিবেশে যেখানে সন্তানসঙ্ঘ ভেঙে গেছে সেখানে শান্তি ও জীবানন্দ সংসার জীবনে আর ফিরে আসেন নি। কিন্তু দাম্পত্য জীবন-ব্যবস্থার সঙ্গে মহত্তর আদর্শের কি কেবল বিরোধ ব্যাঘাতের সম্বন্ধ? বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এই গ্রন্থে। এখানে তিনি দেখিয়েছেন ঘর ও বাহিরকে একই সূত্রে বাঁধা যায় মন দিয়ে। মন ঈশ্বরে সমর্পিত হলেই তার সকল সমস্যার সমাধান ঘটে। 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র শান্তির জীবনের অধ্যাত্ম সাধনার বিশেষ পরিচয় দেননি। প্রফুল্লের আধ্যাত্মিক জীবন-সাধনার চিত্র বঙ্কিম 'দেবী চৌধুরাণী'তে দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে প্রফুল্ল কৃষ্ণ-ব্রজেশ্বরকে স্বামী ব্রজেশ্বরের মধ্যে লাভ করেছেন। মহাভাবস্বরূপিণী রাধিকা যেমন নায়িকা হয়ে রাস রসোল্লাস মহোৎসবে অন্য সখীদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিসেবিত হ'তে দেখেছেন আনন্দ-কৌতুকে; এখানে প্রফুল্লও সপত্নীদের স্বামিসঙ্গের সহায়িকারূপে আত্ম-প্রকাশ করেছেন এবং নিরভিমান সমদৃষ্টির দ্বারা পরিভাবিত হয়ে তিনি সংসারকে প্রফুল্ল ক'রে তুলেছেন। প্রফুল্লের নিষ্কাম সাধনা প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার নাম কাম এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির নাম প্রেম।' প্রফুল্লের ক্ষেত্রে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা কোনও ক্ষেত্রেই স্পষ্ট নয়—সর্বত্রই সেই ব্রজেশ্বর-সাধনার বিভিন্ন প্রণালী মাত্র। প্রফুল্লের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র নারীর আধ্যাত্মিক সাধনা ও সাংসারিক কর্তব্যের মধ্যে সামাজিক কর্তব্যের কথাও আলোচনা করেছেন। 'আনন্দমঠ'-এর মধ্যে শান্তি পত্নীত্ব চান নি, মাতৃত্ব চান নি। সমাজ-সেবার সঙ্গে সেখানে পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের বিরোধের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই সেখানে বলেছেন যে 'আনন্দমঠ'-এর আদর্শবাদ তাঁর শেষ কথা নয়। প্রফুল্ল দস্যুদলের মাতা হয়েছেন

ব্রজেশ্বরের পত্নী বলে সামাজিক মর্যাদা পাবার পূর্বে। প্রজাসাধারণের কাছে ‘রাণী মায়ী’ হয়েছেন। পরে ব্রজেশ্বরের বধূরূপে দ্বিতীয় বার একই শাশুড়ীর সামনে একই স্বামীর পাশে বধূবরণ ক্ষেত্রে এসেছেন। তারপর পুত্রপৌত্রাদি-পরিবৃত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। সামাজিক সেবাব্রত ও সাংসারিক সেবাব্রতের মধ্যে কোনও বিরোধ প্রফুল্লের ক্ষেত্রে আসে নি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন জীবনে সংসার-সেবা সমাজ-সেবার পরিপন্থী নয়। সংসার-সমাজপ্রেম ঈশ্বর-প্রেমের সোপান মাত্র। স্পষ্টই দেখা যায় ‘আনন্দমঠ’-এর অনুশীলিত ধর্মাদর্শের সঙ্গে এই আদর্শের পার্থক্য আছে। সন্তানদের আদর্শক্ষেত্রে গৃহের বন্ধনের কোনও স্থান ছিল না। গৃহের বন্ধন অস্বীকৃতির দ্বারা যে সমাজসেবা তা যে নিষ্ঠুর ও ব্যর্থ এমন কথা ‘আনন্দমঠ’-এ বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ক’রে বলেন নি বটে কিন্তু ভবানন্দের রূপলালসাবশতঃ ব্রতভঙ্গ এ বিষয়ে কিছুটা পথ নির্দেশ করে। ‘দেবী চৌধুরাণী’তে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ক’রে বলেছেন ব্যক্তি নিয়ে পরিবার, পবিবার নিয়ে সমাজ, সমাজ নিয়ে জগৎ। এবং সমস্ত কিছুকে বিধৃত ক’রে আছেন পরম সত্তা। এই উপলব্ধিই চরম কথা। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে দস্যুবৃত্তির সঙ্গে আদর্শ নারীত্বের যোগ কোথায়? একটি বিশেষ নারীর ক্ষেত্রে আকস্মিক ঘটনাব অভিঘাতে যে বিচিত্র জীবন গড়ে উঠেছিল তা যে সাধারণ নারীর জীবনাদর্শ নয় বঙ্কিমচন্দ্র একথা ভাল ভাবেই জানতেন। এবং সেই জন্যেই যে-নারী সমাজের কল্যাণব্রতে দস্যু সমাজেব নেত্রীত্ব করেছেন তাঁকে আবার সংসার ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছেন। সেখানেই তাঁর মোক্ষ ধাম। যাঁরা এদিকে দৃষ্টিপাত করেন না অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদকে নারীজীবনে কতখানি গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে সর্বসংশয়মুক্ত হ’তে পারেন না, তাঁরা প্রশ্ন করেন প্রফুল্লের জন্য যদি সেই রান্নাঘর ও পুকুরঘাটে রান্না ও বাসন মাজার জীবনই চরম কথা হয় তাহ’লে তাঁর জীবনে গীতা ও ব্রহ্মচর্যের কি প্রয়োজন ছিল? লাঠি সড়কি চালনা ও মল্লযুদ্ধের পারদর্শিতার দ্বারা দাম্পত্যকলহের মীমাংসা করার জন্য প্রফুল্লকে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই ঐ সকল শিক্ষা দেন নি। মনে রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখেছেন এবং উপন্যাস রচনাকালে দেবী চৌধুরাণী নামে একটি ঐতিহাসিক নারী ডাকাতের জীবনের সঙ্গে এই প্রফুল্লের জীবন মিলিত করতে হয়েছে। যে-নারী দস্যুতা গ্রহণ ক’রে ইংরাজ ঐতিহাসিকদের লেখনীতে কীর্তিত হয়েছে সে নারী বাস্তব জীবনে গীতা বা ব্রহ্মচর্যের চর্চা না করলেও শারীর চর্চার ক্ষেত্রে যে অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেছিল সে বিষয়ে

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সেই নারী দস্যুর জীবনে নিশ্চয়ই মল্লযুদ্ধ, সড়কি চালনা, বুদ্ধি চালনার জন্য বিশেষ অনুল্লিখিত একটি অধ্যায় আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সেই অনুল্লিখিত অধ্যায়কে আপন আদর্শ অনুযায়ী পুনর্গঠিত করেছেন। আমরা 'আনন্দমঠ'-এর সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের গীতানুরক্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণব রূপে দেখেছি... সে পরিকল্পনা ইতিহাসের সত্য নয়। কিন্তু সে পরিকল্পনা আমাদের সাহিত্য-বোধকে পীড়িত করে না। কারণ যে আদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রগুলির এবম্বিধ রূপান্তর করেছেন, তার কারণ আমাদের পরিজ্ঞাত। এক্ষেত্রেও একটি আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে ইতিহাস ও কিম্বদন্তীর দেবী চৌধুরাণী নামে নারীদস্যু-চরিত্রটির নূতন রূপ দিতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে যে নারীকে কিম্বদন্তীর 'দেবী চৌধুরাণী'র সঙ্গে অভিন্ন করতে চেয়েছেন সেই সমাজ-নিগৃহীতা, পরিবার-পরিত্যক্তা নারীর সমাজসেবী এবং পরিবারপবিত্রাতা মূর্তিটি আমাদের কাছে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। বাস্তবলোকের দস্যু নীচতা, লোলুপতা, চরিত্রহীনতার দ্বারা কলঙ্কিত। তার থেকে প্রফুল্লকে দূরবর্তী করার জন্য গীতা, নিষ্কাম সাধনা, যোগের দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য বিদূরণ প্রভৃতির একটি অনন্যসাধারণ পরিবেশ গঠন করতে হয়েছিল, যা একটি শক্ত আবরণের মত দস্যুনারীর চারিপাশে প্রসারিত থেকে তার মনের পাতিব্রত্য ও দেহের পবিত্রতা রক্ষা করবে। বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি রোমান্স রচনা করতে চেয়েছেন যা পরিণাম-রমণীয় হবে এবং দস্যু-নেত্রীকে স্বামিপুত্রবতীরূপে সার্থক ক'রে তুলতে পারবে। অতএব তার চারপাশে একটা মায়ার আবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে যা সমালোচকদের নিক্ষিপ্ত শরাঘাত থেকে রোমান্সলোকবর্তী নায়িকাকে অবলীলাক্রমে রক্ষা করবে এবং ব্রজেশ্বরবধূরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'তে সাহায্য করবে। 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুডল্যাড সাহেব, লেফটেন্যাণ্ট ব্রেনান, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ, সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে এই পর্যন্ত।" ইতিহাসের ভবানী পাঠক ভোজপুরী ডাকাত। তার বাঙ্গালীয়ানা, পাণ্ডিত্য ও আদর্শবাদ বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রতিভা কিম্বদন্তীর ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী দুটি নাম নিয়ে একটি মৌলিক মধুর তত্ত্ব আখ্যান রচনা করেছে মাত্র। তার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ একেবারেই নেই, বাস্তবের যোগও অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

কাহিনী

কাহিনী তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে প্রফুল্ল দরিদ্র মাতার নিঃস্ব কন্যা, ধনী শ্বশুরের পরিত্যক্তা পুত্রবধূ। স্বামী-সঙ্গের ক্ষণিক সৌভাগ্য ব্যতীত তিনি দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য নিপীড়িত। শ্বশুরালয় হ'তে চিরতরে নির্বাসিত হয়েছেন। হারিয়েছেন মাকে। যে স্থানে তিনি তাঁর নিঃস্ব নিঃসঙ্গ জীবন রক্ষার চেষ্টা করছিলেন সেখান হ'তে পুরুষের লালসার ইন্ধন যোগাবার জন্য তিনি অপহৃত হয়েছেন। সেখান হ'তে তিনি রক্ষা পেয়েছেন বটে কিন্তু সেই কন্যা এবং বধূ প্রফুল্লের মৃত্যু ঘটেছে। সংসার ও সমাজচ্যুত মানবীরূপে তাঁর নবজীবনের সূত্রপাত হল। দ্বিতীয় খণ্ডে দেবী চৌধুরাণীর জন্ম হয়েছে, প্রফুল্লের রূপান্তর ঘটেছে। তিনি এখানে কর্মপথে দস্যুদলের নেত্রী ও প্রজার নিকট অন্নপূর্ণা মা। ধর্মপথে তিনি পরিব্রাজিকা মূর্তিমতী করুণা। তৃতীয় খণ্ডে, দস্যু দেবী চৌধুরাণী আবার বধূ প্রফুল্ল হয়ে এসেছেন এবং দীর্ঘ বিরহের অবসানে স্বামী ও স্ত্রী পুনর্মিলিত হয়েছেন। প্রফুল্ল দস্যুজীবনে কেবল ধর্মাচরণ করেছেন। পল্লী-জীবনে সংসার পরিমণ্ডলের মধ্যে সেই ধর্মাচরণের সর্বশেষ ক্ষেত্র লাভ করেছেন।

'দেবী চৌধুরাণী'র প্রথম খণ্ডে ব্রজেশ্বরের বয়স একুশ বাইশ, প্রফুল্লর বয়স আঠার। নয়ন বৌ 'ও সাগর যথাক্রমে সতের ও চৌদ্দ। 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থে ব্রজেশ্বরকে কোনক্রমে নায়ক বলা চলে না—তাঁর doing বা suffering-এর কোনও চিত্র নাই। পরবর্তী উপন্যাসে ('সীতারাম') বঙ্কিমচন্দ্র নায়কলক্ষণাক্রান্ত পুরুষ চরিত্র অঙ্কন করেছেন এবং তাঁর তিন পত্নীর প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থে প্রফুল্ল চরিত্র এত উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে যে ব্রজেশ্বরের অন্যান্য পত্নী নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছেন। তবু বঙ্কিমচন্দ্র তারই মাঝে 'নয়ন বৌ'য়ের সাধারণ নারীসুলভ সপত্নীবিদ্বেষ ও স্বার্থসংরক্ষণবৃত্তির সংক্ষিপ্ত সমাচার শুনিয়েছেন। বড লোকের বাড়ীর ছোট মেয়ে সাগর বৌ হৃদয়ের প্রসারে, দম্ভে, সপত্নীপ্রীতিতে সমুদ্ভাসিত একটি প্রাণবন্ত চরিত্র। নয়ন বৌ হাসতে জানে না। সাগর বৌ হাসতে ও হাসাতে জানে। 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রচিত্রণ অপেক্ষা ঘটনা-বর্ণনাকে বড় বলে মনে করেছেন এবং এক স্বামীর তিন পত্নীর কাহিনীতে অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্ষা বাইরের জমকালো বর্ণনা ক[illegible] 'সীতারাম' গ্রন্থে এক স্বামীর তিন পত্নীর কাহিনীতে বাইরের বর্ণনা অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাতকে দৃষ্টির নেপথ্যে নিয়ে যায় নি। 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থে প্রফুল্ল

'রাণী' হয়েছেন, কোনও রাজা নেই। 'সীতারাম' গ্রন্থে নায়ক রাজা হয়েছেন কিন্তু শ্রী রাণী হন নি। 'দেবী চৌধুরাণী'তে স্বামী-স্ত্রী দৈহিক বিচ্ছেদ সত্ত্বেও ভাব-সম্মিলনে পরস্পর বিধৃত। 'সীতারাম'-এ দৈহিক সামীপ্য সত্ত্বেও মিলন-হীনতা সহবাসকে দুঃসহ বেদনায় রূপান্তরিত করেছে। শান্তি ও জীবানন্দ সহবাস সত্ত্বেও ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালন করেছিলেন—কারণ উভয়ে একই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। 'সীতারাম'-এ রূপসী স্ত্রী মনের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে সীতারামের নিকট ধর্মালোচনা করেছেন, সীতারাম মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করেছেন কিন্তু শ্রীর সঙ্গে মিলিত হ'তে পারেন নি। শ্রীর ধর্ম বিহ্বল, বিভ্রান্ত করেছে সীতারামকে। 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থে ব্রজেশ্বরকে কামনা করেছেন দেবী। বিম্বাধরে চুম্বন লাভ করেছেন বিনা বাধায়। বধূরূপে সংসারে পুনঃপ্রবেশের জন্য তাঁর আকুলতার অন্ত নেই। দেবী তাঁর নিরাসক্ত সাধনার বাইরের খোলসকে অবলীলাক্রমে ফেলে আসতে পেরেছিলেন—তা নইলে ব্রজেশ্বর ও দেবীর কাহিনী অন্যরূপ হত।

কাহিনী-শেষে বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লের আবির্ভাবের তিনটি কারণ নির্দেশ করেছেন,—সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপন। পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রফুল্লের নিষ্কাম সাধনা সম্পূর্ণ নিষ্কাম হয়নি। এ গ্রন্থে প্রফুল্ল কোনও সাধুর পরিত্রাণের ভার নিয়েছেন বলে জানা যায় নি। তিনি যে-শ্বশুর হরবল্লভের পরিত্রাণ ও পাপমুক্তির জন্য প্রাণপাত করেছেন তাঁকে সাধু বলার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। দেবী সিংহ নামক দুষ্কৃতকারী সমাজের ক্ষেত্রে যে দুষ্কর্ম করেছে, বা হরবল্লভ সংসারের কেন্দ্রে যে অন্যায় করেছেন—এই দুই দুষ্কৃতকারীর কোনটিকেই প্রফুল্লের হাতে বিনষ্ট হ'তে দেখি না। ধর্মসংস্থাপন বিষয়ে প্রফুল্লের অনাগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তিনি ভবানী পাঠকের নিকট এই রাণীগিরি হ'তে মুক্তি চেয়েছেন। দস্যুদলের নেত্রীত্বের দ্বারা প্রজাদের কল্যাণ করা যদি তাঁর ধর্ম হয়, তাহ'লে তিনি সে ধর্মও পরিত্যাগ ক'রে সাহেবের হাতে ধরা দিতে চেয়েছেন। পতি পরম গুরুকে পূজা করা যদি নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম হয় তাহ'লে তিনি পতি কর্তৃক স্ত্রীর পদ-সেবার মন্ত্রণা দিয়ে অধর্মের ব্যবস্থা করেছেন।

'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রচারিতব্য তত্ত্ব প্রাধান্য পায় নি। বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবে [illegible] রং লাগাতে চেয়েছিলেন। আদর্শ অপেক্ষা রূপকথার রং তার মধ্যে মনে হয় বেশী লেগেছে। তাই 'দেবী চৌধুরাণী'র তত্ত্ব অগ্রাহ্য ক'রেও পাঠক পরম রমণীয় এই কাহিনীকে স্বাগত জানিয়েছেন।

।:॥ ২ ॥ অনুশীলন তত্ত্বের বিরোধী চিত্র

(ক) আদর্শগত বিরোধ 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের বক্তব্যকে অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট ক'রে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা গ্রন্থে প্রচারিত 'পতি পরম গুরু বাদ' বিষয়ে নয়নতারা ও সাগর বৌয়ের কাহিনী উল্লেখ করতে পারি। প্রফুল্ল যে ধর্মের কথা বলেছেন সেখানে 'পতিভক্তিই ঈশ্বরভক্তি'র প্রথম সোপান। তিনি আচরণের দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন। আবার পতি-পত্নী সম্বন্ধের অন্যবিধ চিত্রও বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন এবং সেখানে নারীর জন্য কোনও তিরস্কার বা প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন নি। 'সাগর বৌ'য়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যে-প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণী রূপে জানালার আড়াল থেকে বলেছেন যে স্বামী স্ত্রীর পদসেবা করবে তিনি কি সেই পতিদেবতার অনন্য আরাধিকা প্রফুল্ল। প্রফুল্ল কেবল তাঁর আদর্শচ্যুত হ'য়ে স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর পদসেবার নির্দেশ দেন নি, সেই নির্দেশ কার্যে পরিণত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। সাগর বৌয়ের সদম্ভ উক্তি, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর পদসেবার প্রতিজ্ঞাপূরণ ও পরবর্তী নিঃসঙ্কোচ আচরণ ব্রজেশ্বর যে ভাবে মেনে নিয়েছেন—তাও বঙ্কিমচন্দ্রের 'পতি পরম গুরু'র আদর্শবাদকে অনেকখানি অস্পষ্ট ক'রে তুলেছে। পাঠক অনেক সময়েই বুঝতে পারেন না যে স্ত্রীর কর্তব্য কি? পতিসেবা না পতিকর্তৃক স্ত্রীর পদসেবার ব্যবস্থা করা। সাগর ও ব্রজেশ্বরের নিম্নলিখিত কথোপকথন দেখুন।—সাগর স্বামী কর্তৃক চরণ সেবার পর বিনা অনুশোচনায় বলেছে, "যাক্, এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে। তুমি আমার পা টিপিয়াছ......এখন জানিলে আমি যথার্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে।" এর উত্তরে ব্রজেশ্বর কোনও ভর্ৎসনা করেন নি, কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়েছিলেন তারপর প্রশ্ন করেছেন, "সাগর তুমি এখানে কেন?"

সাগরের মুখর প্রত্যুত্তর লক্ষ্য করুন। সাগর বলে, "সাগরের স্বামী! তুমিই বা এখানে কেন?"

ব্রজেশ্বর বলেন, তিনি কয়েদী তাঁকে ধরে আনা হয়েছে। সাগর আবার নিঃসঙ্কোচ উক্তি করে, "আমি কয়েদী নই, আমাকে কেহ ধরিয়া আনে নাই। তোমাকে দিয়া আমার পা টেপাইব বলিয়া দেবী রাণীর রাজ্যে বাস করিতেছি।"

এ উক্তিতেও ব্রজেশ্বর অবিচল।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই দৃশ্য পরিকল্পনা 'পতি-পরম-গুরু-বাদ'কে অনেক পরিমাণে দুর্বল ক'রে তোলে। নারীর জীবনে পতিসেবাই যদি পরম ধর্ম হয় ত সে বিষয়ে

পরম অধর্ম করেছেন প্রফুল্ল, সাগর বৌ দু জনেই। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র এই আচরণকে কোনও রূপ তিরস্কারের বিষয়ীভূত করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক স্থলেই নব্যাদের নিঃসঙ্কোচ নির্লজ্জতাকে এই গ্রন্থের মধ্যে ব্যঙ্গ ও কঠোর সমালোচনার বিষয় করেছেন, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোনও কথা বলেন নি।

'নতুন বৌ' রূপে ব্রজেশ্বর যখন প্রফুল্লকে ঘরে নিয়ে গেছেন তখন সাগর জানেন না যে দেবীরাণীই ঘরে এসেছেন। তিনি সপত্নীবিদ্বেষ ও কৌতূহল নিয়ে তাঁকে দেখতে গেছেন। দেখার পূর্বে নয়নতারার কাছে 'নতুন বৌ'য়ের রূপগুণ বিষয়ক অনেক কথা শুনেছেন। অতঃপর ব্রজেশ্বর-সম্বর্ধনায় নয়নতারা কি ক'রেছেন জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেছেন, "যে বিয়ে করেছে, তাকে কিছু বল নি?"

নয়নতারা উত্তর দিয়েছেন, "দেখতে পাই কি? দেখতে পেলে হয়। মুড়ো ঝাঁটা তুলে রেখেছি।"

সাগরবৌ কর্তৃক স্বামীর দ্বারা পদসেবার প্রতিজ্ঞা; প্রফুল্ল কর্তৃক সে প্রতিজ্ঞা পূরণের ব্যবস্থা অবলম্বন এবং নয়নতারা কর্তৃক 'মুড়ো ঝাঁটা'র ব্যবস্থার পরও সেকালিনীরা যে স্বামীকে পরম গুরুরূপে কেবল সেবাই ক'রেছেন একথা কেউ কখন বলতে পারবেন না। সুতরাং বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য 'পতি-পরম-গুরু'-তত্ত্ব যে বর্ণিত ঘটনার দ্বারা অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেকথা বলা খুব দোষের হবে না বোধহয়।

(খ) 'পতি পরম গুরু' একথা পত্নীর ক্ষেত্রে কেমন আদর্শ রূপ লাভ করেছে তার বিশ্লেষণ আমরা পূর্বে করেছি। 'পিতা পবম স্বর্গ' রূপটি আদর্শরূপে উপস্থাপিত হয়েছে কি না তা এবার আলোচনা করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থখানি পিতার উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। ব্রজেশ্বর চরিত্রের মধ্যে একটা নির্বিচার পিতৃভক্তির আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু একথা বলা ঠিক হবে না যে তাঁর কাজে তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। হরবল্লভ স্বর্গ নন, ধর্ম নন, পরম ঠক। তাঁকে নীচ, স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, গোয়েন্দা, মিথ্যাবাদী রূপে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যায়ক্রমে দেখিয়েছেন। এমন একটি পাত্র বিষয়ে ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি আমাদের বিন্দুমাত্র অনুপ্রাণিত করে না। যে মানুষের মূল্য কাণাকড়িও নয় তাকে সর্বাপেক্ষা মহনীয় এবং মূল্যবান বিচার করলে সেই বিচারবোধ সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ হয় মাত্র। হরবল্লভের প্রতি ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি আমাদের 'পিতা স্বর্গ' ধারণায় অনুপ্রাণিত ত করেই না, ব্রজেশ্বরের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণায় আমাদের

পরিপূর্ণ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ যদি পিতৃপূজা প্রচলন করা হয় তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে, হরবল্লভই সে পূজার প্রবল প্রতিবন্ধক। হরবল্লভের নীচ আচরণের পাশে ব্রজেশ্বরের 'পিতা স্বর্গ' আবৃত্তি একটা অর্থহীন অশ্রদ্ধেয় ব্যাপারে পরিণত হয়েছে মাত্র।

(গ) দেবীরাণীর ডাকাতি ব্যাপারে কিছু পরস্পরবিরোধী উক্তি আছে। নামে দস্যুদলের নেত্রী হ'লেও দেবীরাণী যে নিজে ডাকাতি করেন না একথা তিনি স্বয়ং ব্রজেশ্বরকে জানিয়েছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও দেবীরাণীর দান দৃশ্যে (দ্বিতীয় খণ্ড একাদশ পরিচ্ছেদে) জানিয়েছেন, দেবীরাণীর দান-ধ্যান ছাড়া "অন্য ডাকাইতি নাই।" অথচ ডাকাত দলের রাণীগিরির জন্যই ভবানী পাঠক তাঁকে সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রস্তুত ক'রেছিলেন। এই প্রস্তুতি ও অব্যবহারের মধ্যে কোনও কার্যকারণ সম্বন্ধ তুলে ধরা হয়নি। পক্ষান্তরে দেবীর নির্দেশে রঙ্গরাজের দল ব্রজেশ্বরের নৌকায় ডাকাতি করতে গেছে। দেবীর নির্দেশে ডাকাতি করা যদি অনন্যসাধারণ ঘটনা হত তাহ'লে রঙ্গরাজের দল এই অচিন্ত্যপূর্ব আদেশে বিস্মিত হয়ে যেত। এ ছাড়া ব্রজেশ্বরের নিকট স্বয়ং নিশি জানিয়েছে, 'দেবীরাণী সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন।' (২১৭) ব্রজেশ্বরের নিকট দেবীর বিরুদ্ধে নিশির মিথ্যা ভাষণের কোনও কারণ নেই।

॥ ৩ ॥ চরিত্রচিত্রণ ও অসঙ্গতি

ব্রজেশ্বর

'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের কেন্দ্রস্থলে এমন একটি চরিত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র স্থাপন করেছেন যাঁর শৌর্য, বীর্য, মহত্ত্ব, ত্যাগ কোনও কিছুই সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উচ্চস্তরের নয়। বাইশ বছরের তরুণ প্রাণে না আছে যৌবনের উদ্দামতা, না আছে মহান্ কোনও আদর্শ। 'বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান' যে সকল বাঙ্গালী 'নিদ্রারসে ভরা' জীবনের মধ্যে যৌবনের সার্থকতার সন্ধান করেন —ব্রজেশ্বর তাঁদের থেকে খুব দূরবর্তী নন। তাঁর নূতন প্রাণের মধ্যে প্রাচীন কালের সংস্কার। পিতৃরাজতন্ত্রের মধ্যে নিরুদ্ধ জীবনাবেগ। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, কোনও দিকেই তাঁকে নায়কলক্ষণাক্রান্ত ক'রে তোলা হয়নি। বাইশ বছরের মানুষটির তরুণ প্রাণকে তিনটি বিবাহের দ্বারা ইতঃপূর্বেই ভারাক্রান্ত করা হয়েছে। এই তিনটি পত্নীর প্রথমা, প্রফুল্ল, শ্বশুরবাড়ী হ'তে বিতাড়িত। দ্বিতীয়া, নয়নতারা, রূপে কালী, বচনে ভৈরবী। তৃতীয়া, সাগরবৌ, বড় লোকের মেয়ে। ঘর

করে না···মাঝে মাঝে পদার্পণ করে। ব্রজেশ্বর বিবাহিত হয়েছেন মাত্র কিন্তু দাম্পত্যজীবনে সুখ ঘটেনি। পিতা হরবল্লভ স্বার্থ চেনেন···আর পুত্র ব্রজেশ্বর পিতাকে পরমার্থ বলে জানেন। এমনি ছকে বাঁধা জীবনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া অতীতের প্রথমা পত্নী সহসা আবির্ভূত হন। দারিদ্র্যনিপীড়িত অপরূপ লাবণ্যের প্রতিমূর্তি প্রফুল্ল, ব্রজেশ্বরের প্রথমা পত্নী। পিতার আদেশ তাঁকে আশ্রয় দেওয়া চলবে না। তাঁর কোনও স্থান নেই শ্বশুর গৃহে। যে-মানুষ পিতৃভক্ত সে মানুষ মাথা নীচু ক'রে পিতার আদেশ মেনে নিল। যে-মানুষ বাইশ বছরের তরুণ তার পুরুষের কৌতূহল জাগ্রত হল। প্রফুল্লকে একটি বার দেখা যায় না? ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর কাছে এই তরুণ প্রাণ নিজের কৌতূহল মেলে দিয়েছে···কিন্তু ঠাকুরাণীর কাছে তার সাহায্য মেলে নি। সাগরবৌয়ের সাহায্য মিলেছে। প্রফুল্লর দেখা মিলেছে ব্রজেশ্বরের। সাগরবৌয়ের ছেলেমানুষীতে বাইশ বছরের তরুণ আর উনিশ বছরের তরুণী—দাম্পত্যজীবনের দীর্ঘবিরহের অবসানে একটি আনন্দমধুর রাত্রি একই শয্যায় অতিবাহিত করেছেন। এই অনাস্বাদিত দাম্পত্যপ্রেমের উদ্বোধন ঘটেছে ব্রজেশ্বরের রূপলুব্ধ চুম্বনে। পরিপূর্ণ মিলনের ব্যঞ্জনায় প্রফুল্ল সাগরবৌকে জানিয়েছেন যে তিনি নারীজীবনের পরম তীর্থে কামনার ধন লাভ করেছেন। ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্ত পুত্ররূপের অন্তরালে ক্ষণকালের জন্য একটি মনুষ্যসত্তা, স্বামিসত্তা, বিচারক্ষম তরুণসত্তা জাগ্রত হয়েছে। তিনি তরুণী পত্নীকে গৃহে স্থান দেবার জন্য পিতাকে স্বয়ং অনুরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন। প্রফুল্ল তাঁর মত দুঃখিনীর জন্য পিতাপুত্রের মন কষাকষি চান নি। তখন ব্রজেশ্বর প্রফুল্লের খোরপোষের ব্যবস্থা করার কথা বলছেন। সেখানেও হরবল্লভের নিকট ভিক্ষা নিতে প্রফুল্ল অস্বীকার করেছেন। স্বামীর কাছে কেবল ভিক্ষা নিতে পারেন। তখন ব্রজেশ্বর তাঁর একমাত্র সম্বল মূল্যবান হীরার আংটি, তাঁর প্রেমের অভিজ্ঞানস্বরূপ প্রফুল্লের জীবনধারণের প্রয়োজনে দান করেছেন। এ ছাড়া নূতন প্রেম-উপলব্ধির প্রেরণায় দুটি প্রতিজ্ঞা করেছেন—

(ক) "যাহাতে আমি দু পয়সা রোজগার করিতে পারি সেই চেষ্টা করিব। যেমন করিয়া পারি, আমি তোমার ভরণ পোষণ করিব।"

(খ) প্রফুল্লের প্রশ্ন ছিল, "যদি এর পর চিনিতে না পার?" ব্রজেশ্বর উত্তর দিয়েছেন, "ও মুখ কখনও ভুলিব না।"

ব্রজেশ্বর এর কোনওটি রক্ষা করতে পারেন নি। ব্রজেশ্বর বাড়ী থেকে পালিয়ে রাত্রি বেলা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। কিন্তু দিনের মধ্যে একবারও 'দু পয়সা রোজগার' ও স্ত্রীর ভরণপোষণের প্রচেষ্টা করেছেন তার কোনও নিদর্শন নেই। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হয়নি। অথচ প্রফুল্লের আঠার বছরের রূপ আঠাশ বছরে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়নি বলে সাগরবৌ দেবীচৌধুরাণীকে পিত্রালয়ে দেখামাত্র চিনতে পেরেছিলেন। ব্রজেশ্বরের মাতৃদেবীও 'নতুন বৌ' বরণের পর ব্রজেশ্বরকে বৌয়ের নতুনত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু 'প্রফুল্লময়' ব্রজেশ্বর প্রফুল্লর সঙ্গে এক রাত্রি অতিবাহিত করার পরও বজরার মধ্যে ঘনসান্নিধ্যে তাঁকে চিনতে পারেন নি। 'ভরণপোষণের' প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও প্রফুল্লের মা যেভাবে দারিদ্র্যে, অনশনে, ব্যাধিতে মারা গেছেন তাতে ব্রজেশ্বরের প্রতিজ্ঞাপালন ও দায়িত্ববোধ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা হয়। প্রফুল্লর মাতৃশ্রাদ্ধে হরবল্লভ যখন প্রফুল্লের প্রতিবেশীদের নূতন ক'রে অপমান ক'রেছেন, তখনও ব্রজেশ্বর লুকিয়ে প্রফুল্লের পাশে দাঁড়াতে আসেন নি। অথচ সেই ব্রজেশ্বরই একদিন সকলের অসাক্ষাতে গভীর রাত্রে বাড়ী থেকে লুকিয়ে চোরের মত প্রফুল্লের অভিসারে এসেছেন। এখানে মহান্ কোনও কর্তব্যবোধ অপেক্ষা যৌবনের আসক্তিই তাঁকে আকর্ষণ করেছে মনে করা ভুল হবে না। প্রফুল্ল অপহৃত হয়েছেন। সংবাদ রটেছে, তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। ব্রজেশ্বর অস্বাভাবিক নিস্পৃহতার সঙ্গে সে সংবাদ সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। মাত্র কয়েক মাইল দূরবর্তী প্রফুল্লের পল্লী। এ সংবাদের পরও সেখানে কোনও প্রাণের টানে তিনি প্রতিবেশীর কাছে খবর নিতে যান নি। অশৌচপালন এবং প্রকাশহীন বিরহবেদনায় তাঁর কর্তব্য শেষ করেছেন। প্রথম চুম্বনের পর ব্রজেশ্বরের জাগরণের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা ব্যর্থ হল।

ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্লের দ্বিতীয় চুম্বনের ব্যবস্থা করেছেন বঙ্কিম দশ বৎসর বাদে। এই দশ বৎসরে ব্রজেশ্বর আরও 'প্রফুল্লময়' হয়েছেন। দেবীচৌধুরাণী রূপের অন্তরালে আত্মগোপন করে প্রফুল্ল দস্যুদলের নেত্রীত্ব করেছেন। এই 'প্রফুল্লময়' ব্রজেশ্বর ও নিষ্কাম সাধনব্রতী প্রফুল্লের দ্বিতীয় চুম্বনের ঘটনা ঘটেছে বজরায়। প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে ধরে এনেছেন বজরায়। যে 'পতি পরম গুরু'কে তিনি তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা করেছেন তাঁকে দিয়ে সাগরবৌয়ের পা-টেপবার জন্য তিনি যে কিভাবে ষড়যন্ত্র করলেন বোঝা গেল না। যে-ব্রজেশ্বর, বৈকুণ্ঠেশ্বরের স্থান গ্রহণ

করেছেন, যে-ব্রজেশ্বর তাঁর নিষ্কাম সাধনাকে সপ্রেম সাধনায় রূপান্তরিত করেছেন, তাঁকে টেনে নিয়ে এলেন তিনি সপত্নীর পদসেবা কার্যে। এর পর ব্রজেশ্বরকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মোহর দিলেন দেবীচৌধুরাণী, ব্রজেশ্বরের পিতার ঋণমুক্তির জন্য। দেবীর নিষ্কাম সাধনার অর্থও যেমন বোঝা যায় না। 'জিতেন্দ্রিয়' 'প্রফুল্লময়' বত্রিশ বছরের ব্রজেশ্বরের জিতেন্দ্রিয়ত্ব এবং প্রফুল্লময়ত্বও ভাল বোঝা যায় না। যে রাত্রে রঙ্গলাল তাঁকে বজরায় নিয়ে আসে সে রাত্রে তিনি জানতে চেয়েছেন দেবী চৌধুরাণীর রূপ-যৌবন কিরূপ। নিম্নলিখিত কথোপকথন ঘটেছে—

ব্রজ—তোমাদের রাজরাণী একটি দেখবার জিনিষ শুনিয়াছি। তিনি না কি যুবতী ?

রঙ্গ—তিনি আমাদের মা—সন্তান মায়ের বয়সের হিসাব রাখে না।

ব্রজ—শুনিয়াছি বড় রূপবতী।

এই কি 'জিতেন্দ্রিয়' 'বয়স্ক' 'প্রফুল্লময়' ব্রজের উক্তি! বিশেষতঃ যখন কেউ কোনও নারীকে 'মা' বলে উল্লেখ করে তখন তার কাছে 'তার মা রূপবতী কিনা' প্রশ্ন যথেষ্ট কুরুচির পরিচায়ক। আর সবচেয়ে আশ্চর্য রঙ্গলালের ন্যায় দুর্ধর্ষ দস্যু, 'তার মা রূপবতী কি না' প্রশ্নের দ্বারা আহত হ'য়েও ব্রজ-কে জামাই আদরে বজরায় হাজির করেছে। সাধারণ মানুষ যে অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, রঙ্গলালের ন্যায় দস্যু, ব্রজের পরিচয় না জেনেও, কেবল কর্ত্রীর নির্দেশে তাঁকে যে কিভাবে আপ্যায়িত ক'রে নিয়ে আসে বোঝা যায় না। এই 'প্রফুল্লময়' ব্রজেশ্বর দেবীচৌধুরাণীকে প্রফুল্ল বলে চিনতে পারেন নি। কিন্তু সাগর 'প্রফুল্লময়' না হওয়া সত্ত্বেও তার পিত্রালয়ে (প্রথম দর্শনের) দশবৎসর পরে দেবীচৌধুরাণীর প্রথম আবির্ভাব মুহূর্তে তাকে চিনতে ভুল করেনি। ব্রজেশ্বরের অদ্ভুত প্রফুল্ল-ময়তার পরে জিতেন্দ্রিয়তারও অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। দেবীচৌধুরাণী যখন মোহরের ঘড়া দেবার পর একটি আংটি তাঁর হাতে পরিয়ে দেন তখন ব্রজেশ্বর দেবীরাণীকে চুম্বনে অভিষিক্ত করতে আর দ্বিধা করেন নি। অপরিচিতা এক দয়াবতী নারীকে এভাবে চুম্বন করার মধ্যে 'প্রফুল্লময়'তার বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই। অতঃপর ব্রজেশ্বর লজ্জিত হয়ে দ্রুতবেগে প্রস্থান করেছেন বটে কিন্তু সেটা কতখানি তাঁর দৌর্বল্যের জন্য লজ্জায়, না দেবীচৌধুরাণীর ন্যায় নারীদস্যুকে এভাবে হঠপরিরম্ভণের পর বিপদের আশঙ্কায়, বলা যায় না। এই দ্বিতীয় চুম্বনের সঙ্গে আর একটি ঘটনাকে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। একটি

সুন্দরী নারী যখন তাঁকে পদসেবায় নিয়োজিত করেছিল তখন নেহাৎ কামুকের ন্যায় তিনি কিছু উক্তি ও আচরণ করেছিলেন। সুন্দরী যখন শায়িত অবস্থায় তাঁর উরুদেশে নিজের আলতাপরা রাঙ্গা পা স্থাপন ক'রে পা টিপতে বলেছেন তখন তিনি সেই সেবাকার্যে অগ্রসর হতে দ্বিধা করেন নি। সাগর তাঁর সেই জিতেন্দ্রিয়তার উপর আলোকপাত ক'রে ঠিকই বলেছে, "যখন পরের স্ত্রী মনে করিয়াছিলে তখন বড় আহ্লাদ করিয়া পা টিপিতেছিলে।" ব্রজেশ্বরের নৌকা-বিহার পর্বে সাগরবৌ এবং দেবীচৌধুরাণী তাঁর সঙ্গে প্রেমের যে অম্লমধুর আয়োজন করেছেন ব্রজেশ্বরের দ্বিতীয় চুম্বন বর্ণনা তার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে।

ব্রজেশ্বর সাগরবৌকে নিয়ে ফিরেছেন বাড়ীতে। হরবল্লভকে টাকা দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে নারী-দস্যুর কাছে তিনি সুবিধাজনক সর্তে তা লাভ করেছেন। যথাসময়ে তা ফেরৎ দিতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রজেশ্বরকে 'সত্যবাদী' বলে উল্লেখ করেছেন বটে কিন্তু তিনি যে পিতার নিকট সত্য ভাষণে লুকোচুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ জানিয়েছেন "ব্রজেশ্বরের প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে লেখে যে এখানে বাপের কাছে ভাড়াভাড়িতে দোষ নাই।" ব্রজেশ্বর সাগরবৌয়ের নিকট দেবীর পরিচয় পেয়েছেন...কিন্তু সত্যবাদী ব্রজেশ্বর, যিনি পিতাকে স্বর্গ, ধর্ম এবং পরম তপ বলে মনে করেন, সে সম্বন্ধে পিতার নিকট বিন্দুমাত্র উচ্চবাচ্য করেন নি। জীবিত স্ত্রীর অশৌচান্ত করায় অধর্ম হয়েছে কিনা প্রশ্ন জাগে নি। 'প্রফুল্লময়' ব্রজেশ্বর দেবীচৌধুরাণীর সঙ্গে আকস্মিক মিলনের পরে নূতন মানুষ হয়ে যান নি। হরবল্লভ টাকা শোধ করার অভিনব পরিকল্পনা করেছেন। নির্দিষ্ট দিনে যাতে দেবীচৌধুরাণী নির্দিষ্ট স্থানে টাকা নিতে এলে ইংরাজের হাতে ধরা পড়েন তার ব্যবস্থা করেছেন। বজরায় অপেক্ষা করেছেন দেবীচৌধুরাণী।... ব্রজেশ্বর এসেছেন প্রফুল্লের কাছে...এবার তিনি দেবীকে 'প্রফুল্ল' বলে সম্বোধন করেছেন। দেবীচৌধুরাণীর অন্তরালে যে-প্রফুল্ল স্বামীর জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় শুষ্ক ছিল সে প্রফুল্ল জেগে উঠেছে। এবার তিনি স্বামী পেয়েছেন...তাঁর আত্মত্যাগের সংকল্প ছিল। ইচ্ছা ছিল ব্রজেশ্বরের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার ক'রে তিনি ইংরাজের হাতে আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু এই পুনর্মিলন তাঁর ব্যর্থ জীবনকে আবার প্রত্যাশাস্পন্দিত ক'রে তুলেছে। আবার তিনি বাঁচতে চান। কিন্তু সে পথে যে বড় বাধা। গোয়েন্দা হয়ে শ্বশুর এসেছেন...তিনি যদি ধরা না দেন তাহ'লে শ্বশুরের সর্বনাশ! অতএব তিনি সব দিক রক্ষা করার চিন্তা

করলেন। ব্রজেশ্বর জানলেন যে পিতা গোয়েন্দা হয়ে তাঁর স্ত্রীকে ধরিয়ে দিতে আসছেন। হরবল্লভের নীচতা, কৃতঘ্নতা তাঁর মনে কোনও রেখাপাত করল না। তিনি সেই পিতাকে স্বর্গ এবং ধর্ম মনে করে "পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে" এই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন। দেবীর অসামান্য বুদ্ধিকৌশলে জালে উঠলেন রুই কাৎলা—সাহেব ও গোয়েন্দা। সাহেব ব্রজেশ্বরকে আদেশ করলেন দেবীকে সনাক্ত করার জন্য। ব্রজ রাজি হলেন না। সাহেব গর্জন ক'রে বললেন, "কেঁও বদজাত? তোম গোইন্দা নেই।" "নেহি" বলে ব্রজেশ্বর সাহেবের গালে বিরাশী সিক্কার এক চপেটাঘাত করলেন। হরবল্লভ সর্বনাশ আশঙ্কায় কেঁদে উঠলেন। ব্রজেশ্বরের এই চপেটাঘাত একটা উদ্ধত হঠকারিতা মাত্র। সাহেব যে তার পিতার মুরুব্বি এ জ্ঞান তাঁর বিলক্ষণ ছিল এবং পিতার শুভ চিন্তায় তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। এ অবস্থায় তিনি এমন কাজ কি ক'রে করেন! বিশেষ করে সাহেব যখন মুখে গর্জন ক'রেছেন মাত্র তখন তার মৌখিক প্রতিবাদ না ক'রে হঠাৎ চপেটাঘাত ভদ্রতাও নয়, পিতার প্রতি কর্তব্যও নয়। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতি পরাধীন কৃষ্ণবর্ণের জাতীয় বিদ্বেষ এই ভাবে কিছুটা প্রশমিত হয় বলে বাঙ্গালী এ ঘটনায় হাততালি দিতে পারে বটে, কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে এ ঘটনা সঙ্গতও হয়নি, স্বাভাবিকও হয়নি। চপেটাঘাত যে পিতার সবনাশ ঘটিয়েছে এটা বুঝতেও ব্রজেশ্বর যথেষ্ট দেরী করেছেন। হরবল্লভ ছেলেকে ভর্ৎসনা করাতে ব্রজেশ্বর প্রতিবাদ করেছেন পিতার কথায়। বলেছেন, "আমি ইংরাজের গায়ে হাত তুলেছি না ইংরাজ আমার গায়ে হাত তুলেছে।" ব্রজেশ্বর অবশ্য পিতার অবাধ্য না হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। কিন্তু সাহেব যখন তাঁর সঙ্গে 'সেক্‌হ্যাণ্ড' করেছেন তখন ব্রজেশ্বর সেই অজ্ঞাতপূব ব্যাপারে বিস্মিত হ'য়ে "কি জানি যদি আবার বাঁধে" ভেবে কামরার বাইরে গিয়ে বসেছেন। 'সেকহ্যাণ্ড'-ভীতি ব্রজেশ্বরের চরিত্রের আর একটা দিকের উপর আলোকপাত করে। বত্রিশ বছরের ব্রজেশ্বর জ্ঞান-বুদ্ধিতে নেহাৎ বালক। ইংরাজী আদবকায়দার জ্ঞান তখনকার দিনে হয়ত না থাকতে পারে। কিন্তু বত্রিশ বছরের স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে বোঝা উচিত ছিল 'সেক্‌হ্যাণ্ড'-এর দ্বারা সাহেব তাঁকে আপ্যায়িত করেছেন মাত্র। ব্রজেশ্বর যে 'কচি খোকা' একথা রঙ্গলাল একবার বলেছিল। ইংরাজ ও দেবীরাণীর সৈন্যদল ব্রজেশ্বরের হাতে সাদা পতাকা দেখে পারস্পরিক আক্রমণ বন্ধ করায় বিস্মিত ব্রজেশ্বর প্রশ্ন করেছেন, "সাদা নিশান দেখিয়াই দুই দলে যুদ্ধ

বন্ধ করিল কেন ?" এ প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গলাল "কচি খোকা" বলে ব্রজেশ্বরকে যেভাবে সম্বোধন করেছে তা ব্রজেশ্বরের পরবর্তী আচরণের দ্বারা যথার্থ বলে মনে হয়েছে।

আসন্ন বিপদ হ'তে দৈবের কৃপায় এবং দেবীরাণীর বুদ্ধিকৌশলে পরিত্রাণ পাবার পর বঙ্কিমচন্দ্র ব্রজেশ্বরের তৃতীয় চুম্বন দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন। এই চুম্বন, দাম্পত্যজীবনে প্রফুল্লের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্বোধন ও দেবীরাণী-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছে। প্রফুল্লকে কৌশলের দ্বারা 'নতুন বৌ'রূপে চালাতে ব্রজেশ্বর রাজী হন নি। তিনি সত্যবাদী এবং পিতৃভক্ত। তিনি পিতার নিকট প্রফুল্লের সত্য পরিচয়ে যথার্থ মর্যাদা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অথচ দেখা যায় 'নতুন বৌ'রূপে প্রফুল্লকে বরণ করার সময় মাকে কিংবা বাবাকে সে কথা বলেন নি ব্রজেশ্বর। বধূ বরণের পর মায়ের প্রশ্নের উত্তরে ব্রজেশ্বর স্বীকার করেছেন যে 'এ নতুন বিয়ে নয়', কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, 'এখন মা তুমি বাবাকে কিছু বলিও না। নির্জনে পাইলে আমি সকলই তাঁর সাক্ষাতে প্রকাশ করিব।' মা বৌভাত পর্যন্ত ব্রজেশ্বরকে কোনও কথা বলতে বারণ করেছেন এবং বৌভাতের পর নিজেই সে কঠিন কাজের ভার নিয়েছেন। ব্রজেশ্বর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে ("ব্রজ বাঁচিল")। এই কি সত্যবাদী ব্রজেশ্বরের প্রতিজ্ঞা পালন ? মা কার্যোদ্ধার করেছেন। তখন পুত্র হৃষ্টচিত্তে প্রফুল্লকে সব খবর দিয়েছেন। পিতা ও মাতা বাইরে সকলের কাছে প্রফুল্লকে 'নতুন বৌ' রূপে চালিয়েছেন। সত্যধর্ম রক্ষায় কৃতসংকল্প হয়ে ব্রজেশ্বর সে কথা অম্লানবদনে মেনে নিয়েছেন। ব্রজেশ্বরের সহানুভূতি ছিল, কিন্তু পৌরুষ ছিল না। রূপ এবং তরুণ দেহ ছিল, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি শৌর্য বীর্য কোনও দিকই তাঁর বিশেষ বিকশিত ছিল না। মীনকেতনের বিচিত্র রহস্য! এই মানুষটিকেই প্রফুল্ল তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা বলে গ্রহণ করেছিলেন। বোকা বোকা, খোকা খোকা, ভালমানুষ, রূপবান, যুবক স্বামী তাঁর মনকে অনিবার্য ভাবে আকর্ষণ ক'রে নারীত্বকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে একাধিক ক্ষেত্রে নায়িকার বাৎসল্যমিশ্র-শৃঙ্গাররসের চমৎকার চিত্র আছে। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন নারীর মধ্যে মাতৃত্ব এবং পত্নীত্ব প্রবল। তাই এই ধরণের পুরুষের প্রতি নায়িকার একটা মমতা জাগ্রত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করেন নি। কিন্তু দেবীচৌধুরাণীর প্রণয় প্রবর্তনায় ব্রজেশ্বরের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে এই ধারণা সমর্থিত

হয়। তা নইলে দায়িত্বজ্ঞানহীন, পত্নীত্যাগী, বহুবল্লভ, বুদ্ধি-জ্ঞান-শক্তিবিহীন ব্রজেশ্বরের জন্য প্রফুল্লের প্রবল প্রেমের কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রজেশ্বরের অসহায় সহানুভূতি, তরুণ দেহের রূপলাবণ্য, এক রাত্রির স্মৃতি, হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য—সব কিছুই বোধহয় তরুণী প্রফুল্লের মনকে স্বামীর প্রতি স্নেহে ও প্রেমে পূর্ণ করেছে। ফলে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লের জীবন-নায়ক হয়েছেন, গ্রন্থে কাহিনীর নায়ক না হলেও।

প্রফুল্ল

প্রফুল্লের জীবনকাহিনীর দুই প্রান্তে দুটি আহ্বান। এক প্রান্ত হ'তে দরিদ্রমাতা আহ্বান করেছেন পিপি-প্রফুল্ল-পোড়ারমুখীকে অনাদৃত করুণ মমতায়। অপর প্রান্ত হ'তে দেবী প্রফুল্লকে বঙ্কিমচন্দ্র আহ্বান করেছেন বাংলার গৃহে গৃহে—প্রাচীন আদর্শের নূতন রূপ নিয়ে আসুন প্রফুল্ল; বাঙ্গালী বধূর জীবনে প্রাচীন আদর্শের চিরন্তন রূপ অভিব্যক্ত হোক। এই দুই-প্রান্ত-মধ্যবর্তী প্রফুল্লের জীবন 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। প্রফুল্লের জীবনের প্রারম্ভে রয়েছে অভাব-লোকের নির্মম দীনতা, পরিণতিতে এসেছে ভাবলোকের অকুণ্ঠ ঐশ্বর্য। প্রাচীন বাংলার সমাজজীবনে প্রফুল্লের মত পরিত্যক্তা বধূর অভাব ছিল না। প্রফুল্লের মাতা অক্ষম মমতায় ধনী শ্বশুরের পরিত্যক্তা বধূটিকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অবশেষে নির্মম দারিদ্র্য মান-অপমানের সমস্ত চিন্তাকে বিদূরিত ক'রে ঠেলে নিয়ে গেছে হরবল্লভের গৃহে। সেখান হ'তে আবার ফিরে আসতে হয়েছে প্রফুল্লকে শ্বশুরের চিরনির্বাসন দণ্ড মাথায় পেতে, কিন্তু রিক্ত হাতে নয়। শূন্য পথযাত্রার পাথেয় কিছু লাভ হয়েছে। স্বামী ব্রজেশ্বর ও সপত্নী সাগরবৌ প্রফুল্লের ব্যর্থজীবনে ক্ষণকালের জন্য প্রেম ও প্রীতির নির্ঝর স্রোত প্রবাহিত করেছেন। ফিরে এসেছেন স্বামীর বাহুবন্ধন ও মুখচুম্বনের স্মৃতিকে মানসলোকের চিরকালীন সম্পদ ক'রে। আঙ্গুলে উঠেছে প্রেমের অভিজ্ঞান। স্বামীর এক রাত্রির সহানুভূতি ও সমাদর বঞ্চিত প্রফুল্লের মনকে অপরূপ আবেশে ভরে দিয়েছে। তবু চলে আসতে হয়েছে প্রফুল্লকে শ্বশুরবাড়ীর অপমান মাথায় পেতে। শ্বশুরের বিদ্রূপবাণীকে শিরোধার্য করে। চলে আসতে হয়েছে প্রতিদিনের একরঙা দারিদ্র্যনিষ্পেষিত জীবনে। সেখানে অনাদরে অপমানে অনাহারে অচিকিৎসায় মৃত্যু ঘটেছে মায়ের। দরিদ্র, অসহায়, সুন্দরী প্রফুল্ল

বিশ্বসংসারে এবার একা। যে-প্রতিবেশীরা তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা ক'রে প্রফুল্লের দাম্পত্য জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে তারাই এবার এগিয়ে এসে হরবল্লভের কাছে করুণ আবেদন করেছে পরিত্যক্তা, অনাথা বধূকে স্থান দেবার জন্য শ্বশুর গৃহে। স্থান হ'ল না প্রফুল্লের সেখানে। বিপদের উপর বিপদ। নিঃস্ব নিঃসহায় সুন্দরী প্রফুল্লকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গেল কামুক মানুষের হিংস্র রিরংসা। বাস্তবলোকের একটি চমৎকার চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তুলে ধরেছেন। আমাদের বাঙ্গালী জীবনের একটি অনবদ্য রূপ এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু এখানে একটি সামাজিক উপন্যাস রচনা করতে অগ্রসর হন নি। তিনি উপন্যাসকে 'প্রচারের কল' হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আপন আদর্শকে পাঠক সমাজে প্রচার করতে চান। তাই বাস্তবলোক হ'তে অপহৃত প্রফুল্ল নিশীথ অন্ধকারে পরিচিত পৃথিবীর বাইরে চলে গেছেন চিরকালের জন্য। তাঁর বদলে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ-লোকের এক নারী তাঁর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যে, দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের কালে, সন্ন্যাসী দস্যুদের দ্বারা অনুশীলন-তত্ত্বের একটি অংশ শুনিয়েছেন 'আনন্দমঠ'-এ। এইবার সেই উত্তরবঙ্গে, সেই দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত পরবর্তী কালে, আর এক দস্যু সম্প্রদায়ের দ্বারা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের আর একটি কাহিনী পরিবেশন করেছেন। সেদিন দেবীসিংহের অত্যাচারে দেশের লোক ব্যতিব্যস্ত। ইংরাজের রাজশক্তি মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের উপর ধীরে ধীরে নিজেকে প্রসারিত করতে সুরু করেছে। বঙ্কিমের চোখের সামনে ভেসে এসেছে প্রিন্স জন ও অত্যাচারী ডিউক সম্প্রদায়ের দ্বারা উৎপীড়িত ইংলণ্ডের সাধারণ নরনারীর কথা। মনে এসেছে সেই পরিবেশে শেরউড অরণ্যে দস্যু ও দরিদ্রের পরিত্রাতা রবিন হুডের কথা। বাংলার দুর্যোগঘন অন্ধকারে 'দেবীচৌধুরাণী' নামে যে দস্যু-নেত্রী, ভবানী পাঠক নামে যে দস্যুসর্দার অত্যাচারের মশাল জ্বালিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, তাদের বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শান্বিত রূপে উপস্থিত করেছেন দরিদ্রের ত্রাণকর্তারূপে কল্যাণের আলোকবর্তিকা হাতে। বাংলাদেশের সাধারণ এক বধূ বঙ্কিমচন্দ্রের কবিকল্পনায় এক হয়ে গেছেন সেই আদর্শান্বিত দেবীচৌধুরাণীর সঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট নূতন ধর্মমত, পজিটিভ দর্শনের greatest good of the highest number, একটি চমৎকার সত্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। সনাতন আদর্শের 'পতিপ্রেমকে ঈশ্বরপ্রেমের সোপান' রূপে গ্রহণ

করা এবং 'পিতাকে ধর্ম স্বর্গ ইত্যাদি রূপে পূজা'র কথাও এই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তকে অধিকার করেছে। গীতার 'নিষ্কাম সাধনা' বঙ্কিমচন্দ্রের মনকে তখন অপূর্ব ভাবে বিভোর করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এইবার এই সকল বিষয়ের সমন্বয় সাধন ও 'প্রচারের মনোজ্ঞ কল' হিসেবে 'দেবী চৌধুরাণী'কে গঠন করলেন।

প্রফুল্লের জীবনে নূতন অধ্যায় সুরু হ'ল। প্রফুল্ল ব্যক্তিবিশেষের কামনার নরক হ'তে ধর্মস্বর্গের উদয়াচলে জ্যোতির্ময়ী উষার মত নবরূপে আবির্ভূত হলেন। অপহৃত প্রফুল্ল আপনাকে উদ্ধার করলেন, উদ্ধার করলেন গুপ্তধন। এইবার উদ্ধার করাতে হবে তাঁকে দিয়ে দস্যু-সম্প্রদায়কে, প্রজা-সাধারণকে। দস্যুসর্দার ভবানী পাঠক এমন একটি শক্ত ইস্পাত খুঁজছিলেন। এবার তাকে গড়ে পিঠে নেয়ার পালা। পাঁচ বছর ধর্মশিক্ষা ও পাঁচ বছর কর্মশিক্ষা হ'ল। প্রফুল্ল এখন নূতন মানুষ। শিক্ষায়, শক্তিতে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে তিনি অতুলনীয়া। রূপে তিনি ভগবতী, গুণে তিনি অন্নদা। দীর্ঘ দশবছর বাদে দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে আবার ব্রজেশ্বরের ছিন্ন জীবনে জোড়লাগার সম্ভাবনা দেখা দিল। এ ক'বছরে প্রফুল্ল নিষ্কাম সাধনার মধ্যে কৃষ্ণকে স্বামী ব্রজেশ্বরের মধ্যে আবিষ্কার করার ধ্যান করেছেন। সাগরবৌয়ের পিত্রালয়ে ব্রজেশ্বরকে তিনি জানলার আড়াল হ'তে দেখেছেন, কিন্তু ব্রজেশ্বরকে আত্মপরিচয় দেন নি। বরঞ্চ সপত্নীর অন্তরের মূক ক্রোধকে মুখরতা দিয়ে অন্তরাল হ'তে স্বামীকে অপমান করেছেন। সেই মৌখিক অপমানকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর স্বামী, তাঁর দেবতা ব্রজেশ্বর, তাঁরই সতীনের পদসেবা করেছেন তাঁরই বজরায়, তাঁরই প্রচেষ্টায়। ঘটনাটির মধ্যে চমৎকারিত্ব আছে...কিন্তু প্রফুল্লর সাধনার সঙ্গে সঙ্গতি কোথায়? প্রফুল্ল প্রথমে ব্রজেশ্বরের অমর্যাদা পরে মর্যাদার ব্যবস্থা করেছেন। ব্রজেশ্বর পিতার ঋণ পরিশোধের জন্য সাগরবৌয়ের পিত্রালয়ে গমন করেছিলেন এবং বিফলমনোরথ হয়ে ফিরছিলেন। সেই ব্রজেশ্বরকে সপত্নীহস্তে নাকাল করার পর দেবীরাণী পঞ্চাশ হাজার টাকার সোনার মোহর এবং সেই সঙ্গে সেই অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক সাথে আপন হৃদয়ের পেলব কোমলতা মেলে ধরলেন ব্রজেশ্বরের কাছে। এখানেও নিষ্কাম সাধনা ও ব্রহ্মচর্যের দশ বৎসরের ইতিহাস বোধহয় নিষ্ফল হয়ে গেল। দেবী ত ব্রজেশ্বরের মঙ্গল চেয়েছিলেন। আপন স্বামী ও শ্বশুরের কল্যাণ এবং প্রজা-সাধারণের কল্যাণকামনার মধ্যে গভীর পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সজল চোখে হাত ধরে আংটি পরানোর ঘটনাটি সম্পূর্ণ প্রেমিক হৃদয়ের ঘটনা...

কোনও ক্রমেই নিষ্কাম সাধনার ব্যাপার নয়। আর হাতধরায় যে প্রেমযজ্ঞের সূত্রপাত দেবীরাণী করেছেন, ব্রজেশ্বরের চুম্বনে সেই যজ্ঞের আহুতি। শকুন্তলার পিনদ্ধ বল্কল বন্ধনের মধ্যে হ'তে আশ্রম পরিবেশেও যে যৌবনচাঞ্চল্য স্তনিত হয়েছিল, ব্রহ্মচর্য নিষ্কাম সাধনা ও দস্যুদল পরিচালনা সত্ত্বেও সেই নারীহৃদয়-চাঞ্চল্যই অভিব্যক্ত হয়েছে এখানে। দেবীরাণীর নিষ্কাম সাধনা নিষ্ফল ক'রে দিয়েছেন ব্রজেশ্বর। ব্রজেশ্বরকে ঘিরে তাঁর সাধনা উদ্বেল হয়ে উঠেছে। যে ব্যর্থ প্রণয়বেদনা হৃদয়কে মথিত দলিত এবং আত্মঘাতে প্রলুব্ধ করে, দেবীরাণীর বিড়ম্বিত জীবনে এসেছে তেমনি একটি বেদনা। বৈরাগ্যের গৈরিক আচ্ছাদন অনুরাগ-রঞ্জিত হৃদয়টিকে একেবারেই আচ্ছন্ন করতে পারে নি। দেবীরাণী জেনেছেন শ্বশুর গোয়েন্দা হয়ে সাহেবের হাতে তাঁকে তুলে দিতে এসেছেন। কিন্তু তাঁব কামনা ব্রজেশ্বরকে ঘিরে। তিনি ধরা দিতে চান, কারণ দস্যুবৃত্তি তাঁর ভাল লাগে নি।...এ সাধনার আদর্শকে তিনি জীবনে গ্রহণ ক'রে ভুল করেছেন—এমন কথা তিনি ভবানী পাঠকের নিকট জানিয়েছেন। তবে চিরবিদায়ের পূর্বে একবার তিনি ব্রজেশ্বরের সাক্ষাৎ চান। সে সাক্ষাৎ তিনি লাভ করেছেন। লাভ করেছেন ব্রজেশ্বরের প্রণয়ব্যাকুল হৃদয়ের সাদর সম্ভাষণ। সেই মুহূর্তে তাঁর এই সুন্দর ভুবনে মরার সাধ ঘুচে গিয়েছে। দেবীরাণীর সাধনা যে আপন হৃদয়কে অস্বীকার ক'রে অনাসক্ত প্রাণের বিশ্বকল্যাণকামনা নয়, এই জীবন-রক্ষায় ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে অন্বিত ব্রজেশ্বরের আদর-অনাদরের কার্যকারণ সম্পর্ক সে বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ। দেবীরাণী আবার প্রফুল্লতে বিবর্তিত হয়েছেন। বুদ্ধি-কৌশলে ও দেবানুগ্রহে জীবনতরণী অনুকূল ঝঞ্ঝাপ্রবাহে বিপদের স্রোতোধারা অতিক্রম ক'রে আবার শ্বশুরবাড়ীর ঘাটে এসে ঠেকেছে। পুরাতন বধূ আবার নতুন বধূ রূপে গৃহে এসেছে। অনতিবিলম্বে শ্বশুরের উপর সম্রাজ্ঞী হয়েছেন, শাশুড়ীর উপর সম্রাজ্ঞী হয়েছেন, সপত্নীর উপর সম্রাজ্ঞী হয়েছেন প্রফুল্ল। অবশেষে পুত্রপৌত্রাদি-পরিবেষ্টিত হ'য়ে স্বর্গ গমন করেছেন।

প্রফুল্ল বঙ্কিমের আদর্শ নারীচরিত্র। তাই বঙ্কিমের আদর্শ বিচারে আমরা দেখি—

(ক) স্ত্রীশিক্ষা বঙ্কিমচন্দ্র অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করেছেন।

(খ) কাব্যব্যাকরণাদির সঙ্গে ধর্মশিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(গ) শরীরচর্চা নারীর অবশ্যকর্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব'-এ বলেছেন, "ইউরোপে যে অশ্বারোহণ করিতে পারে না এবং যাহার অস্ত্রশিক্ষা নাই সে

সমাজের উপহাসাস্পদ। বিলাতী স্ত্রীলোকদিগেরও এ সকল শক্তি হইয়া থাকে। আমাদের কি দুর্দশা ”…‘ধর্মতত্ত্ব’-এর পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্ল সম্বন্ধে বলেছেন, “লেখক প্রণীত ‘দেবীচৌধুরাণী’ নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে। এজন্য সে স্ত্রালোক হইলেও তাহাকে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে।” ‘রজনী’ গ্রন্থে রজনীও শারীরিক শক্তিতে হীরালাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ‘আনন্দমঠ’-এ লিগুলে কাহিনীতে শান্তি আপন শরীরচর্চার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রেখেছেন।

(ঘ) নিষ্কাম সাধনা জীবনকে ও সংসারকে প্রফুল্লময় করার আদর্শপন্থা।

(ঙ) নারীর জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মক্ষেত্র বাইরে নয়, অন্তঃপুরে। সেখানে সংসারের কেন্দ্রস্থলে বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি, বাণী বিদ্যাদায়িনী নারীর অন্নপূর্ণা রূপ।

(চ) পতিই নারীর দেবতা।

উল্লিখিত আদর্শগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রফুল্লর জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র এমন ভাবে চিত্রিত করেছেন যাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। কাব্যশিক্ষা প্রফুল্ল করেছেন বটে কিন্তু তার প্রয়োগ প্রফুল্লের কোনও উক্তির মধ্যে কোনও ছাপ রেখে যায় নি। অথচ প্রফুল্লের জীবনব্যাপী বিরহ-মিলন-লীলা প্রসঙ্গে এসব কাব্যপাঠ বিস্মৃত না হবার অনেক সুযোগ এসেছিল। দেবী শারীর চর্চা করেছেন বটে কিন্তু তার প্রয়োগ করেছেন কোনওক্ষেত্রে এমন বিবরণ পাই না। প্রফুল্লের সাধনাকে নিষ্কাম বলা চলে না। ‘দেবীচৌধুরাণী’ গ্রন্থে প্রফুল্লের সংসার-কর্মক্ষেত্রের বিশেষ কোনও চিত্র নেই। বাইরের কর্মক্ষেত্রের চিত্রই ফুটে উঠেছে। পতি যে নারীর দেবতা এ কথার বিরোধ দেবীর আচরণে দেখা গেছে। সাগরের অর্ধসমাপ্ত উক্তি পূর্ণ করার কালে তিনি স্বামীকে স্ত্রীর পদসেবার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। বজরায় সেই দেবতা স্বামীকে তিনি অপহরণ করিয়ে সপত্নীর পদসেবায় নিয়োজিত করেছেন।

ছোটখাট ত্রুটি

(ক) বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দেবী চৌধুরাণী’ গ্রন্থে ব্রজেশ্বর যখন প্রফুল্লকে এক রাত্রির জন্য “শয্যার পার্শ্বে স্থান” দেন তখন ব্রজেশ্বরের বয়স একুশ-বাইশ, প্রফুল্লের বয়স আঠার-উনিশ। প্রফুল্ল তখন বালিকা নন, যুবতী। পরবর্তী কালে ‘দেবী

চৌধুরাণী'-রূপী প্রফুল্লকে যখন ব্রজেশ্বর প্রথম দেখেন তখন তাঁর মনে আর এক প্রফুল্লের ছবি ভেসে এসেছে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ;—

'হ্যাঁ, ব্রজ আর একবার এমনই দেখিয়াছিল। সে আরও মধুর,—কেননা দেবীমূর্তি তখন বালিকার মূর্তি।' (২।৮)

এখানে উনিশ বছরের যুবতী প্রফুল্লকে 'বালিকা প্রফুল্ল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) ব্রজেশ্বরকে ধরে আনতে নির্দেশ দিয়ে দেবী চৌধুবাণী রাণীর বেশে বীণা বাজাচ্ছিলেন। তারপর ব্রজেশ্বরকে যখন বজরায় ধরে আনা হয়, তখন 'সে সকলই ত্যাগ করিয়া সামান্য বস্ত্র পরিয়া, হাতে কেবল একখানি মাত্র সামান্য অলঙ্কার রাখিয়া' ব্রজেশ্বরের প্রতীক্ষা করেছিলেন। তারপর ব্রজেশ্বর-প্রফুল্ল সাক্ষাৎ, চুম্বন, ও অঙ্গুরীয়ক প্রত্যর্পণ ঘটনা, দ্বিতীয় খণ্ড অষ্টম পবিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে। দশম পরিচ্ছেদে আবার দেবী চৌধুরাণী প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :—

"কোথায় গেল দেবী ? কই সে বেশভূষা, ঢাকাই শাড়ী, সোনাদানা, হীরা মুক্তা পান্না—সব কোথায় গেল ? দেবী সব ছাড়িয়াছে—সব একেবারে অন্তর্ধান করিয়াছে। দেবী কেবল একখানা গড়া পরিয়াছে—হাতে কেবল একগাছা কড়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ছিল না যে ইতঃপূর্বে দেবী রাণীব বেশ পরিত্যাগ ক'রে অত্যন্ত সাধারণ বেশেই ব্রজেশ্বরের সামনে এসেছিলেন (অষ্টম পরিচ্ছেদে) এবং অনেক পূবেই 'বেশভূষা, ঢাকাই শাড়ী, সোনা দানা, হীরা মুক্তা পান্না' সব অন্তর্হিত হয়েছিল। এই দৃশ্যে (দশম পরিচ্ছেদে) তিনি পূর্ববর্ণিত সাধারণ নারীর বেশ পরিত্যাগ ক'রে দীন-হীন বেশে 'গডা' পরে, 'কড়' হাতে, 'চটে' শুয়েছেন। রাণীর বেশ অনেক পূর্বেই বিদূরিত হয়েছিল।

(গ) এবম্বিধ বিস্মৃতির উদাহরণ গ্রন্থের অন্যত্রও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকদের মিঠেকড়া ধমক দিয়ে বলেছেন, "পাঠক স্মরণ রাখিবেন...চল্লিশ বৎসর পূর্বেও যুবতীরা কখন দিনমানে স্বামিদর্শন পাইতেন না।" (১।৩) অন্যত্র নিজে সে কথা বিস্মৃত হয়ে সাগর-ব্রজেশ্বরের দিবাসাক্ষাৎ প্রসঙ্গে (২।২) লিখেছেন, "বধূ শ্বশুরবাড়ী আসিলে দিবসে স্বামীর সাক্ষাৎ পাওয়া সেকালে যতটা দুরূহ ছিল পিত্রালয়ে ততটা নয়'।"

'দিনমানে, যুবতীরা কখনই স্বামিদর্শন পেত না, তাহ'লে বলা চলে কি ? উদাহরণ দিয়ে বঙ্কিম এখানে দেখালেন পতিদর্শন পিত্রালয়ে মেয়েরা বিনা কষ্টে

পেতেন। শ্বশুরালয়েও দেখাসাক্ষাৎ একেবারে হ'ত না, এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা বলছেন না। তিনি বলছেন সেটা 'দুরূহ' ছিল মাত্র।

(ঘ) **রসিকতায় প্রাচীনতা**—নারীর সঙ্গে নারীর আলোচনায় প্রাচীন কালে যে ধরণের গ্রাম্য পরিহাস সম্ভব হত তা বর্তমান কালের রুচিতে রসাভাস সৃষ্টি করতে পারে। যথা—

সাগর। কত বড় মেয়ে? আমাদের বয়স হবে?

নয়ন। তোর মার বয়সী!

নয়নতারার ঈর্ষাসূচক কথায় যে হাস্যরসের সৃষ্টি তার আবেদন সেকালে যেমন ছিল একালে তেমন সম্ভব কি?

(ঙ) নিশি ও দেবীর উক্তি-প্রত্যুক্তি ও আচরণের মধ্যে নানা জায়গায় কিছু **পরিকল্পনাগত অসঙ্গতি** লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন স্থলে দেবী চৌধুরাণীকে নিশি 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন, যথা—"এই কি মা তোমার নিষ্কাম ধর্ম?" (২।৯) নিশিকে প্রফুল্ল 'ভগিনী' বলে উল্লেখ করেছেন। যথা, "ভাবিয়াছি ভগিনি" (৩।৪)। আবার কখনও প্রফুল্ল নিশিকে 'মা' বলেছেন। যথা, "আর আভরণে কাজ কি মা?" (৩।১১) নিশি প্রফুল্লকে 'বোন' বলেছে (৩।১০)।

'দেবী চৌধুরাণী' রূপ পরিত্যাগ ও 'নতুন বৌ' রূপে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে শ্বশুরালয়ে গমনের পূর্বে প্রফুল্ল নিশি ও দিবাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলা নিয়েছেন। (৩।১১)

প্রফুল্ল ব্রাহ্মণঘরের বধূ। শ্বশুরালয়ে যাত্রাকালে তাঁর বয়স আঠাশের কিছু বেশী। দেবী চৌধুরাণী রূপে তিনি নিশিকে পরিচারিকা-সখী রূপে পেয়েছিলেন। এ অবস্থায় তাকে প্রণামের পরিকল্পনা কিছুটা বিসদৃশ ঠেকে না কি?

(চ) ভাষাদোষ

এ গ্রন্থের বাংলা ভাষা সর্বাংশে নির্দোষ বলা যায় না। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি দেখুন—

কিন্তু ......তবুও (এক বাক্যগত ; ১।৪)

রূপবতী ও তেজস্বিনী স্ত্রীলোক একজন ('স্ত্রীলোক' শব্দ পুংলিঙ্গ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধীত করাইলেন

প্রায়াগতা (প্রায় আগতা অর্থে)

ক্লুপ্ত তরঙ্গরাজি

স্তম্ভিতের ন্যায় (স্তম্ভের ন্যায় স্তম্ভিত ; স্তম্ভিতের ন্যায়, অর্থ কি ?)

রাত্রি জ্যোৎস্না ('জ্যোৎস্নাময়ী' অর্থে)

অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্র একই চরিত্র বিষয়ে কখনও 'সে' এবং কখনও 'তিনি' সর্বনাম দিয়েছেন, বা গৌরবার্থক ক্রিয়াপদ এবং গৌরবহীন ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। যেমন—

ব্রজেশ্বর দেখিলেন—ব্রজেশ্বর আরও বিস্মিত হইল। (২।৮)

দেবী...ব্রজেশ্বরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রথমে নিশির বুদ্ধিতে দেবী ভ্রমে পড়িয়াছিল। (২।৮)

(ছ) ভাষাদোষ ঃ হিন্দী

এই গ্রন্থে হিন্দী ব্যবহারের বিশেষ সুযোগ ছিল না। ভুল হিন্দীর অজস্র উদাহরণ 'রাজসিংহ' আলোচনা প্রসঙ্গে দেখান হয়েছে। এখানে যে দু-একটি ভুল আছে তা তেমন মারাত্মক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সর্বত্র 'দেবী রাণী কি জয়' শব্দ ব্যবহার করেছেন। "দেবী রাণী কী জয়" লেখা উচিত। কারণ 'জয়' শব্দ হিন্দীতে স্ত্রীলিঙ্গ বলে 'কা' না হ'য়ে 'কী' (স্ত্রিয়ামীপ্) লেখা হয়। আর একটি ভুল হিন্দী ব্যবহারও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। প্রফুল্ল নারীদস্যু দেবী চৌধুরাণীরূপে সাগরের পিত্রালয়ে গিয়ে সহসা আবির্ভাবে পরিচারিকাকে সন্ত্রস্ত করে দিয়েছেন। এই সন্ত্রাস আরও গভীর ক'রে তোলার জন্য বাঙ্গালী প্রফুল্ল পরিচারিকাকে হিন্দীতে ধমক দিয়েছেন, 'খাড়া রহো' (২।৩)। দৃশ্যটি সুন্দর, কিন্তু শুদ্ধ হিন্দীতে পরিচারিকাকে 'খাড়া রহো' বলা যায় না। 'নেহি' (নহীঁ) শব্দটির বানানও স্মরণযোগ্য।

পাঠক-সম্বোধন

পাঠক-সম্বোধনের বিবর্তনে আমরা দেখিয়েছি বঙ্কিমচন্দ্র কি ভাবে ঔপন্যাসিক জীবনের প্রারম্ভে পুরুষ পাঠককে 'আপনি' বলে সুরু করেছেন। 'আপনি' 'তুমি'তে রূপান্তরিত হয়েছে। নারী পাঠিকার সঙ্গে কথোপকথন সুরু ক'রে পরিহাস পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন বঙ্গের অন্তঃপুরে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠা প্রসারের সঙ্গে, তাও আমরা দেখিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ 'রাজসিংহ' আলোচনা প্রসঙ্গে মাণিকলাল-নির্মলকুমারীর কোর্টশিপ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কি ভাবে পাঠককে ধমক দিয়েছেন তা দেখিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ বিষয়ে

রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন। এই সংস্করণ 'দেবী চৌধুরাণী'র পরবর্তী। 'দেবী চৌধুরাণী'র পূর্ববর্তী 'রাজসিংহ'-গ্রন্থে (প্রথম-তৃতীয় সংস্করণে) মাণিকলাল-নির্মল-কুমারীর কোর্টশিপের ঘটনাটিও ছিল না এবং এ প্রসঙ্গে ধমকের কোন সুযোগ ছিল না।

বিশেষ ক'রে নব্য পাঠক এবং নব্যা পাঠিকাকে, বঙ্কিমচন্দ্রের মিঠেকড়া ধমক বা সমালোচনার লক্ষ্য রূপে 'দেবীচৌধুরাণী' গ্রন্থে দেখি। নব্যা পাঠিকারা দিবাভাগে স্বামিসন্দর্শন করেন বলে তিনি কটাক্ষ করেছেন। নব্য পাঠকদের লক্ষ্য করে বলেছেন, 'এখন অশিক্ষিত ছেলেরাও বাপের কাছে লম্বা লম্বা স্পীচ ঝাড়ে।' (ক) এই গ্রন্থে কখনও বঙ্কিমচন্দ্র নিজে প্রাচীন পাঠিকাকে উদ্দেশ করেছেন। (খ) কখনও বয়স্ক ব্যক্তির মত বিনা সম্বোধনে স্বয়ং কথা বলেছেন। (গ) কখনও নব্য পাঠককে নিয়ে পরিহাস করেছেন। (ঘ) কখনও পাঠকের বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বিষয়ে কটাক্ষ ক'রে কাহিনী বর্ণনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখান হল :—

(ক) 'আমরা প্রাচীনা পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করি কথাটা কি রকমে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল।' (১৷৬)

(খ) 'যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে সে দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখনও অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল—কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি।'

(গ) 'গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই—কিন্তু ভরসা করি, মার্জিতরুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।' (১৷৬)

(ঘ) 'ব্রজেশ্বর যেরূপ লোক, পাঠক এতক্ষণে বুঝিয়াছেন বোধহয়।' (২৷৫)

'পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।' (৩৷১১)

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সীতারাম

॥ ১ ॥ অনুশীলনতত্ত্ব : সমষ্টি ও ব্যষ্টির সমন্বয়

বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারের কল' হিসেবে 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে যথাক্রমে সমষ্টির এবং ব্যষ্টির অনুশীলন তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। এবার তিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমন্বয় প্রসঙ্গে শেষ কথা বলার জন্য 'সীতারাম' গ্রন্থে আখ্যায়িকার পূর্বে গীতার নিষ্কাম সাধনা বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং কাহিনীর পরিশেষে (প্রথম সংস্করণে) তিনি জয়ন্তীকে আদর্শ রূপে স্থাপন করে সাহিত্যক্ষেত্র হতে বিদায় নিয়েছেন। 'সীতারাম' উপন্যাসের মধ্যে অনুশীলন তত্ত্বের যে রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে দেখা যায় নিষ্কাম সাধনা যখন মিথ্যা অভিমানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন তা অকর্তব্যের দিকে মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। আবার সকাম সাধনা যখন অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় চিত্তের উপর বাসনার জয়ধ্বজাকে উর্ধ্বে প্রসারিত করে তখন কাম হ'তে ক্রোধ, ক্রোধ হ'তে বুদ্ধিভ্রংশ এবং বুদ্ধিভ্রংশ হ'তে মৃত্যু আসে। 'সীতারাম' গ্রন্থে শ্রী জয়ন্তীর পরিচালনায় যে নিষ্কাম সাধনাব্রতে অগ্রসর হয়েছিলেন তা অত্যধিক অভিমানের দ্বারা অভিভূত হয়ে অকর্ম রূপ পরিগ্রহ করেছে। সন্ন্যাসিনীর সান্নিধ্যে তিনি যে সাধনা এবং ব্রত গ্রহণ করেছেন তাতে তাঁর মধ্যে বিশ্বের কল্যাণকামনা জাগ্রত হয়েছে বটে, আত্মসুখ-ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়েছে বটে, কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে যা অনুচিত—স্বামীর প্রতি একটি ঔদাসীন্য—তার চিত্তকে অধিকার করেছে। ইন্দ্রিয়ের বশ্যতা হতে মুক্তি এক জিনিস এবং দাম্পত্য জীবনে ইন্দ্রিয়চর্চার প্রয়োজন আর এক জিনিস। তিনি সীতারামের কল্যাণকামনা করেছেন বহুদূরবর্তী সন্ন্যাসিনীর ন্যায়। নিকটবর্তী স্ত্রীর ন্যায় তিনি তার কর্তব্য করেন না। নিষ্কাম সাধনার অভিমান, সন্ন্যাসিনীর আদর্শ, স্বাভাবিক যৌন আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করেছে। তিনি দেহকে বাদ দিয়ে সাধনা করেছেন। স্বামীর দৈহিক ক্ষুধার অন্ন স্বামীর মুখের কাছে রেখে তাঁকে কিছুতেই গ্রহণ করতে দেন নি। শ্রীর পক্ষে এটি স্ত্রীর 'অকর্ম' হয়েছে। তৃতীয় খণ্ড সপ্তম পরিচ্ছেদে সীতারাম শ্রীকে সম্রাজ্ঞী করতে চেয়েছেন। শ্রী রাজী হন নি। অথচ বেদনির্দিষ্ট বিবাহে স্বামী

স্ত্রীকে বলেন, "তুমি শ্বশুরের উপর সম্রাজ্ঞী হও, শশ্রূর উপর সম্রাজ্ঞী হও। ননদ এবং দেবরের উপর সম্রাজ্ঞী হও। প্রজাপতি আমাদের পুত্রদান করুন। অযমা আমাদের দিবারাত্রি মিলিত রাখুন।" রাজা সীতারাম স্ত্রীকে মহিষী করতে চেয়েছেন, শ্রী প্রত্যাখ্যান করেছেন। ব্রজেশ্বর আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রফুল্লকে 'ঘরের ঘরণী' হবার জন্য এবং সে আহ্বানে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে স্ত্রীর কর্তব্যের দিক্‌নির্দেশ করেছিলেন। শ্রীর বিচারে 'স্বামী-সহবাস স্ত্রীর নিকট ধর্মভ্রংশ।' এই অশাস্ত্রোচিত আদর্শকে পর্যুদস্ত করতে চেয়েছিলেন সীতারাম। শ্রী আরও জানিয়েছেন, "ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি। পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্মার্থেই বিবাহ।···ইন্দ্রিয়বশ্যতা মাত্রই পাপ।" শ্রী শাস্ত্র পড়েন নি। মনগড়া মতকে শাস্ত্র বলেছেন। বেদনির্দিষ্ট বিবাহে স্বামী ও স্ত্রী কেবল 'তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হোক' বলেন না। পরিপূর্ণ দৈহিক মিলনের চুক্তিও করেন। বেদধৃত বিবাহকালে স্বামী স্ত্রীকে বলেন, ('যা ন ঊরু উশতি বিশ্রয়তে যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেপম্।' ৩৭। 'আরোহ উরুম্ উপধৎস্ব হস্তং পরিষ্বজস্ব জায়াং সুমনস্যমানঃ। প্রজাং কৃণ্বাথামিহ মোদমানৌ।' ঋ.১০।৮৫; অথর্ববেদ ১০।২।৩৯।

শ্রী দেহকে বাদ দিয়ে আত্মার সাধনা করেছেন এবং স্বামীর ক্ষুধার অন্ন স্বামীর মুখের কাছে রেখে কিছুতেই গ্রহণ করতে দেন নি। শ্রীর পক্ষে এটি স্ত্রীর অকর্ম হয়েছে। কামনার আত্যন্তিকতা অনির্বাণ আগুনের মত সীতারামকে দুষ্কর্মের পথে পরিচালিত করেছে এবং সেই 'দুষ্কর্ম' সকলের অকল্যাণের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি মার্গের সমন্বয়ের অভাব কেমন করে পুরুষ ও নারীর জীবনে ব্যর্থতা সৃষ্টি করে তার একটি চমৎকার চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারাম' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। পূর্বে অনুশীলন তত্ত্বের মাধ্যম হিসেবে 'আনন্দমঠ'-এর সন্তান সম্প্রদায়, শান্তি ও প্রফুল্লকে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সামনে এনেছেন। 'আনন্দমঠ'-এর সন্তান দেশ ও দশের দিকে তাকিয়ে কেবল শক্তির উপাসনা করেছেন, শান্তির উপাসনা করেন নি। প্রফুল্ল দেশ ও দশের শান্তি চেয়েছেন কিন্তু তাঁর শেষ কর্মক্ষেত্র একটি পরিবারে গিয়ে শেষ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি জনজীবন হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। সীতারামের জীবন কেবল আপন পরিবারের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ নহে। তিনি কেবল পরিবারের কেন্দ্রস্থলে নহেন, পরন্তু দেশের নায়ক, হিন্দুর ধর্মের রক্ষক। তাঁর জীবনে সুখ-দুঃখের তরঙ্গাভিঘাত কেবল

তাঁর ব্যক্তিজীবনকে বিধ্বস্ত করে না, দেশ ও দশকে বিপর্যস্ত করে। সীতারামের জীবন যদি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কামনার দ্বারা, কামনা যদি ক্রোধের রূপ পরিগ্রহ করে, তাহলে তাঁর দুর্দমনীয় কার্য দুর্দান্ত দুষ্কর্মের রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর পরিবার, দেশ, ধর্ম সকল কিছুকে চুরমার করে দিয়ে চলে যাবে। তাঁর প্রবৃত্তির প্রবলতা যদি নিষ্কাম সাধনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত তাহলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে কল্যাণ হ'ত। সীতারামের 'দুষ্কর্ম' কেমন করে ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে আঘাত করল তা 'সীতারাম' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র চমৎকার করে দেখিয়েছেন। আর দেখিয়ে দিয়েছেন শ্রীর 'অকর্ম'—পত্নী হিসেবে পতির প্রতি কর্তব্যকর্মে ঔদাসীন্য—কেমন করে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনকে বিপযস্ত করে।

অনুশীলন তত্ত্বের আর একটা দিকের প্রতি আকষণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। সন্তানসঙ্ঘবর্তী শান্তি জীবানন্দ হতে পৃথক্ আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর ব্রহ্মচর্যপালন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। কারণ দেশ ও দশের কল্যাণে স্বামী জীবানন্দ তা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যদিও দক্ষিণদেশাগত মলয় বাতাস এই নিকটস্থ বিরহীদের মধ্যে যৌবনচাঞ্চল্যের ক্ষণিক আবেগ এনে দিয়েছে, তবু পারস্পরিক আত্মিক সংযোগের দ্বারা দৈহিক মিলনে অস্বীকৃতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে ব্রহ্মচর্য-পালন স্বামী ও স্ত্রীর স্বেচ্ছাকৃত আত্মনিগ্রহ। শান্তি সহধর্মিণী হয়েছেন মাত্র। প্রফুল্লের নিষ্কাম সাধনায় ব্রজেশ্বর যে দৈহিক মিলনের উপক্রমণিকা করেছেন (চুম্বন এবং আলিঙ্গনের দ্বারা) তা প্রফুল্ল ঔদাসীন্যের সঙ্গে সরিয়ে দেন নি। একটি সুন্দর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে তিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে মিলনের রাখীবন্ধন করেছেন। 'আনন্দমঠ'-এ শান্তির জীবনের শেষ অধ্যায় গার্হস্থ্য আশ্রম হতে অনেক দূরবর্তী সাধনার ক্ষেত্র হয়েছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শকে সবত্র অনুসরণযোগ্য বলেন নি। 'দেবী চৌধুরাণী'র মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমকেই স্ত্রীর সকল কর্তব্যের শেষ সীমা বলে ইঙ্গিত করেছেন। নিবৃত্তি কেমন করে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং জীবনকে সার্থক করে তোলে, সংসারকে প্রফুল্লময় করে তোলে তার চিত্র তিনি এখানে দিয়েছেন। কিন্তু প্রফুল্লের বা শান্তির মধ্যে আমরা সন্ন্যাসের উল্লেখ পাই, সন্ন্যাসিনীকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি না। শ্রীর মধ্যে আমরা সন্ন্যাসিনীই কেবল প্রত্যক্ষ করি, গৃহিণীকে কোথাও খুঁজে পাই না। তাই প্রফুল্ল যেমন পরিপূর্ণ, শ্রী তেমনি অসম্পূর্ণ আদর্শের দ্বারা, অকর্তব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বঙ্কিমচন্দ্র নারীর সন্ন্যাসিনী রূপ

জয়ন্তীর মধ্যে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা কোন অকর্ম বা দুষ্কর্মের দ্বারা পরিচিহ্নিত নয়। আমরা সন্ন্যাসীর গৃহীজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। জয়ন্তী শৈশবে এবং কৈশোরে কোন গৃহপ্রাঙ্গণকে আনন্দ কলরবে উচ্ছ্বসিত করে রেখেছিলেন, ভ্রাতা-ভগ্নী-পিতামাতার আহ্লাদ এবং আশঙ্কার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিলেন, তা আমরা জানি না। যখন তিনি আমাদের সামনে এসে দেখা দিলেন তখন হতেই যেন তাঁর জীবনের শুরু। বৃন্তহীন পুষ্পের মত তাঁর পূর্বাশ্রমহীন অপরিম্লান সন্ন্যাস জীবন। তাঁর পূর্বে কোন গৃহজীবন নেই পরেও (প্রফুল্লের মত) গৃহীজীবন তাঁকে সংসার কেন্দ্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নি। পরিবার হতে দূরবর্তী জনসমষ্টির কল্যাণকেন্দ্রে তাঁর নিঃশঙ্ক ও নিসঙ্গ পাদচারণ বিশ্বপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তা আত্মসুখের দ্বারা আবিল নয়। তাই গ্রন্থ-শেষে বঙ্কিমচন্দ্র এই জয়ন্তী প্রসঙ্গে বলেছেন, "পাঠকেরা সীতারামের 'দুষ্কর্ম' এবং শ্রীর 'অকর্ম' হইতে বিরত হইয়া জয়ন্তীর কর্মানুকারী হউন। এখন, যাও জয়ন্তী! প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী। দুইজনে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণ কর।"

বঙ্কিমচন্দ্র পতিপত্নীর অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ বিষয়েও আদর্শবাদ প্রচার করেছেন। আনন্দমঠের সন্তানগণ দেশের কল্যাণের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে গিয়ে আপন পিতামাতা হতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁরা পারিবারিক কর্তব্য করতে পারেন নি। 'দেবী চৌধুরাণী'র ব্রজেশ্বর পিতাকে স্বর্গ ধর্ম এবং পরম তপ বলে মনে করেছেন এবং পিতার সেবার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর জীবন সার্থক করতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে তাঁর পিতা এত বড় যে তিনি সমস্ত বিশ্বকে আড়াল করে রেখেছেন। সমাজের কল্যাণ কামনা তাঁর চিত্তকে বিন্দুমাত্র চঞ্চল করে তোলে নি। নিরপরাধ পত্নী ত্যাগও পিতার নির্দেশে তিনি কর্তব্য কর্ম বলে মেনে নিয়েছেন। ব্রজেশ্বরের নির্বিচার পিতৃভক্তি দুষ্কর্ম ও অপকর্মের দ্বারা তাঁর জীবনকে পরিচিহ্নিত করেছে। 'সীতারাম' গ্রন্থের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে সমন্বয় সাধন করেছেন। 'আনন্দমঠ'-এর সন্তানরা পিতাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন দেশের জন্য। ব্রজেশ্বর দেশকে অগ্রাহ্য করেছিলেন পিতার জন্য। সীতারাম ব্রজেশ্বরের মতই প্রথমা পত্নী শ্রীকে পিতার আদেশে পরিত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু সে আদেশে হরবল্লভের আদেশের নীচতা ছিল না। সীতারামের পিতা দৈবজ্ঞের নির্দেশ-

ক্রমে পুত্রের কল্যাণ কামনায় সীতারাম ও শ্রীকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। সীতারাম শ্রীকে কেবল এই কথা বলেন নি, তিনি আরও বলেছেন যে পিতার আজ্ঞা পালনীয় হলেও তা বিচার্য। পিতামাতা যদি অন্যায় পথে প্রবর্তিত করান, তবে পুত্র সে আজ্ঞা অগ্রাহ্য করবে। (১) ব্রজেশ্বর নির্বীয পিতৃভক্তির দ্বারা 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম'কে অগ্রাহ্য আদর্শ রূপে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। সীতারাম পিতার আদর্শকে সর্বত্র গ্রাহ্য না করার কথা বলে পিতৃভক্তিকে আমাদের কাছে একটি আচরণীয় আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তবুও বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম ও শ্রী অনুশীলনতত্ত্বের আদর্শভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকার চিত্র। সীতারামকে ধর্মক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করতে পারতেন শ্রী, কিন্তু তিনি কেবল তার কামনা প্রজ্বালিত ক'রে দূর থেকে মিষ্টি হাসিব ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছেন। তাঁরই 'অকর্তব্য' বা 'অকর্ম' সীতারামকে বিপথে পরিচালিত ক'রে সমস্ত সংসার, সমাজ, রাজ্যে আগুনের প্রলয়শিখা ছড়িয়ে দিয়েছে। (২) সীতারাম ধর্মের পথ হ'তে অধর্মের পথে, অন্যায়ের পথে গিয়েছেন। এটি তাঁর 'দুষ্কর্ম'। তাই প্রথম সংস্করণে গ্রন্থ-পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "প্রার্থনা করি যে, পাঠকেরা সীতারামের দুষ্কর্ম এবং শ্রীর অকর্ম হইতে বিরত হইয়া জয়ন্তীর কর্মানুকারী হউন। এখন যাও জয়ন্তী। প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী। দুইজনে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণ কর।"

পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র এই অংশ বাদ দিয়েছেন। কিন্তু জয়ন্তী কি সত্যই আদর্শ চরিত্র? না, প্রফুল্লই সম্পূর্ণ সার্থক চরিত্র? প্রফুল্ল ও জয়ন্তী চরিত্র বিষয়ে আমরা পূর্বগ্রন্থের 'চরিত্রচিত্রণ' অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। সেখানে

---

(১) "পিতার আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়—তিনি যখন আছেন, তখনও পালনীয়—তিনি যখন স্বর্গে, তখনও পালনীয়। কিন্তু পিতা যদি অধর্ম করিতে বলেন, তবে কি পালনীয়? পিতামাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম করা যায় না—কেন না, যিনি পিতামাতার পিতামাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়। বিনাপরাধে স্ত্রী ত্যাগ ঘোরতর অধর্ম—অতএব আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম করিতেছি—শীঘ্রই আমি তোমাকে একথা জানাইতাম।"

(২) পূর্ববর্তী অনেক উপন্যাসেই নায়ক নায়িকা চরিত্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মীদেবীর যোগের কথা আমরা ইঙ্গিত করেছি যথাস্থানে। 'সীতারাম' প্রথম সংস্করণ রচনা-কালে বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ৫০ এবং রাজলক্ষ্মীদেবীর বয়স ৪০এর উপরে। যে বয়সে পুরুষের প্রবল বাসনা, নারীর দৈহিক পরিবর্তনজনিত ঔদাসীন্যের দ্বারা চিত্তবিক্ষোভের সৃষ্টি করে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রাজলক্ষ্মীদেবী তারই দ্বারপ্রান্তে।

আমরা আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করেছি। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, বঙ্কিম দুটি নারীকে নারীজাতির আদর্শ রূপে এনেছেন। কিন্তু পুরুষের পক্ষে আদর্শ কোথায়? তার সামনে উদাহরণ কোথায়?

॥ ২ ॥ কাহিনীর ঐতিহাসিকতা : বাঙ্গালীর শৌর্য

বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাস রচনার দ্বারা হিন্দুর শৌর্যবীর্যের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর গর্ব ও গৌরবের বিষয় রাজসিংহ নন। মানসিংহ পুত্র জগৎসিংহ, মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্র বা রাজসিংহের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন. তাতে যবনসমরে অবাঙ্গালী হিন্দুর গৌরবের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনে গর্ব এবং গৌরবের কি কিছুই নেই? ভেতো বাঙ্গালীর কলঙ্ক-কালিমা দূরীভূত করার জন্য তিনি ইতিহাসে বিশেষ গবেষণা শুরু করেছিলেন। প্রচারের যুগে তিনি "বাঙ্গালীর ইতিহাস" ও "বাঙ্গালীর গৌরব" আবিষ্কারের জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন। নিবন্ধের মধ্যে তিনি "বাঙ্গালার কলঙ্ক মোচন" করার চেষ্টা করছিলেন। উপন্যাসের মধ্যে এ বিষয়ে তিনি 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' রচনায় অগ্রসর হলেন। বাংলায় যে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ হয় তার স্থান উত্তরবঙ্গ হলেও তার পাত্র বাঙ্গালী ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র জোর করে সন্ন্যাসীদের বাঙ্গালী সন্তান করেছেন। সাত কোটি বাঙ্গালীর মাতৃ-বন্দনার যে গান তিনি রচনা করেছেন, তাতে আমাদের মাতৃভূমি যে শক্তিশালী সন্তানের জন্মভূমি সে বিষয়ে একটি ভাবমোহ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বাঙালীর শৌর্য-বীর্যের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তিনি তখনও উপস্থাপিত করতে পারেন নি। 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের দেবী চৌধুরাণী ও ভবানী পাঠক এই দুটি ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়েও বাঙ্গালীর গৌরবের বিশেষ কিছুই নেই। কারণ প্রথমতঃ তাঁরা অবাঙ্গালী। দ্বিতীয়তঃ তারা দস্যু। 'সীতারাম' গ্রন্থ রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের পৃষ্ঠা হ'তে এমন একটি বাঙ্গালীকে ফুটিয়ে তুলেছেন যিনি তাঁর আদর্শবাদ প্রচারের যোগ্য স্থল। 'সীতারাম' রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র ভেবেছিলেন :—"সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুঁসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্ধ করে নাই। ভিন্ন দেশীয় মাত্রেরই

বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্ন জাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এই বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এমন দুর্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে বাঙ্গালী চিরকাল এই চরিত্র, চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।”.........“বাঙ্গালী যে পূর্বকালে বহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাই।” রাজা সীতারাম বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রমাণ। এখানে একটি কথা বিশেষ করে স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রচারের যে-সংখ্যায় ‘বাঙ্গালার কলঙ্ক’ নিবন্ধের উল্লিখিত অংশ প্রকাশিত হয় সেই সংখ্যাতেই (শ্রাবণ—১২৯১) ‘সীতারাম’ উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রথম প্রকাশিত হ’তে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের ইতিহাসের জন্য প্রধানতঃ দুটি গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছিলেন। একটি Stewart-এর “History of Bengal”, অপরটি Westland সাহেবের “A Report of the District of Jessore.”

স্টুয়ার্ট-বর্ণিত সীতারাম

ভূষণার ফৌজদার ছিলেন সৈয়দ আবু তোরাব। নিকটে সীতারামের জমিদারী। সীতারামের অধীনে একদল ডাকাত থাকে। ডাকাত অনুচরদের সাহায্যে তিনি রাহাজানি করেন এবং নৌকার উপর চড়াও হন। গ্রাম হ’তে গরু বাছুর নিয়ে কখনও পলায়ন করেন। জনগণের অনিষ্টকারী এই দস্যুসর্দার সীতারামকে দমন করার জন্য নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন তোরাব, কিন্তু সে সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হন না। অবশেষে ফৌজদার নবাবের নিকট সাহায্য না পেয়ে পীর খাঁ নামক এক আফগান সেনাপতিকে দুইশত সশস্ত্র সৈনিক সমেত সীতারামকে ধরার জন্য প্রেরণ করেন। এই খবর পেয়ে সীতারাম দেশের অন্যত্র গমন করেন। সেখানে ছোট একটি দল নিয়ে ফৌজদার নিজে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সীতারামের অনুপস্থিতিতে তাঁর দল তোরাবের উপর চড়াও হয় এবং তোরাবকে হত্যা করে। সীতারাম যখন দেখেন যে ফৌজদার নিহত হয়েছেন তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। কারণ নবাব এই সংবাদে সীতারামের উপর আক্রমণ

করবেন। সীতারামের মহম্মদাবাদ পরগণা ধ্বংস করে দেবেন। সীতারাম শ্রদ্ধা সহকারে তোরাবের মৃতদেহ তাঁর অনুচরদের হস্তে সমর্পণ করেন। তোরাবের অনুচরেরা সেই মৃতদেহ সম্মান সহকারে ভূষণায় নিয়ে গিয়ে সহরের প্রান্তে কবরস্থ করেন। নবাব যখন আবু তোরাবের মৃত্যুসংবাদ পান তখন তিনি বক্সী আলি খাঁকে তোরাবের স্থলে নিযুক্ত করে সীতারামকে সদলবলে ধরার নির্দেশ দেন। সীতারাম তাঁর স্ত্রী-পুত্র এবং দস্যুদল সমভিব্যাহারে ধৃত হন। তাঁদের শৃঙ্খলিত অবস্থায় মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। সীতারাম ও দস্যুদের জীবন্ত প্রোথিত করা হয়। স্ত্রীপুত্রদের দাসদাসীতে রূপান্তরিত করা হয়।

Stewart-বর্ণিত কাহিনী ইতিহাসের বিকৃতি মাত্র।

Westland-এর কাহিনীটি এইরূপ :—ভূষণার জমিদারী উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা অন্য কোন উপায়ে রাজা সীতারাম রায় প্রাপ্ত হন। চৌদ্দ বৎসর ধরে তিনি জমিদারী রক্ষণ করেন, বহু অট্টালিকা সরোবরে সুশোভিত করে মহম্মদপুরকে রাজধানী করেন। তাঁর পূর্বে মহম্মদপুরের কোন অস্তিত্ব ছিল না।......সীতারামের উদ্ভব সম্বন্ধে একাধিক কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রথম কাহিনীটি এইরূপ। মধুমতী নদীর অপর পারে হরিহরনগর নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে সীতারামের তালুক ছিল। বর্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্তী শ্যামনগরে সীতারামের জমা ছিল। একদিন তিনি অশ্বারোহণে হরিহরনগর হতে জমার দিকে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর ঘোড়ার পা কাদায় আটকে যায়। ঘোড়ার পা কাদা হ'তে তুলতে না পারায় সেখানকার মাটি খোঁড়ার ব্যবস্থা করা হয়। খুঁড়তে খুঁড়তে একটি মন্দিরের মাথার ত্রিশূল এবং মন্দিরের লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ পাওয়া যায়। লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সীতারাম নিজেকে 'দেবকুলপ্রিয়' বলে উল্লেখ করেন। অবিলম্বে অনেকে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেন। সীতারাম নিজে উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। এখন নানা দিক হ'তে উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ তাঁর চতুর্দিকে এসে হাজির হন। অপরিসীম শক্তিশালী মেনাহাতি (হাতির মত শক্তিশালী মেনা বা মৃন্ময়) তাঁর প্রধান সেনাপতি হন। সীতারাম তাঁর ক্ষুদ্র সৈন্যদলের সাহায্যে ভূষণার জমিদারী অধিকার করেন। চারিদিক দৃঢ়ভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। নবাবকে কর দিতে অস্বীকার করেন।......

ওয়েস্টল্যাণ্ড মনে করেন, "উদ্ধৃত ঘটনা আসল ঘটনার অলংকৃত রূপ মাত্র। আসল ঘটনাটি হ'ল, তখনকার দিনে ব্রাংলাদেশের এই অংশ বারোটি প্রদেশে

বিভক্ত ছিল। এই বারোটি প্রদেশের রাজারা করদানের বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করায় দিল্লীর বাদশাহ সীতারামকে ক্ষুদ্র সৈন্যদলের অধিকর্তা করে এই বিষয়ে তদারকির ভার দেন। সীতারাম তাঁর কায এরূপভাবে সম্পন্ন করেন যে এই বারো রাজা কেবল উৎখাত হন না, সীতারাম নিজেকে সকলের ভূখণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন। নবাব সীতারামের নিকট কর চান। কিন্তু সীতারাম তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। নবাব সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সীতারাম মহম্মদপুরকে সুরক্ষিত করে অনেক সৈন্য এবং অনুচরের দ্বারা মহম্মদপুর রক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে মেনাহাতির নাম উল্লেখযোগ্য। নবাব যুদ্ধে সফল না হ'য়ে জামাতা আবু তোরাবকে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। দুর্ধর্ষ মেনাহাতি যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং আবু তোরাবকে স্বহস্তে হত্যা করেন। নবাব এইবার অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে বিখ্যাত সেনাপতি সিংহরাম শাকে প্রেরণ করেন। মেনাহাতি ধৃত হয় এবং তাঁর মৃত্যু ঘটে। সীতারাম মেনাহাতির মৃত্যুতে ভগ্নহৃদয়ে আত্মসমর্পণ করেন অথবা খুব সম্ভবতঃ বন্দী অবস্থায় নবাবের নিকট নীত হন। নবাব তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করেন। বন্দী অবস্থায় বিষপূর্ণ অঙ্গুরীয়কের সাহায্যে সীতারাম আত্মহত্যা করেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীতে শ্যামনগর গ্রাম শ্যামপুর নামে উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। পরবর্তী কালে এই গ্রাম সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুরে রূপান্তরিত হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে মেনাহাতির হস্তে তোরাবের মৃত্যুর উল্লেখ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করেন নি। তিনি উপন্যাসের শেষদৃশ্যে অস্ত্রের সাহায্যে পথ রচনা করে বেরিয়ে পড়েছেন। অতঃপর শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদের কথোপকথনে সীতারামের জীবনের বিষণ্ণ পরিণতি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের যে তিন বিবাহের উল্লেখ করেছেন তা 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' লেখক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র মোটামুটি সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন—সীতারামের তিনটি বিবাহের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রবাদ ঠিক রাখিয়া তাঁহার তিন মহিষীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অতি অল্প বয়সে সীতারামের সহিত ভূষণার অন্তর্গত ইদিলপুর-নিবাসী এক মৌলিক কায়স্থের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। এ পত্নীর কোন সন্তানাদি হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহাকেই বঙ্কিমচন্দ্র "শ্রী" নামে কীর্তিত করিয়া

তাঁহার উপন্যাসের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন। সীতারাম নল্‌দী পরগণা জায়গীর পাওয়ার পর অকস্মাৎ তাঁহাদের অবস্থা উন্নত হইয়া পড়ে। তখন তিনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত দাস-পল্‌শা গ্রামে সৌকালীন গোত্রীয় প্রসিদ্ধ কুলীন সরল খাঁ ঘোষের কন্যা কমলাকে বিবাহ করেন।...কমলাকে বঙ্কিমচন্দ্রের নন্দা বলা যাইতে পারে। সীতারাম তৃতীয়বার বর্ধমানের অন্তর্গত পাটলীগ্রামে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর নাম বা অন্য পরিচয় জানা যায় নাই।...এই তিন বিবাহ ব্যতীত সীতারামের অন্য বিবাহ হইয়াছিল কিনা, ঠিক জানা যায় না; সম্ভবতঃ হইয়াছিল, কারণ বারপুর গ্রামে তাঁহার নওয়ারাণীর বাটীর উল্লেখ আছে। যাহা হউক, এ সব বিবাহ উল্লেখযোগ্য নহে......।

যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৩৭-৩৮ পৃঃ।

সীতারামের পতনের সঙ্গে চারিত্রিক দুষ্কর্মের যোগ ইতিহাস মতে অনেকখানি সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসেব জীর্ণকঙ্কালে রক্ত, মাংস, লাবণ্য ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

॥ ৩ ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ

বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক গ্রন্থে যেভাবে মুসলমান নরনারীর চিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে একথা অনেকের মনে জেগেছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধী ছিলেন। পক্ষান্তরে অনেক বিদগ্ধ সমালোচক, তাঁদের মধ্যে রেজাউল করিমের ন্যায় চিন্তাশীল ব্যক্তি অন্যতম, বিচার বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা যায় না। 'সীতারাম' উপন্যাসের সূচনায় শাহ সাহেবের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার চিত্র আছে। ইতিহাসের আলোচনা করে আচার্য যদুনাথ দেখিয়েছেন মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকে সেদিন দুঃশাসনবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সত্য ইতিহাসের একটি চিত্র এখানে দিয়েছেন মাত্র।...সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা যায় না। কারণ তিনি আর একজন উদার, সমদর্শী, মানবপ্রেমিক মুসলমান (চাঁদশাহ) ফকিরের চিত্রও একই গ্রন্থে উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত করেছেন। হিন্দু-মুসলমানের নমস্য এই ধরণের বিশুদ্ধ মানুষের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কি পরিমাণ শ্রদ্ধা ছিল তা বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রথম খণ্ড ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায়। (পরবর্তী সংস্করণে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদটি মুদ্রিত গ্রন্থ হ'তে বর্জন করা

হয়েছে।) সেই পরিচ্ছেদ হ'তে ফকির ও সীতারামের কথোপকথনের নিম্নলিখিত কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

*　　*　　*　　*

সীতারাম সবিস্ময়ে দেখিলেন যে মন্দিরদ্বারে দেবমূর্তিসমীপে একজন মুসলমান বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে বাবা তুমি ?'

মুসলমান বলিল, "আমি ফকির।"

সীতারাম। মুসলমান ?

ফকির। মুসলমান বটে।

সীতা। আ সর্বনাশ !

ফকির। তুমি এত বড় জমিদার, হঠাৎ তোমার সর্বনাশ কিসে হ'ল ?

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতরে মুসলমান !

ফকির। দোষ কি বাবা ! ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইল ?... ..আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

সীতা। ইনিই—যিনি জগদীশ্বর, তিনি সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই—কেবল মুসলমান ইহার মন্দিরদ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইবেন ! এই বুদ্ধিতে বাবা তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ ? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা ? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন ? না, আর থাকিবার স্থান আছে ?

সীতা। ইনি সর্বব্যাপী ; সর্বঘটে সর্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন ?

সীতা। অবশ্য—তোমরা মান না কেন ?

ফকির। বাবা ! ইনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন না—আমি উঁহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম, ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন ?

একটি স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ থাকিলে ইহার যথাশাস্ত্র একটি উত্তর দিতে পারিত—কিন্তু সীতারাম স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক নহেন, কথাটার কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন। কেবল বলিলেন, "এইরূপ আমাদের দেশাচার।"

ফকির বলিল, "বাবা! শুনিতে পাই, তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু-মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু-মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই এক জনই হিন্দু-মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; যাহাকে হিন্দু করিয়াছেন, তিনিই করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান, উভয়েই তোমার প্রজা হইবে। অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতা। মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে না কি ?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমান রাজ্য ছারখার হইয়া যাইতেছে। সেই পাপে মুসলমান রাজ্য যাইবে ; তুমি রাজ্য লইতে পার ভালই নইলে অন্যে লইবে। আর যখন তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর হিন্দুতে আছেন, মুসলমানেও আছেন, তখন তুমি কেন প্রভেদ করিবে ? আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রভেদ করিনা।...

বিদায় কালে সীতারাম বলিলেন, "আপনি যে সকল উপদেশ দিলেন তাহা অতি ন্যায্য। আমার সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিব। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, আমার নূতন রাজধানীতে আপনি বাস করেন। আমি এ উপদেশের বিপরীতাচরণ করিলে, আপনি নিকটে থাকিলে আমাকে সে সকল কথা আবার মনে করিয়া দিতে পারিবেন। আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি আমার নিকট থাকিলে, আমার রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হইবে।"

*　　*　　*　　*

বঙ্কিমচন্দ্রের মনে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব যে ছিল না উদ্ধৃতাংশ হ'তে তার চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'সীতারাম' গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদার চরিত্র চাঁদশাহ ফকির, মুসলমান। 'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থে সতী নারীর আদর্শ চরিত্র দলনী, মুসলমান। 'রাজসিংহ' গ্রন্থে অকপট প্রেমের উজ্জ্বল চিত্র মবারক, মুসলমান। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত অতীত যুগের শক্তিবিহীন আসক্তিসর্বস্ব শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সন্তানদের ধূমায়িত অসন্তোষের চিত্র অঙ্কন করেছেন। সেখানে সাম্প্রদায়িকতা

প্রচার তাঁর উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য সে-চিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে যে-সমস্ত বিশেষণে বিভূষিত করেছেন, তা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবনে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। 'আনন্দমঠ'ই যদি বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ রচনা হ'ত তাহ'লে সে প্রতিক্রিয়া হয়ত খুব তীব্র হ'তে পারত। কিন্তু তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'সীতারাম'-এ বঙ্কিমচন্দ্র সন্দেহের নিরসন করেছেন।

॥ ৪ ॥ অদৃষ্টবাদ ও যোগবল

অদৃষ্টে বিশ্বাসপ্রবণতা মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। গ্রীক নাটকের ক্ষেত্রে ঈস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরীপীডিস এ বিষয়ে বেদনাবিহ্বল মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' এ বিষয়ের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এ বিষয়ের ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। কর্ণের কাহিনী, কৃষ্ণের লীলা—সকল কিছুর সঙ্গেই অদৃষ্টের নিবিড় যোগ। বাংলার মঙ্গলকাব্য প্রাগাধুনিক বাঙ্গালীর অদৃষ্টবাদী মনের চিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্যোতিষে বিশ্বাসী, সংস্কৃত-ইংরাজী শিক্ষিত, গ্রীক নাট্যসাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত বাঙ্গালী হিন্দু ব্রাহ্মণ মানসে যে স্থির বিশ্বাস ছিল তার ভিত্তিভূমিতে বঙ্কিমের একাধিক কাহিনী বিরচিত। 'দুর্গেশ-নন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'বিষবৃক্ষ', 'রজনী', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'সীতারাম' প্রভৃতি কথাকাহিনীর একাধিক স্থানে ভবিষ্যৎ গণনা, বিল্বপত্রচ্যুতি, স্বপ্নদর্শন, যোগবল, মন্ত্রপূত ত্রিশূল প্রভৃতি বঙ্কিমের উপন্যাসে বারে বারে ঘুরে এসে হয় কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি করেছে নয় জটিলতার জাল থেকে নায়িকাকে উদ্ধার করেছে। হয় নায়িকাকে 'কপালকুণ্ডলা'র মত অদৃষ্টবাদ দ্বারা নিষ্পেষিত করেছে নয় 'রজনী'র ন্যায় উদ্ধার করেছে। অদৃষ্টকে স্পষ্ট ক'রে সম্পূর্ণ ক'রে জানা যায় না; নিয়তির অমোঘ বিধানকে পরিবর্তিত করা যায় না—এ ধারণাও বঙ্কিমের ছিল। তাই 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিরাম স্বামী, 'চন্দ্রশেখর'-এ চন্দ্রশেখর বা রমানন্দ স্বামী, 'সীতারাম'-এ গঙ্গাধর স্বামী চরিত্র পরিকল্পিত হয়েছে। মহাভারতের কর্ণ বা মঙ্গলকাব্যের চাঁদসদাগর অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকারের সংঘর্ষে চিরভাস্বর মানুষ। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসের কোনও স্থলে অদৃষ্টবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে পৌরুষের প্রবল প্রতিরোধের কোনও উল্লেখযোগ্য চিত্র নেই। বঙ্কিমচন্দ্র এ-বিষয়ে রহস্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে

সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সীতারামের জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছেন। তাঁরই মন্ত্রণা শ্রীকে নিষ্প্রেম করেছে। অর্থাৎ সমগ্র গ্রন্থের কেন্দ্রস্থিতা শক্তিরূপে নায়ক-নায়িকা ও খল চরিত্র (গঙ্গারাম) সব কিছুকে তিনি পরিচালিত করেছেন। / তবু সন্ন্যাসসজ্জার মধ্য হ'তে—জয়ন্তীকে মাঝে মাঝে নারীরূপেও আমরা লক্ষ্য করি। যখন তিনি সীতারামের নিকট নিগ্রহের মুহূর্তে নারীর লজ্জা নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন একথা আমাদের বুঝতে দেরী হয় নি সন্ন্যাস তাঁর জীবনের সমস্ত চেতনা, চিন্তা ও সংস্কারকে পরিপূর্ণভাবে বিদূরিত করতে পারে নি। জয়ন্তীর জীবনে যে স্নেহ ছিল, সন্ন্যাসের রুক্ষ ধূসর ঊষর ভূমির মধ্যে যে প্রাণের সজীব সতেজ সবুজ চারাটি মাথা নেড়ে উঠত, তারই আভাস আমরা পাই শ্রীর প্রতি জয়ন্তীর স্নেহে, সাহচর্যে ও সখ্যে। তিনি তো সেখানে কেবল সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকেন নি। শ্রীর দুঃখে অশ্রুসজল চক্ষু এই সন্ন্যাসিনী, শ্রীর প্রেমে পরিহাসরসিকা বান্ধবী এই সন্ন্যাসিনী। আবার হৃদয়ক্ষেত্র হতে দূরে ভৈরবী জয়ন্তী যখন মহম্মদপুর রক্ষা করেন, মন্ত্রপূত ত্রিশূলহস্তে গঙ্গারামের দিকে ধাবিত হন, শ্রীর সহায়তায় রাজা সীতারামকে রাজর্ষিরূপে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেন—তখন আরেকটি বিস্ময়ের প্রবল অভিঘাত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে। জয়ন্তী বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসিনীরূপের আদর্শ। তাই প্রথম সংস্করণে 'সীতারাম' উপন্যাস শেষে বঙ্কিম এই কথাটি স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছিলেন, "যাও জয়ন্তী প্রফুল্লের পাশে গি . দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী। দুইরূপে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণ কর।"

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন উদাত্ত আহ্বানে প্রতাপকে অনন্তধামে পাঠিয়েছিলেন, প্রফুল্লকে নারীজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; 'সীতারাম' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে 'জয়ন্তী'কে সেই ভাবে তিনি সন্ন্যাস ও ধর্মজীবনক্ষেত্রে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু প্রফুল্লের জীবনব্যাপী নিষ্কাম সাধনার পর পুকুরঘাটে বাসনমাজার মধ্যে যেমন নারীর আদর্শরূপটি ভাল ক'রে ফোটেনি, সেরূপ জয়ন্তীর মধ্যেও যে সন্ন্যাসের চিত্র তা কি আদর্শ? যে সন্ন্যাস মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে তাকে আদর্শ মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। জয়ন্তী শ্রীকে স্বামীজীর কাছে নিয়ে গিয়ে মস্ত ভুল করেছিলেন। কারণ 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' রূপে শ্রী যে গঙ্গারামের সর্বনাশ বিধান করবেন তা স্বামীজী সেদিন বুঝতে পারেন নি। জয়ন্তী এই ভাবে শ্রীর চিত্তকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিলেন। এছাড়া জয়ন্তী

শ্রীকে সন্ন্যাসমার্গে নিযে গিয়ে সীতারামের সর্বনাশ কবেছিলেন। তাঁবই বুদ্ধিব দোষে শ্রী সীতারামের নিকটে এসেছেন, সীতারামের চিত্তে কামনাব আগুন জ্বালিয়ে তা অনির্বাপিত রেখেছেন। তাঁরই বুদ্ধির দোষে শ্রী বাজা সীতাবামকে বাজর্ষি করতে গিয়ে বাজপশু গঠন করেছেন। যে-সন্ন্যাস নারীর হৃদয়কে নষ্ট কবে অথচ নারীর দেহ-চেতনা ও লজ্জারূপ সংস্কারকে দূর করে না সে-সন্ন্যাস কি সার্থক? তাই জয়ন্তীব সন্ন্যাসিনী কপ হয়ত স্বাভাবিক হয়েছে কিন্তু আদর্শ হিসেবে সার্থক হয়েছে বলা যায় না।

তবু জয়ন্তীব সেই পবীক্ষাদৃশ্যটি চমৎকাব।' সন্ন্যাসিনী যে মানবী, তারও চিত্তক্ষেত্রে যে 'পাপ লজ্জা' পূর্বজীবনেব সংস্কাবরূপে থেকে গিযেছিল, তা বঙ্কিমচন্দ্র চমৎকাব ক'বে প্রদর্শন কবেছেন। বঙ্কিমসাহিত্যে জযন্তীই পবিপূর্ণ প্রথম, প্রধান, সন্ন্যাসিনীচবিত্র। ইতঃপূর্বে আমবা নিশি ঠাকুবাণীকে পেয়েছি কিন্তু তার পূর্বজীবনেব কিছুটা কাহিনী তাকে ভিন্নতব জীবনকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত কবে। এ ছাডা না ডাকাত, না সন্ন্যাসী কোনও রূপেই তাঁকে স্পষ্ট ক'বে দেখা যায না। তাব চবিত্রকে আনা হযেছে প্রফুল্লেব প্রয়োজনে। 'দেবী চৌধুবাণী'তে কোনওখানেই তাব প্রতি আমাদেব দৃষ্টিব লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত হয় না। সে কোনওখানেই প্রফুল্লেব উপব স্থান পায়নি। 'সীতাবাম' উপন্যাসে জয়ন্তীকে আদর্শ চবিত্ররূপে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থাপিত করতে চেযেছেন এবং পবিবর্তনহীন এই চরিত্রটি ঘটনানিয়ন্ত্রণে ও চবিত্রপরিবর্তনে প্রধান স্থান অধিকাব কবেছে। বঙ্কিমের শেষ ও শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসিনী চরিত্র জয়ন্তী।

শ্রী—'সীতাবাম' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চবিত্র শ্রী। উপন্যাসে সমস্ত ঘটনা তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। দুর্ভাগ্যেব লিখনে, কোষ্ঠী বিচাবে সীতাবাম এবং শ্রীর মধ্যে দাম্পত্যসুখ ঘটেনি। একটি অদৃষ্টবাদেব চিত্র সীতাবাম ও শ্রীর জীবন কাহিনী। "দেবী চৌধুরাণী"র প্রফুল্লেব মত শ্রীও পতিপরিত্যক্ত। কিন্তু সেই পরিত্যাগ তাঁর জীবনকে প্রফুল্লেব ন্যায় একদা মিলনে সার্থক করে তোলেনি। ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্ল এক রাত্রে ব্রজেশ্বরের পিত্রালয়ে মিলিত হয়েছিলেন এবং সেই মিলনই পারস্পরিক আকর্ষণকে প্রবল করে তুলেছিল। প্রফুল্ল সমগ্র জীবনে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য নিষ্কাম সাধনাব নামে সকাম সাধনা করেছেন। শ্রী সীতারামের সঙ্গে কখনও মিলিত হন নি। তাঁর জীবন অনুরাগের রক্তরাগ হতে বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে আচ্ছাদিত হয়েছে। আজন্ম

ভাগ্যবিড়ম্বিতা শ্রী। ব্রজেশ্বর যেমন প্রফুল্লকে পরিত্যাগ করেছিলেন সেই-রকম সীতারাম তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন; কিন্তু এখানে পরিত্যাগের কারণ স্বতন্ত্র। গ্রহচক্রের বৈগুণ্যে শ্রীকে স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। কারণ শ্রীর এমনই গ্রহসংস্থান যে তিনি 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' হবেন। এই অদৃষ্টলিপি সীতারাম ও শ্রীকে বিচ্ছিন্ন করেছে। সীতারামের পিতা বিচ্ছেদের সাহায্যে সীতারামের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনা তাতে শেষ হয় নি। অদৃষ্ট-লিপিতে শ্রী জীবনে সুখী হতে পারেন নি। তিনি পিতৃকুলের সবাপেক্ষা প্রিয়, সহোদর ভ্রাতা গঙ্গারামের মৃত্যুর কারণ হয়েছেন—শ্বশুরকুলের প্রিয়তম স্বামীর পতন, রাজ্যচ্যুতি ও প্রাণসংশয়ের কারণ হয়েছেন। ঘটনার প্রারম্ভকালে আমরা ভাগ্যবিড়ম্বিতা শ্রীকে গঙ্গারামের প্রাণরক্ষার জন্য সীতারামের সমীপবর্তী হতে দেখি। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে শ্রী সীতারামের নিকট এসেছেন, খুলে ফেলেছেন তাঁর অবগুণ্ঠন। তাঁর অন্তর-আকুল-করা আহ্বানে ও রূপে সীতারাম গঙ্গারামের প্রাণরক্ষায় অগ্রসর হয়েছেন। সীতারামের অন্তরে যে রূপলালসা ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছে, যে শক্তি ও আসক্তির উদ্বোধন ঘটেছে, তার নিয়ামিকা শক্তি শ্রী। সীতারামের নিকটবর্তী শ্রীর মধ্যে আমরা রূপ, গুণ, আত্মমর্যাদা ও বুদ্ধিপ্রাখর্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হই। প্রফুল্ল দীর্ঘ দিনের সাধনায় পরবর্তী কালে রাজরাজেশ্বরী দেবী রূপে আমাদের সামনে দেখা দেন। দীনতার সমস্ত আবরণের মধ্য হতে সীতারামপত্নী শ্রীও অচিরেই রাজরাজেশ্বরী রূপে উদ্ভাসিত হয়েছেন। সেদিন তিনি সীতারামকে উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন "আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। সর্বস্বের অধিকারিণী। আমি শুধু তোমার দয়া লইব কেন?" আত্মমর্যাদায় উদ্ভাসিত শ্রী সীতারামকে বীরধর্মে অনুপ্রাণিত করেছেন। গঙ্গারামের মুক্তি মুহূর্তে জনারণ্যমধ্যবর্তী শ্রীর সিংহবাহিনী বীরাঙ্গনা মূর্তি আমাদের বিস্মিত করে। মনে হয় 'আনন্দমঠ'-এর শান্তি এবং 'দেবী চৌধুরাণী'র দেবীরাণী আজ নূতন রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত। সেই বধভূমিতে শ্রীর মধ্যে সীতারাম নূতন জীবনের প্রেরণা খুঁজে পেলেন। এই উদ্যোগ, এই সাহস, এই আত্মমর্যাদা এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত শ্রী হঠাৎ পরিবর্তিত হলেন। যে-শ্রী সীতারামকে ত্যাগমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, বীরধর্মে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যে-শ্রী সীতারামের ধ্যান ও স্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছেন সেই শ্রী তখন সংসারের সীমাকে অতিক্রম করে বেরিয়ে পড়েছেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়, মিথ্যা হয়ে গেছে তাঁর কাছে

জীবনের কলরব। এই শ্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী, ভাগ্য-গণনায় জেনেছেন সত্যই তিনি 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী'। এখন সন্ন্যাসিনীর প্রাণস্পর্শে সুরু হয়েছে তাঁর চিত্তপরিবর্তন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে সীতারামের সান্নিধ্যে, স্নেহে, স্বার্থত্যাগে ও কর্মে পতিপ্রেমের যে উদ্বোধন হয়েছিল তার উপর একটা বৈরাগ্যের যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে এল। জয়ন্তীর অনুগতা শিষ্যারূপে তিনি চিত্তকে সংসার হতে দূরবর্তী করে তুললেন; কারণ ভাগ্যলিপিতে তাঁর স্বামিসুখ নেই। তিনি 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' হবেন। এই দ্বিতীয় শ্রী ব্যক্তিত্ববিহীন, জয়ন্তী-পরিচালিতা, সন্ন্যাসিনী-শিষ্যা। নিষ্কাম কর্মের শিক্ষা ধীরে ধীরে তাঁর পতিপ্রেমকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। পতিসঙ্গলালসা স্থলে পতির প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। শ্রী সীতারামের কর্মক্ষেত্রে এসে হাজির হয়েছেন। সেদিন সীতারামের চরম দুর্দিন। তিনি স্বদেশ হতে দিল্লীতে যাত্রা করেছিলেন 'রাজা' উপাধি প্রাপ্তির জন্য। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে তোরাব খাঁ দেশের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন। ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে গঙ্গারাম। সেই দুর্যোগের অন্ধকার মধ্যে জয়ন্তী এবং শ্রী আবির্ভূত হয়েছেন। সীতারামকে আবার অনুপ্রাণিত করেছেন বীরের মন্ত্রে। সীতারাম ফিরে পেয়েছেন তাঁর বীর্য, তাঁর রাজ্য, ফিরে পেয়েছেন তাঁর শ্রীকে। কিন্তু এ শ্রী তো সে শ্রী নয়। যে শ্রী তাঁর ধ্যান ধারণা ও স্বপ্ন, যে শ্রী তাঁর কর্মের প্রেরণা, প্রেমের কল্পনা, সে শ্রীর রূপের বাইরে আজ গৈরিকের আবেষ্টন। সীতারাম যাঁর জন্যে পাগল সেই শ্রী এখন সন্ন্যাসিনী। সন্ন্যাসিনী শ্রী সীতারাম হতে পৃথক আসনে বসেন, অপরূপ রূপ ও বাক্যের মধুবর্ষণ করেন। কিন্তু সীতারামের মন পড়ে থাকে শ্রী-কথিত ধর্মের ক্ষেত্র হতে অনেক দূরপথে। সন্ন্যাসিনী শ্রী স্বামী সীতারামকে মিলনাকাঙ্ক্ষায় আকুল ও চিরবিরহযাতনায় সন্তাপিত করেন। শ্রীর চতুর্দিকে সীতারামের মন পড়ে থাকে। যে দুর্দমনীয় কর্মশক্তি রাজ্যবিস্তারে, ধর্মরক্ষায়, প্রজাকল্যাণে নিয়োজিত ছিল তা আজ একান্তভাবে সঙ্গপরশব্যাকুল। ধীরে ধীরে সীতারাম প্রজার অকল্যাণ, রাজ্যের সর্বনাশ, ধর্মের অপমৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দেন। রাজ্যের সর্বনাশের কেন্দ্রস্থলে এই শ্রী। এই শ্রী আজ আর সিংহবাহিনী নন, জনসাধারণের কাছে 'ডাকিনী'। 'ডাকিনী'র মত শ্রী আজ সীতারামের সর্বনাশ করেন। তাঁর ধার্মিক হিতকামনা সীতারামের পতন ও মৃত্যুর কারণ রূপে দেখা দেয়। শ্রী ভাগ্যগণনায় 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' হবেন

জেনে স্বামী হতে নিজেকে দূরবর্তী করে রেখেছিলেন। কোনদিনই তাঁর চিত্তকে প্রেমের মন্ত্রে দুর্বল হতে দেবেন না, এই ছিল তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প। কারণ তাঁর হৃদয়ের রক্তলেখায় যদি সীতারাম প্রিয় হয়ে ওঠেন তাহলে গ্রহ-বৈগুণ্যে তিনি হবেন সীতারামের মৃত্যুর কারণ। কিন্তু শ্রী সন্ন্যাসিনী হলেও নারী। বুভুক্ষু স্বামীর চোখেমুখে যে তৃষ্ণা, যে প্রেমের আহ্বান প্রত্যক্ষ করেন, তা তাঁর মনকেও অজ্ঞাতসারে দুর্বল করে তোলে। তিনি স্বীকার করেন, "সন্ন্যাসিনী হউক যেই হউক, মানুষ চিরকাল মানুষই থাকিবে।" আর এ সত্যও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তার উপস্থিতিতে সীতারামের কল্যাণ অপেক্ষা সমগ্র রাজ্যের অকল্যাণ অনেক বেশী পরিমাণে সংঘটিত হচ্ছে। সীতারামের সান্নিধ্য তাঁর সন্ন্যাসধর্মকেও দুর্বল করে তুলছে। তাঁর সামীপ্য রাজধর্মের সর্বনাশ সাধন করেছে। অদৃষ্টের ভয়ে সীতারামের জীবনক্ষেত্র হতে শ্রী আবার পলায়ন করলেন। কিন্তু অতৃপ্ত কামনায় যে বীজ বপন করেছিলেন সীতারামের চিত্তক্ষেত্রে তা অস্বাভাবিক পথে ক্রম-বিকাশের ধারায় এগিয়ে চলল। এই পলায়নে জাগ্রত হল সীতারামের আক্রোশ। সে-আক্রোশ জয়ন্তীকে আঘাত করল। জাগিয়ে তুলল সীতারামের অন্তরে পশুকে। লালসালোলুপ দুরাচারী সীতারাম শ্রীর 'অকর্মে'র মধ্য দিয়ে ক্ষেপে উঠলেন। সীতারামের পতনের বীজ হয়তো তাঁর চরিত্রের মধ্যেই ছিল। কিন্তু শ্রীর কাছে থেকে দূর রচনা, বিকৃত নিষ্কাম সাধনা, বিপর্যস্ত করল সীতারামের জীবন। আবার চরম বিপর্যয়ের দিনে, সীতারামের মনুষ্যত্ব উপলব্ধির শেষ মুহূর্তে, বীরের ধর্মে অনুপ্রাণিত করার জন্য জয়ন্তী এবং শ্রী দেখা দিলেন। শ্রী রণক্ষেত্রে শক্তিস্বরূপিণী। আবার তিনি রাজা সীতারামের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু প্রণয়ক্ষেত্রে, যেখানে রাজার পাশে রাণীর সিংহাসন, সেখান হতে তিনি চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছেন। বিদায়প্রাক্কালে দুর্ভাগ্যবশে তিনি গঙ্গারামের মৃত্যুবিধান করেছেন। সীতারামকে তাঁর রাজ্য, তাঁর সিংহাসন হতে প্রাণভয়ে ভীত পলাতকের অবস্থায় রূপান্তরিত করেছেন। সীতারাম দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। সেই সর্বরিক্ত সীতারামকে ফেলে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী এবং শ্রী আবার বিকৃত ধর্মক্ষেত্রে যাত্রা করেছেন। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে শ্রী পত্নীরূপে তাঁর কর্তব্য করেন নি। সহধর্মিণীরূপে তিনি অধর্ম করেছেন, রাজমহিষীরূপে তিনি কখনই আত্মপ্রকাশ করেন নি। অদৃষ্টের ভয়েতে তিনি বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছেন সীতারামের সঙ্গে। অনস্বীকার্য পতিপ্রেম বশে সীতারামের নিকটে

এসে তিনি বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছেন। সীতারামের সমগ্র জীবনব্যাপী আশা, আনন্দ, বেদনা ও ব্যর্থতার কেন্দ্রস্থলে নিয়ামিকা শক্তিরূপে শ্রী কাজ করেছেন অদৃষ্টের অপরিবর্তনীয় বিধানে। তিনি গঙ্গারাম ও সীতারাম—উভয়ক্ষেত্রেই 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকে নায়িকা করেছেন বটে কিন্তু তাঁকে প্রফুল্লের মত নারীজীবনের আদর্শ করেন নি। শ্রী জয়ন্তীর ন্যায় সন্ন্যাসজীবনের আদর্শও নন। অর্থাৎ শ্রী আদর্শ সহধর্মিণী বা আদর্শ সন্ন্যাসিনী নন। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, ধর্মসাধনার বিকৃতি, নারীর জীবনকে কিভাবে ব্যর্থ করে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় পুরুষের ব্যক্তিগত, সাংসারিক ও সামাজিক জীবন কি ভাবে বিপর্যস্ত হয় শ্রী তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতীয় সাহিত্য

॥ ১ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্রাজ্য বিস্তৃত বাংলা আসাম উড়িষ্যায়, হিন্দীভাষী অঞ্চলে, পঞ্জাবে বোম্বাইয়ে গুজরাটে, তামিল তেলুগু-মলয়লম-কন্নড়ভাষী অঞ্চলে। এ কাহিনী স্বপ্ন নয়, মায়া নয়। তার জন্য নিমন্ত্রণ লোকে লোকে···সাহিত্যের নব নব পূর্বাচলে।

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের সাহিত্যিক ..কেবল বাংলার নন। সত্যকার সাহিত্যিক মাত্রেই নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর অমর মানুষ। তাই আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে বঙ্কিমের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে ভারতের প্রান্ত হ'তে প্রান্তে— পূর্ব হ'তে পশ্চিমে, উত্তর হ'তে দক্ষিণে। সে সাম্রাজ্য বিস্তার মৃত্যুর দ্বারা খণ্ডিত হয়নি। তাই আজ রুশ দেশেও বঙ্কিমবন্দনা ও অনুবাদ চলেছে।

পাঠকদের কাছে বিদায় নেবার পূর্বে আমি ভারতীয় সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব-প্রসার বিষয়ে যে-কটি কথা জানতে পেরেছি, তা জানাবার চেষ্টা করব। এ আলোচনা ছাত্রদের কাজে লাগবে কি না জানি না। কিন্তু বঙ্কিমবন্দনায় শতেক কবিদলে মিলে মত্ত মাদব বাতাসে যে আনন্দধ্বনি উত্থাপিত করেছেন, তার কিছু আলোচনা প্রয়োজন বলে মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্র যে বাঙ্গালীর মন সম্পূর্ণ জয় করেছিলেন একথা বাঙ্গালীকে আর নূতন ক'রে জানাতে হবে না। সেদিন যে-সকল বাঙ্গালী সাহিত্যক্ষেত্রে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা'র চেষ্টা করছিলেন, তাদের অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্গুলি অবলম্বনে পুরোগমন করেছিলেন। গল্প-উপন্যাস-নিবন্ধ-রসরচনায় বাঙ্গালীর সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি এনেছিলেন নূতন আদর্শ, নূতন জীবনস্পন্দন।

আসামে যে নূতন সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হ'ল সেখানেও বাঙ্গালাকে আদর্শ মানা হয়েছে। আধুনিক আসামী সাহিত্যের প্রাণপুরুষ চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (১৮৫৮-১৯৩৮), লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৮৬৮-১৯৩৮), হেমচন্দ্র গোস্বামী (১৮৭২-১৯২৮); পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া (১৮৭১-১৯৪৬)। এঁরা যে 'জোনাকি' সাহিত্যিক-গোষ্ঠী সৃষ্টি করেন তা বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন-হেমচন্দ্র প্রভৃতির

আলোকে উদ্ভাসিত। মাইকেল মধুসূদন হ'তে চতুর্দশ অক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষর পংক্তি সুরু হয়েছে আসামীতে, সুরু হয়েছে সনেট ('চনেট')। চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, কমলাকান্ত ভট্টাচায প্রভৃতি হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীতের অনুসরণে আসামীতে সঞ্জীবনী কবিতা রচনা করেছেন। আসামের সাহিত্যে রজনীকান্ত বরদলৈ বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে উপন্যাসের সূত্রপাত করেন। ছোট-গল্প-প্রবন্ধকার লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর ধারানুসরণ করে "বরবরুয়ার ভাবর বুরবুরানি" রচনা করেন। লক্ষ্মীনাথ কমলাকান্তের আদর্শে "কৃপাবর বরুয়া" চরিত্র গঠন করেন। উপরিলিখিত গ্রন্থ কৃপাবব বরুয়া নামক কাল্পনিক চরিত্রের ভাবের (বুড়বুড়ানি বা) বুদ্বুদ সংগ্রহ। কমলাকান্তকে অমর ক'রে গেছেন লক্ষ্মীনাথ 'কৃপাবর বরুয়া' চরিত্রের মধ্যে। আসামীতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তনায় রজনীকান্ত বরদলৈর হাতে উপন্যাসের সূত্রপাত হয়। এ সম্বন্ধে 'Assamese Literature' গ্রন্থে Dr. B. Barua বলেন :—

"The novel as a full-fledged work of creative imagination in prose was born at the hands of Rajanikanta Baradoloi. Baradoloi admits in the preface to his novel 'Danduwa Droha' (1909), that the works of Walter Scott and Bankim Chandra Chatterjee moved him to appreciate the beauty of the hills and dales of his own land and to write themes culled from Assam's history."

উপন্যাস ক্ষেত্রে বরদলৈর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রতিষ্ঠাব সূত্রপাত করেন তা পরবর্তীকালে এমন বিস্তৃতি লাভ করে যে উপন্যাস-রচনায় তাঁর আদর্শ গ্রহণ একটি অবশ্য কর্তব্যরূপে পরিগণিত হয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির ফলে কবিতাক্ষেত্রে রবীন্দ্রানুসরণ ও উপন্যাসক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারানুসরণে সাহিত্যিকম্মন্য অসমীয়া যুবকদের প্রমত্ততার প্রতি কটাক্ষ ক'রে আধুনিক যুগের বিখ্যাত কবি পদ্মধর চালিহা বলেছেন :—

মেরী করেলী আরু বঙ্কিমর
নিচিনা নভেল লিখিম।

(আমি) নূতন epoch আনিম
(আমি) অমর হৈহে মরিম,
নবেল প্রাইজ অধিকার করি
টিঘিল ঘিলাই ফুরিম।

—ফুলনি : পদ্মধর চালিহা

'আমি মেরা করেলি আর বঙ্কিমচন্দ্রের মত উপন্যাস লিখব। আনব নূতন যুগ। মরব অমর হয়ে। নোবেল প্রাইজ অধিকার ক'রে আনন্দ অভিনন্দন মধ্যে জীবন গতিসার্থক করব।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গানের দ্বারা অনুপ্রাণিত আসামের জাতীয় সঙ্গীত "অ মোর আপোনর দেশ" প্রসঙ্গে আলোচনা পূর্বেই (২৫৩ পৃষ্ঠায়) করা হয়েছে এই কবিতার মধ্যে দেশকে "চিকুনী দেশ" বলা হয়েছে। মাতৃভূমি "সুরলা, সুফলা মরমর"। যেমন ভাবে জাতীয়চেতনা উদ্বোধনে বাংলার ইতিহাস মন্থন করে বঙ্কিম বাংলার কলঙ্ক দূর করতে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তেমনি ভাবে বঙ্কিমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে "অসমীয়া জাতি ডাঙ্গর জাতি"র মধ্যে বিদ্রূপের আঘাতে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া লিখেছেন :—

"আমার নাই কি ? উমানন্দ আছে, কামাখ্যা আছে, জয় সাগরের দল আছে, শিব সাগরের দল আছে।.........আকৌ কয় অসমীয়ার টকা নাই—অসমীয়া মনুহ মৌন মৃগ হোবা নাই যে টকা উপার্জন করি চিন্তাচর্চা বঢ়াই অনর্থর গুটি সিচিলব কারণ অর্থ মনর্থং ভাবয় নিত্যম্।"

উদ্ধৃত অংশে মনে পড়বে প্রবন্ধকার বঙ্কিমকে। 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' বিদূরক বাঙ্গালীর ইতিহাসের সশ্রদ্ধ গবেষক বঙ্কিমকে। মনে পড়বে কমলাকান্তের অম্লমধুর রসাভিষিক্ত রচনার অমর উৎস বঙ্কিমকে।

॥ ২ ॥

বঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গ দীর্ঘদিন ভাব ভাষা ও সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ। তারপর সেদিন পর্যন্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা শাসনের গাঁটছড়ায় বাঁধা ছিল। নব সংস্কৃতির পীঠস্থান কলিকাতার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল, ব্যবসা, বাণিজ্য, কর্ম, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি নানা কারণে। ওড়িয়া সাহিত্যের আধুনিকীকরণে যে সব সাহিত্যিক এসেছিলেন এগিয়ে তাঁদের ক্ষেত্রে কবিরূপে আদর্শ ছিলেন মধুসূদন

এবং গদ্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র। আধুনিক ওড়িয়ার প্রথম ও প্রধান কথা-সাহিত্যিক ফকীরমোহন সেনাপতির শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' গ্রন্থের স্থানে স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশেষ ক'রে যেখানে বাগানবাড়ী, মুসলমান তবলাবাদক ও গায়িকার কথা বলা হয়েছে সেই দৃশ্যটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থের প্রসাদপুরের বিলাসগৃহে গোবিন্দলাল-রোহিণী-ওস্তাদ ঘটিত দৃশ্যটির দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত। ফকীরমোহনের 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অংশের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থের তুলনীয় অংশের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করুন :—

ফকীরমোহন লিখেছেন—

"মিঁআও—মিঁআও—মিঁআও ওস্তাদজী ভারী খুসাটা হোই তানপুরা কান বাঁ হাতরে মোড়ি স্বর দেই বসিলে। গুম্-গুম্-গুম্ তাক্-ধিন ধিন ধিন তাক্—ধিন্ ধিন্ গুম্ তাবলা বাজি উঠিলা।"

—(ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ : অষ্টম পরিচ্ছেদ)

'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

"তম্বুরার কান মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়ীধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান খ্যান ওস্তাদজীর বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল—তখন তিনি সেই গুম্ফশ্মশ্রুর অন্ধকার মধ্য হইতে কতকগুলি তুষারধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া, বৃষভদুর্লভ কণ্ঠরব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন।"

—(কৃষ্ণকান্তের উইল : দ্বিতীয় খণ্ড : পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

ফকীরমোহনের রচনারীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করুন :—

"......একথা লেখক তম্বা তুলসী শালগ্রাম ছুঁই বোলিবাকু প্রস্তুত অছি।" ('গারুড়ি মন্ত্র' : গল্প সল্প : ফকীরমোহন)।

'দেবী চৌধুরাণী'র প্রারম্ভিক সম্বোধন "ও পিপি-ও পিপি-ও প্রফুল্ল ও পোড়ার-মুখী" মনে পড়বে "রেবতী" কাহিনীর পরিশেষে "লো রেবতী, লো রেবী, লো নিআঁ, লো চুলি" পড়তে পড়তে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা (আনন্দমঠ) ও ফকীরমোহন সেনাপতির ('আত্মচরিত' গ্রন্থের) দুর্ভিক্ষ বর্ণনার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করুন। অবশ্য উভয়েই দুর্ভিক্ষের বর্ণনায় হাণ্টারের "এ্যানাল্‌স্ অফ রুরাল বেঙ্গল" গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :—

'আশ্বিন কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল।...লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয়।...গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজ ধান খাইয়া ফেলিল, ঘর বাড়ী বেচিল, জোত জমা বেচিল। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে আরম্ভ করিল।' —আনন্দমঠ : বঙ্কিমচন্দ্র

এই প্রসঙ্গে ফকীরমোহন লিখেছেন :—

"কার্তিক মাস আরম্ভরু লোকে অত্যন্ত নিরাশ হোই পড়িলে।...ধান গাছ গুড়িক শুখি কুটাপরি হোই গলাণি।...দুআর দুআর বুলি বুলি ভিক মাগুথান্তি। কাহা ঘরে চাউল অছি যে ভিক দেব?.. চাষী লোক অবস্থানুসারে প্রথমে কংসা পিত্তল, গোরু গাই, সুনা রূপা, যাহা ঘরে যাহা থিলা বিকি বিকি মাঘ ফাল্গুন যাএঁ দম্ভ কামুড়ি ঘরে পড়ি রহিলে। তেন্তলি গছরে কঁঅলিআ (কোমল) পত্র বাহারিবারু গোটাএ গোটাএ গছরে দশকোড়িএ জন লেখাএঁ চঢ়ি মাঙ্কড় পরি পত্র সবু খুন্টি খুন্টি খাউথান্তি।"

—উৎকলর ভীষণ দুর্ভিক্ষ : আত্মচরিত : ফকীরমোহন

॥ ৩ ॥

বাংলা সাহিত্য হিন্দী সাহিত্যকে যে ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে তার তুলনা পাওয়া যায় না। 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান' গ্রন্থে এ বিষয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থানাভাব। আমরা এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দী সাহিত্যে সম্বন্ধে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারানুসরণ করে হিন্দীতে যে উপন্যাসকাহিনী ও নিবন্ধ সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছিল তার পুরোভাগে ছিলেন আধুনিক হিন্দীর সবপ্রথম ও সবপ্রধান সাহিত্যিক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র। তাঁর নির্দেশ ছিল যে—'অপনী সম্পত্তিশালিনী জ্ঞানবৃদ্ধা বড়ী বহন বঙ্গভাষাকে অক্ষয় রত্নভাণ্ডার কী সহায়তা সে হিন্দী ভাষা বড়ী উন্নতি করে।' তাঁর সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে তিনি বাংলার সাংস্কৃতিক যোগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেদিন হিন্দী সাহিত্যে ছিল না নিবন্ধ। উপন্যাসের পূর্বরূপ যা ছিল তা হ'ল 'তিলিস্ম', 'আইয়ারী' কাহিনী, হাতেম তাই, গোলেবকাওলীর অনুসরণ।

এই শিশুচিত্তবিনোদনকারী কথা-কাহিনীক্ষেত্রে নূতন জীবনের বাণী নিয়ে এলেন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র। প্রথম যুগের হিন্দী সাহিত্যিকদের মধ্যে 'রাজসিংহ' অনুবাদক ভারতেন্দু; 'যুগলাঙ্গুরীয়' 'কপালকুণ্ডলা' অনুবাদক প্রতাপনারায়ণ মিশ্র; 'রাধারাণী' অনুবাদক রাধাকৃষ্ণ দাস; 'দুর্গেশনন্দিনী' অনুবাদক গঙ্গাধর সিংহ; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (কৃষ্ণকান্ত কা দানপত্র) অনুবাদক অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায় প্রভৃতির নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। এর পর বঙ্কিমের সমস্ত রচনাই অনুবাদ করা হয়। পরবর্তী অনুবাদকদের মধ্যে রূপনারায়ণ পাণ্ডে, মহাবীরপ্রসাদ, হরিদাস, খত্রী দামোদর দাস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "নবকুমার ইয় কপালকুণ্ডলা" হিন্দীতে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা বা হিন্দী উপন্যাস ক্ষেত্রে কোনও ধারানুসরণ লক্ষ্য করা যায় না। বঙ্কিমের প্রবন্ধ ('বঙ্কিমনিবন্ধাবলী') ও রসরচনা ("চৌবেকা চিট্‌ঠা" অর্থাৎ 'কমলাকান্তের দপ্তর') হিন্দীতে নূতন আঙ্গিকের রচনা-সাহিত্যের পথরচনা করেছিল। এই 'চিট্‌ঠা' সাহিত্যে হিন্দীতে বাবু বালমুকুন্দ গুপ্ত যুগান্তর আনলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত চক্রবর্তী' আসামীতে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার হাতে 'কৃপাবর বরুয়া'র মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল—একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। হিন্দীতে 'কমলাকান্ত' 'শিবশম্ভু' রূপে লোটা-ভরা সিদ্ধি সেবন করে ভাবনিমীলিত নয়নে দার্শনিক তত্ত্বচিন্তা করেছেন। বাবু বালমুকুন্দ গুপ্তের 'শিবশম্ভুকা চিট্‌ঠা'র কিয়দংশ দেখুন—

"ইতনে মেঁ দেখা কি বাদল উমড় রহে হৈঁ। চীলেঁ নীচে উতর রহী হৈঁ। তবীয়ৎ ভুরভুরা উঠী। ইধর ভঙ্গ, উধর ঘটা।—ইতনে মেঁ বায়ুকা বেগ বড়া, চীলেঁ অদৃশ্যে হুঈঁ। অন্ধেরা ছায়া, বুঁদে গিরনে লগীঁ; সাথ হী তড় তড় ধড় ধড় হোনে লগী। দেখা ওলে গির রহে হৈ।...'বম্‌ভোলা' কহ কর শর্মাজীনে এক লোটা ভর চঢ়াঈ।...পর উয়হ চীল কহাঁ গঈ হোগী?...শিবশম্ভু কো ইন পক্ষিয়োঁ কী চিন্তা হৈ। পর উয়হ ইয়হ নহীঁ জানতা কি ইন অভ্রস্পর্শী অট্টালিকায়োঁ সে পরিপূরিত মহানগর মে সহস্র অভাগোঁ রাত বিতানে কো ঝোপড়ী ভী নহীঁ রখতে।"

অর্থাৎ—

"দেখিতে দেখিতে মেঘে আকাশ ছাইল। কয়েকটা চিল নামিতে লাগিল। মন মাতিয়া উঠিল—এদিকে সিদ্ধি, ওদিকে মেঘ। দেখিতে দেখিতে বায়ুর বেগ বাড়িল, চিল অদৃশ্য হইল। আঁধার করিয়া আসিল। বৃষ্টি বাড়িতে লাগিল।

সঙ্গে সঙ্গে তড়্-তড়্ তড়্-তড়্, দেখিল শিলা পড়িতেছে।… 'বম্‌ভোলা' বলিয়া শর্মাজী এক লোটা-ভর্তি সিদ্ধি চড়াইল। কিন্তু ঐ চিল কোথায় গেল? শিবশম্ভুর ঐ সকল পক্ষীর জন্য চিন্তা হইল। কিন্তু তাহার জানা নাই যে অভ্রস্পর্শী অট্টালিকা-পরিপূরিত এই মহানগরীতে সহস্র অভাগার রাত কাটাইবার ঝোপড়ীও নাই।"

কমলাকান্তের ধারা এখনও অবলুপ্ত হয় নি। বাংলায় 'প্র. না. বি' এই ধারানুসরণ ক'রে চলেছেন। আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে মৈথিলী সাহিত্যের প্রখ্যাত ব্যঙ্গ-লেখক হরিমোহন ঝার রচনা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৈথিলী সাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতির অনুবাদের মধ্য দিয়ে। হিন্দীতে বঙ্কিমচন্দ্রকে অবলম্বন ক'রে উপন্যাসের যে অনুবাদ অনুসরণ হয় সেই প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর রামচন্দ্র শুক্ল মহাশয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস'-এ বলেছেন—

"ইন অনুবাদোঁ সে বড়া ভারী কাম যহ হুয়া কি নয়ে ঢংগ কে সামাজিক ঔর ঐতিহাসিক উপন্যাসোঁ কে নয়ে ঢংগ কা অচ্ছা পরিচয় হো গয়া, ঔর উপন্যাস লিখনে কী প্রবৃত্তি ঔর যোগ্যতা উৎপন্ন হো গঈ।"

বাংলা অনুবাদের প্রবল স্রোতে হিন্দী ভাষা কিছুটা বিপর্যস্ত হ'ল। হিন্দী ভাষায় বাংলা শব্দ ও বাগ্বিধি এমন প্রবল ভাবে ঢুকতে লাগল যে অনেক অর্ধশিক্ষিত হিন্দী সাহিত্যিক হিন্দীর ব্যাকরণ ও বাগ্বিধিকে অনেক সময় নস্যাৎ ক'রে দিতে লাগলেন। এই সাহিত্যিক সমৃদ্ধি ও ভাষাগত বিপর্যয় সম্বন্ধে খেদ প্রকাশ করে পণ্ডিত শুক্ল বললেন—

"কহীঁ কহীঁ তো বঙ্গলা কে শব্দ ঔর মুহাবরে তক জ্যোঁ কে ত্যোঁ রখ দিয়ে জাতে থে—জৈসে "কাঁদনা", "সিহরনা", "ধূ ধূ করকে আগ জলনা", "ছল ছল অশ্রুপাত" ইত্যাদি।

এই বিষয়ে প্রেমচন্দজীও 'সেবাসদন' গ্রন্থে একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে আক্ষেপ করে বলেছেন যে "হিন্দী সাহিত্যের অনুবাদ অংশ বাদ দিলে হরিশ্চন্দ্রের দুচারটি মৌলিক নাটক এবং 'চন্দ্রকান্তা সন্ততি'র ন্যায় আজগুবি কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।" হিন্দীর ক্ষেত্রে বাংলার অনুবাদ বিষয়ে আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে হিন্দীর গল্প-নিবন্ধ-উপন্যাস ক্ষেত্রে প্রবল প্রাণনা রূপে কাজ করেছিলেন সে কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার

করেছেন। তাঁর অনুবাদ ও অনুসরণের মধ্যে হিন্দী গদ্যসাহিত্য আপনার সত্যকার রূপটি খুঁজে পায়।

॥ ৪ ॥

পূর্বেই বলেছি বঙ্কিমের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে উত্তর হ'তে দক্ষিণ। পূর্ব (আসামী) হ'তে পশ্চিমের (হিন্দী) সাহিত্যলোকে তাঁর স্থান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

মরাঠী উপন্যাস "কাদম্বরী" নামে খ্যাত। গুজরাতীতে 'নবলকথা' নামে উপন্যাস আপনার প্রতিষ্ঠা খুঁজে পেয়েছে। এই দুটি সাহিত্যের প্রথমটিতে দেশপ্রেমিক মরাঠা জাতি বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র মধ্যে গদ্যে কাহিনী রচনার ধারা খুঁজে পেয়েছেন বলে ইংরাজী 'নভেল' বা বাংলা 'উপন্যাস' নাম তারা গ্রহণ করেন নি। গুজরাতীতে সরাসরি 'নবলকথা' নামের মধ্যে স্বীকার করা হয়েছে যে উপন্যাস দেশী-বিদেশী মিশ্র আদর্শে গঠিত। হিন্দীতে বাংলা হ'তে 'উপন্যাস' নামটি গ্রহণ করা হয়েছে।

'কাদম্বরী'র ক্রমবিকাশের প্রথম যুগে বাংলা হ'তে উপন্যাস অনুবাদের প্রথম স্তরটির কথা শ্রদ্ধেয় সমালোচক আর. এস. জোগ (ইংরাজী বিশ্বভারতী কোয়াটালি : নভেম্বর ১৯৪১ : টেগোর এণ্ড মারাঠি লিটারেচার) শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' মরাঠীতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অনূদিত হয়। এরপর বঙ্কিমের অনুবাদ অনুসরণের বিশেষ একটি ধারা মরাঠী উপন্যাস সাহিত্য-ক্ষেত্রে রসের জোগান দেয়। শ্রীজোগ লিখেছেন, "Among the writers most popular with the translators were Bankimchandra, Ramesh Dutta, Harisadhan Mukhopadhyay,...D. P. Roychowdhury and later Rabindranath and Saratchandra Chattopadhyay."

মরাঠী সাহিত্যে 'কাদম্বরী' স্বতন্ত্র পথে বিকশিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তার যোগ জন্মপূর্বের নাড়ির যোগ। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মরাঠী অনুবাদক নাট্যকার বি. ভি. ওয়ারেরকর (মামা ওয়ারেরকর নামে সর্বজনশ্রদ্ধেয়) আজ বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ও মরাঠার যে সাংস্কৃতিক রাখিবন্ধন করেছেন, কাদম্বরীর জন্ম-লগ্নে সেদিন আরও অনেক মরাঠী সাহিত্যিক তার সূত্রপাত করেছিলেন বঙ্কিমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে।

গুজরাতী সাহিত্যে প্রথম যুগের 'নবল কথা' লেখকদের মধ্যে মহিপৎ রাম ও নন্দশঙ্কর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও স্কটের আদর্শ গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অনুবাদ-অনুসরণের মধ্যে গুজরাতী 'নবল কথা'র বিশেষ বিকাশ ঘটে।

তামিল সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন, "বিশিষ্ট তামিল সমালোচকরা স্বীকার করেন—বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের প্রভাবে আধুনিক তামিল কথাসাহিত্য নূতন প্রেরণা লাভ করেছে।"[১]

তেলুগু সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের অনুবাদক শিবশঙ্কর শাস্ত্রী। এই প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন, "আধুনিক তেলুগু কথাসাহিত্যের সুরু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অনুবাদের মধ্য দিয়ে।"[২]

মলয়লম কথাসাহিত্যের অনুপ্রেরণাও বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে বেশকিছু এসেছে। এই প্রসঙ্গে ঐ সমালোচক বলেন, "ইংরেজী উপন্যাসের অনুবাদ বা অনুকরণের মধ্য দিয়ে মালয়ালম সাহিত্যে উপন্যাস রচনা শুরু। ইংরেজির পরেই বাংলা। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ও শরৎচন্দ্র—মালাবারের পাঠকসমাজে এঁরা জনপ্রিয়ই শুধু নন, মালয়ালী কথাশিল্পীরাও উদ্বুদ্ধ এঁদের প্রেরণায়।"

কন্নড় সাহিত্যে উপন্যাস ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবাদে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন বেন্দিগণভিল্লে বেঙ্কটাচার্য। বাঙ্গালোর কন্নড় সাহিত্য সমিতির সভাপতি শ্রী বি শিবমূর্তি শাস্ত্রী বলেন :—

'Coming to the modern fifty years of our Kannada literature it is for me to admit that Kannada has derived a great deal from Bengali.......Fifty years ago, late B. Venkatacharya did great service to the Kannada language by tanslating works of Babu Bankim Chandra Chatterji, Ramesh Chandra Babu, Sarat Chandra Babu, Haraprasad Sastry and others from Bengali."

কন্নড় সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ কন্নড় সাহিত্যিক কবি

---

১. শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য : তামিল : পৃঃ ১২৩

২. ঐ : তেলুগু : পৃঃ ১৪২

এবং পণ্ডিত ডঃ কে. ভি. পুট্টাপ্পা বলেন, ভেঙ্কটাচযের অনুবাদের ফলে 'বঙ্কিমচন্দ্রের নাম একদিন কন্নডভাষীর ঘরে ঘরে গুঞ্জরিত হত' ("Bankim Chandra had become a household name in Karnataka")।

এমনি ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার সাহিত্যাকাশ থেকে জ্যোতিষ্কসমের ভূমিকা ক'রে সমগ্র ভারতভূমিকে শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিতা করেছিলেন। এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা একান্ত প্রয়োজন।

অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ

ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ **মূল্য ছয় টাকা**

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৌলিক ও অনুবাদ কবিতার বিচার-বিশ্লেষণ। ইংরাজি কবিতার অনুবাদ; অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য; বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ও সত্যেন্দ্রনাথ; হিন্দী কবিতার অনুবাদ; ফরাসী কাব্য ও সত্যেন্দ্রনাথ; ফরাসী কবিতার অনুবাদ; ফারসী কবিতার অনুবাদ; ওড়িয়া সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের অনুসরণ প্রভৃতি কয়েকটি পরিচ্ছেদ ব্যতীত, 'মহাসরস্বতী', 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি', 'জাতির পাঁতি', 'তাজ', 'সমুদ্রাষ্টক' প্রভৃতি মৌলিক কবিতার টীকা-টিপ্পনী আছে। সত্যেন্দ্রনাথ-বিরচিত একটি অপূর্ব হাস্যরসের নিঝর্র-ধারা একাঙ্ক নাটক সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত। গ্রন্থের সর্বত্র অনুবাদ-কবিতার আলোচনায় মূল কবিতা পাশাপাশি স্থাপন ক'রে বিচার করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বিশিষ্ট চিন্তাশীলদের দ্বারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসিত।

'প্রবাসী'—এই অমূল্য গ্রন্থের প্রচার আবশ্যক।

'দৈনিক বসুমতী'—গ্রন্থখানিতে সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা সম্পর্কে যে সকল নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে এযাবৎ কুত্রাপি এরূপ বিশদভাবে তা পরিবেশিত হয়নি। এই তথ্যানুসন্ধানের পশ্চাতে রয়েছে গ্রন্থকারের গভীর অনুশীলন ও তত্ত্বসমূহের আবিষ্কারের পাণ্ডিত্য। বিচার ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখক যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও গবেষণার নিদর্শন দিয়েছেন, তা অধিকাংশ আলোচনা গ্রন্থে বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না।...এই গ্রন্থ সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী ও কাব্যরসপিপাসুদের সমাদরের বস্তু হিসাবে চিরদিন আদৃত হবে।

'অমৃত'—পুস্তকখানির বিষয়বস্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে ঈদৃশ গ্রন্থ প্রণয়ন সহজসাধ্য নয়—তদুপরি আয়াস ও অনুশীলনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।...সত্যেন্দ্রনাথ কবি হিসেবে যত বড়, তার চেয়েও বড় অনুবাদক হিসাবে। প্রতিপাদ্য সেই বিষয়ের হিসাবই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার, বিশ্লেষণ ও উপমার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছেন গ্রন্থকার ডঃ চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থখানি চিন্তাশীল ব্যক্তি ও সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই পাঠ করা উচিত।

'মাসিক বসুমতী'—আলোচ্য গ্রন্থটি অনুবাদক হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এক পরম মনোজ্ঞ আলোচনা গ্রন্থ। অধ্যাপক ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় অভিনন্দনীয় এক সাধুপ্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করেছেন।...সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে তিনি যে সুবিস্তৃত, পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং চিত্তাকর্ষক আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন তা

পাঠকচিত্তে প্রভাব বিস্তার করবে। লেখকের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, ছন্দসম্পর্কে বহু তথ্যপূর্ণ বিচার এবং মূল কবিতাসমূহের উদ্ধৃতি গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। কবি এবং কাব্য সম্পর্কিত বাংলা গ্রন্থগুলির মধ্যে এই গ্রন্থটি এক বিশেষ উল্লেখের এবং যথেষ্ট পরিমাণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, এ কথা বললে অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট হতে হয় না।

'যুগান্তর'—সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী ও ওড়িয়া সাহিত্যের মূল কবিতার সঙ্গে পাশাপাশি রেখে যেমন তিনি (ডঃ চট্টোপাধ্যায়) অনুবাদক সত্যেন্দ্র দত্তের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি করেছেন ইংরেজী, ফরাসী মূলগুলির সঙ্গে বাংলা অনুবাদ-গুলিরও তুলনায় আলোচনা। এতগুলি ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় সম্পন্ন বাঙালী প্রাবন্ধিক আমাদের আর নেই। সেজন্য ত বটেই, গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচনার জন্যও বইটি উল্লেখযোগ্য।···তিনি পাঠার্থীদের অশেষ উপকার করেছেন।

'দেশ'—সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কবিতাগুলি নিয়ে এ পর্যন্ত মৌলিক কবিতার পন্থাতেই আলোচনা হয়েছে। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনা বিশেষ হয় নি। তার প্রধান কারণ ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের অভাব। স্বভাবতই অনুবাদক হিসাবে কবি সত্যেন্দ্রনাথের সমালোচনা দুরূহ। ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় এই নূতন আলোচনা-পদ্ধতির সূত্রপাত করে বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

** **

প্রকাশক : এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২